A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

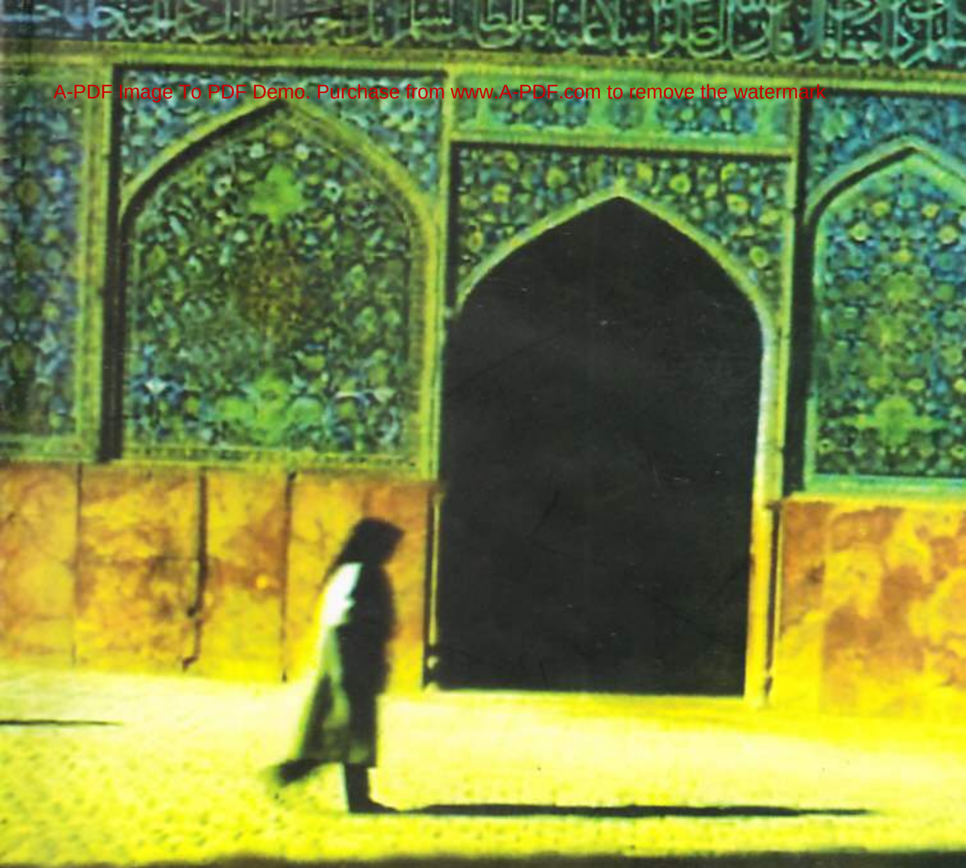

জরাথ্রুস্টের সন্ধানে

ইরান, মধ্য এশিয়া এবং বিশ্বের প্রথম নবীর খোঁজে

পল ক্রিসবাসজেক

অনুবাদ : মোস্তফা আরিফ

মনোমুগ্ধকর... ধর্মের অনেক গোপন কথা এবং পৃথিবীর প্রথম নবীর সন্ধানে কাহিনী নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে – *ফোর্ট ল্যান্ডাল*

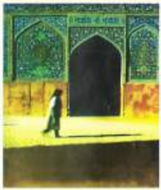

অসাধারণ, ধর্মের খোঁজে এবং সত্যের সন্ধানে মানুষ হন্যা হয়ে ঘুরে বেড়ায় এই বই তাঁর প্রমাণ।

— ডেইলি মেইল

অতুলনীয় : অতীত, বর্তমান সময়ের ধর্মের কথকতা নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। জরাথ্রুস্টবাদ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। —পাবলিশার্স উইকলি রিভিউ

প্রকৃত সত্য, ধর্মের প্রকৃত বিচার এবং বহু কাহিনী আলোর মতো ফুটে উঠেছে ... মুক্ত হয়েছে মনের কুটিলতা। বিস্মিত হয়েছে বিশ্ব। —বুক লিস্ট

পল ক্রিসবাসজেকের অনন্য সৃষ্টি। ধর্মের গুঢ়রহস্য তুলে ধরেছেন। এ বইতে জরাথ্রুস্টের সময়কালে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একে অপরের তুলনা, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় যে বিশ্বাস তাই ফুটে উঠেছে। —কারকাস রিভিউ

অংশত ভ্রমণমূলক। অংশত ইতিহাস এবং অংশত দার্শনিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে এ বইতে। জরাথ্রুস্টের সন্ধানে এমনই বই যে আমাদের বর্তমান এবং আধুনিক ধর্মীয় ব্যবস্থায় হয়তো স্বাভাবিকভাবে অনেকেই মেনে নেবেন না। — দি ডেইলি ক্যামেরা

গ্রাফিক্স : আককাস খান

জরাথুস্ট্রের সন্ধানে
ইরান, মধ্য এশিয়া এবং বিশ্বের প্রথম নবীর খোঁজে
মূল : পল ক্রিসবাসজেক
অনুবাদ : মোস্তফা অরিফ

অনুবাদস্বত্ব © প্রকাশক

সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ
পহেলা বৈশাখ ১৪২০

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৩

রোদেলা ১৩২

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৬১২৫, ০১৬৭১৭৮৬১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ইশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
জে. কে প্রিন্টার্স
৭৪/১ পাতলা খান লেন, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

মূল্য : ৩৬০.০০ টাকা মাত্র

In Search of Zarathustra by Paul Kriwaczek
Translated by Mustafa Arif
First Published Ekushe Boimela 2013
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 360.00 only US $ 10.00
ISBN : 987 984 8975 60 2 Code : 132

অনুবাদকের উৎসর্গ

বাবা এ এস এম এ খালেক–সহযোগী সম্পাদক, দি নিউজ টুডে
এবং মা ফরিদা বেগম
এই পৃথিবীতে বাবা-মায়ের প্রতি ঋণ
কোনোভাবেই শোধ হওয়ার নয়
তাঁদের দোয়া আমার জীবনের একমাত্র
চলার পথ। তাঁরাই আমার আদর্শ।

ম্যাক্তি লিটিল এবং টবি ম্যাডিকে অশেষ ধন্যবাদ। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার চিন্তা-চেতনাকে তারাই সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছে। আমাকে সব সময় উৎসাহ-উদ্দীপনা জুগিয়েছে। আমি যখনই কোনো কিছু চিন্তা করে তাদের জানিয়েছি, তারা তৎক্ষণাৎ তা লিপিবদ্ধ করেছে। যা পরবর্তী সময়ে এ বই লেখার ক্ষেত্রে এবং আমার গবেষণায় বহু কাজে লেগেছে। বেঞ্জামিন বুকাননের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ বই শেষ হয়েছে তার কল্যাণে। প্রতিটি লাইন সে সুন্দরভাবে রচনা করেছে।

PERSONAL COLLECTION OF ISCKRA

কোনো গান গাইতে চাই না,
তারা বলে সুরেলা কণ্ঠে গান গাওয়া মহাপাপ!
প্রাচীন সুন্দর প্রিয় জন্মভূমি আমার
যত অভাব আর কষ্ট থাকুক না কেন
ইতিহাসের প্রাচীন ভূমি আমার প্রিয় জন্মভূমি,
কোনো এক অন্ধকার রাতে
কোনো এক শাসক ঘোষণা দিলেন,
সুরেলা কণ্ঠে গান গাওয়া অপরাধ।
একদিন ঠিকই সব পাল্টে গেল
জন্মভ্রষ্ট তার গান দিয়েই এ প্রিয় ভূমি আবাদ করলেন।
নতুন করে বিছিয়ে দিলেন মুক্তা।

(ইরানি জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী গোগস)

কিছু কথা

প্রিয় পাঠক, আমি পল ক্রিসবাসজেক। আমার সঙ্গে এই ভ্রমণে যোগ দেয়ার জন্য পাঠক সমাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, আপনাদের এই ভ্রমণ আনন্দময় হবে। সবাই এ বই পড়ে তৃপ্তি পাবেন। আপনাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হবে। এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী।

এ বইয়ের কাজ করতে গিয়ে ফার্সি–আধুনিক পারস্যের ভাষা–পারস্যের বন্ধুর কাছে উপস্থাপন করতে গিয়ে সেই ভাষা অনুশীলন করেছি এবং শিখেছি। পারস্যের সেই বন্ধু আমার উদ্যোক্তা, ভাষা শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, সতীর্থ এবং আমার ইরান ভ্রমণের ঘনিষ্ঠ সহচর। আকস্মিক একটা ঘটনা ঘটল, তেহরানের গন্তব্য বিমানবন্দরে পৌঁছেই আমরা একে-অপরকে হারিয়ে ফেললাম এবং আমি যেন অসহায় হয়ে পড়লাম। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে বিমানবন্দরের তথ্যকেন্দ্রে গেলাম। সেখানে একটি খাতায় তার নাম লিখলাম। তারপর তথ্যকেন্দ্রের উপস্থিত কর্মীরা মাইকে তার নাম প্রচার করতে থাকে। তথ্যকেন্দ্রের মেয়েরা ইরানি চাদর, যার পুরোটাই কালো রঙের দ্বারা আবৃত। ফলে তাদের চুল পর্যন্ত দেখা যায় না। শুধু চোখ দুটো দেখা যায় আর মহিলাদের পরনের পোশাক দেখা যাচ্ছিল। তথ্যকেন্দ্রের তরুণী আমার সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছিল। সেই তরুণী আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর নাম মাইকে প্রচার করছিল। বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে কিছু সময় কাটালাম। এই ফাঁকে বিমানবন্দরের চারদিকে তাকালাম। প্রথম দর্শনেই উপলব্ধি করলাম সাবেক নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি ইরানকে কতটা আধুনিক এবং অন্যদের থেকে পৃথক করে গড়ে তুলেছিলেন। ত্রিশ বছর আগের ইরান আর বর্তমান ইরান আকাশ-পাতাল ফারাক।

আমার কাছে মনে হলো বিস্ময়কর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দর অতিমাত্রায় লোকারণ্য। আরো যদি কিছু বর্ণনা করতে হয়, তা হচ্ছে, অত্যাধুনিক। পাশ্চাত্যের থেকেও সেরা। মস্কো অথবা বুখারেস্টের সমপর্যায়ের ইস্তাম্বুল এবং তাসখন্দ থেকে অনেক উচ্চ স্থানে উঠে গেছে মেহরাবাদ। কোনো পরিবারের সদস্য বিমানবন্দরের লনে মাদুর বিছিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে বসে নেই, তবে তারা লনের বাইরে একত্র হয়ে যেন হালকা

খাবার পরিবেশন করছে, অনেকটা বনভোজনের মতো অবস্থা। কোনো যাত্রী দেয়ালের কর্নারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে, অনেকে কম্বল গায়ে দিয়ে যাত্রী সেবাকেন্দ্রে বিশ্রাম নিচ্ছে, বিমানবন্দরে ফলের দোকানে সুতার তৈরি জালের ভেতর ফল এবং শাকসবজি রাখা হয়েছে। ক্রেতারা পছন্দমতো ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। পাসপোর্ট চ্যানেল বরাবর কোনো বয়োবৃদ্ধ তার ছাগল বা গৃহপালিত পশু নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে না। পুরো বিমানবন্দর নিরাপত্তা চাদরে আবৃত। মাঝেমধ্যে নিরাপত্তাবাহিনী দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা ধূসর রঙের পোশাক পরহিত। আর যেসব মহিলা ছিল, তারা চাদরের পরিবর্তে মাথায় স্কার্ফ পরেছিল। তাদের কাজ ফ্লাইট ঠিক করা। এ সবই হলো ২০০০ সালে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার নতুন ফসল।

যে বন্ধুর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম, যাকে এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলাম, কিছু সময় পর তার সন্ধান পাওয়া গেল। বন্ধুর নাম হোসেইন। সে তার শালাকে নিয়ে হাজির হলো। তার শালা আমাদের গাড়ির চালক। তার আমেরিকান উচ্চারণে আমি মুগ্ধ। কিন্তু একই সঙ্গে একটি বিষয় ভেবে দুঃখ পেলাম, তা হচ্ছে এত কষ্ট করে এবং সতর্কতার সঙ্গে ফার্সি ভাষা শেখা এবং তার জন্য পরিশ্রম সবই যেন জলাঞ্জলি দিতে হলো। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ করে তারা আমাকে টার্মিনাল পার করে দিল। বাইরে এলাম তিনজন। তারপরে ফিয়াট গাড়িতে উঠলাম। এই ফিয়াট গাড়িতে করেই পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আমরা আমাদের ভ্রমণ পর্ব সম্পন্ন করেছিলাম। এর মাঝেও নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকলাম। প্রাক মুসলিম শাসনামলের ব্যাপারে হোসেনের এতটা আগ্রহ এবং জ্ঞান, তা আমি ধারণা করিনি। আমার প্রত্যাশাও সে রকম ছিল না। ইরানের ইসলামপন্থি মানুষগুলো তাদের দেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে খোঁজ-খবর রাখবে, সে রকম কিছু আশা করা বৃথা। যাই হোক, টেলিফোনে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপে আমার ইরান ভ্রমণের মূল কারণ তাকে জানাইনি। জরাথুস্টবাদ অথবা প্রাচীন পারস্যের প্রথম নবী জরাথুস্টের ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলাম। শুধু বললাম, ইরানের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চাই। আমাকে শঙ্কিত হতে নিষেধ করল। সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলাম। ইরানের জনগণ বর্তমান ইসলাম সমাজব্যবস্থা নিয়ে যতটা গর্বিত ঠিক একইভাবে প্রাক মুসলিম যুগে এ দেশের মানুষ তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করত। এ দেশের মানুষ ইসলামিক বিশ্বাসে নিজেদের মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে।

ইরানের প্রবেশদ্বারেই সন্দেহজনক একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এর কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। এমনকি মেহরাবাদ গ্রাম, যেটা

বর্তমানে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তাতে লেখা রয়েছে 'মিথরা কর্তৃক অথবা মিথরার জন্য'। মিথরা ছিলেন অনুপম ব্যক্তিত্ব, আওরা মাজদার পথপ্রদর্শক, নবী জরথ্রুস্টের প্রচলিত শিষ্য ও মতবাদের এক এবং একমাত্র ঈশ্বর।

এ কথা সত্য, কালের গর্ভে অনেক কথা এবং প্রকৃত নাম হারিয়ে যায়। কোনো ইংরেজ যদি ইরানে দেবতা ওডেন অথবা থরের কথা বর্ণনা করে, এ দুই দেবতার নামানুসারে সপ্তাহের নাম রাখা হয়েছে ওয়েনেসডে এবং থার্সডে (বুধ এবং বৃহস্পতিবার)। কোনো আধুনিক ইরানি এ কথা বিশ্বাস করবে না। তেহরানবাসী পৌত্তলিকতাবাদীদের বিশ্বাস এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। যখন মেহরাবাদ সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হয় অথবা কোনো প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং লুকায়িত সেই পবিত্র নাম প্রকাশ করা হয় : মেহেরবান, 'দয়ালু' অর্থে, উদাহরণস্বরূপ প্রচলিত ভাষায় বলা যায় মিথরার পর্যবেক্ষণশীল। তারা এসব ব্যাপারে যতটা সম্ভব এড়াতে চেষ্টা করে আর কেউ না হলেও ইরানের ইসলামপন্থি সাবেক নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি মিথরা দর্শন, যিনি একেবারে ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত হন। তারা কেরমানশাহ নগরী নিশ্চিহ্ন করে দিতে ছিলেন উদ্ধত। এর কারণ একটাই, তা হচ্ছে, তারা শাহের নাম বদলাতে পারতেন না, তাকে পছন্দ করতেন না এবং আমি এটা বিমানবন্দরেই অনুভব করেছিলাম। ইরানের বহু ঐতিহাসিক স্থান, ইসলামি বিপ্লবের পর পুরনো নাম বাদ দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়। মেহেরাবাদ নামটি রেখে দেয়া হয়, কারণ এ নামটি বর্তমান ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার হয়। তাই তারা প্রাক ইসলামিক যুগের এই দার্শনিক নাম অস্বীকার করতে পারেনি।

এটা ছিল ইরান বিশ্বে আমার তৃতীয় ভ্রমণ। ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে ইরানে আমি বহু সময় কাটিয়েছে। সে সময় ইরানের শাসন ক্ষমতায় শাহ–তিনি ময়ূরপঙ্খী আসনে বসতেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক, আন্ত ব্যাপকভাবে দুর্নাম কুড়িয়েছেন, জনগণের কল্যাণে কাজ করার চিন্তা করেছিলেন। তার সম্পর্কে পশ্চিম প্রচারমাধ্যমগুলো একটা ধারণাই করত–তিনি হচ্ছেন অলংকার বিশেষ। তখনো মোসাদ্দেক জীবিত ছিলেন–যদিও তিনি ছিলেন গৃহবন্দি। ইরান ত্যাগের পর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে যাওয়া সুযোগ হলো। ইরানের পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তান। এখানে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দুই বছর সামন্তবাদী রাজ্য আফগানিস্তানে ছিলাম।

এক দশক পর আমি আবার ইরান ভ্রমণ করলাম–এবার ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র মধ্য এশিয়ার দেশ ভ্রমণ করেছি। এসব দেশ ইরানি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

একটি স্থানে আমরা কয়েকজন উপস্থিত হলাম, সেখানে টেলিভিশনে শর্ট ফিল্মের শুটিং হচ্ছিল। ইসলামের প্রচার এবং প্রসার কীভাবে ঘটানো যায়, তা নিয়েই শর্ট ফিল্ম শুটিং হচ্ছিল। আর মধ্য এশিয়ার দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে গেছে এবং এসব দেশের মানুষ মার্ক্স এবং মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর দর্শন নিয়ে যেন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার যত দেশ ভ্রমণ করেছি, অধিকাংশ রাষ্ট্রই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ–তবে এর মধ্যে আফগানিস্তান এবং ইরান সরকারিভাবে স্বীকৃত মুসলিম রাষ্ট্র। এমনকি ৬০-এর দশকে তাই ছিল। বাইরের কোনো শক্তি বা রাষ্ট্র তাদের এ ব্যাপারে সহায়তা করেনি–মানুষের মধ্যে পরলৌকিক ধারণা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কোরআনের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস তাদের জীবন উৎসর্গ করতে তৈরি করেছে। কিছুটা উপলব্ধি করে বুঝতে পারলাম কিন্তু কখনোই উল্লেখ করিনি এবং নিশ্চিতভাবে বলতে চাই না যে এটা জরাগ্রস্টের উদাম শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এই শক্তি আজও অনেক বেশি ক্ষমতাবান এবং ইসলাম বিজয়ের ১৪০০ বছর পরও জরাগ্রস্ট দর্শন, মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

পল ক্রিসবাসজেক

PERSONAL COLLECTION OF ISCKRA

অনুবাদকের কথা

পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ অবধি চলছে সত্য-মিথ্যার লড়াই। সত্য হচ্ছে আলো। আর মিথ্যা অন্ধকার। প্রতিটি ধর্মের দর্শন সে কথাই বারবার মানুষকে জানিয়েছে। পারস্যের প্রথম নবী জরাথ্রুস্ট পৃথিবীর মানুষকে সত্য এবং আলোর পথে আসতে বলেছেন। এক ঈশ্বরের সাধনা এবং আরাধনার কথাই উচ্চারণ করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে বহুমত ও পথের বিশ্বাসী হতে পারে। কিন্তু একটা কথা সবাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, সর্বশক্তিমান বলে কেউ একজন রয়েছে। জরাথ্রুস্ট সে কথাটিই বলেছেন : 'এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও।'

পারস্য এবং সমগ্র আরব সমাজে এমন একটা সময় ছিল যখন নানা দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিল মানুষ। সেইসঙ্গে যত প্রকার অন্যায়, অপরাধ, অনাচার এবং ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত, লুটতরাজ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আরও যে বিষয়টি মানুষকে বিচলিত করত তা হচ্ছে রাজা, বাদশাহ, সম্রাট—এক অর্থে শাসকগোষ্ঠী যে বিধি-কানুন বেঁধে দিত সেটাই আইন, সেটাই ধর্ম। সবাই তাই মেনে নিত। শাসকগোষ্ঠীর প্রধান হতো রাষ্ট্রের বা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা। তার বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো অধিকার ছিল না। সত্য-মিথ্যা বিচার করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা কারো ছিল না।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। একই অবস্থা ছিল পারস্য সমাজব্যবস্থায়। অন্ধকার জগৎ থেকে মানুষকে মুক্তির জন্যই সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন জরাথ্রুস্ট। তিনি কোনো মূর্তি পূজারক ছিলেন না। সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, একেশ্বরবাদীতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষকে সর্বশক্তিমানের দিকে ধাবিত হতে বলেছেন।

দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে এক সৃষ্টিকর্তার কথা ভুলে গিয়েছিল মানুষ। তারা মনে করত, দেব-দেবীই মুক্তিদাতা। এক ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে নিজেদের বেঁধে নিয়েছিল।

মানুষের মুক্তির জন্য সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে নবী, রাসুল ও ঐশীবাণীবাহক পাঠিয়েছেন। মানুষ যেন সত্যের পথে আসে। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর তুলনা না করে।

জরাথ্রুস্ট পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার প্রথম নবী হিসেবে পরিচিত। তিনি এই পৃথিবীর মানুষকে সত্যের সন্ধানে আহ্বান করেছেন। পাপাচার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। হিব্রু উপসানালয়, যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও পূর্বে এবং মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে পারস্যে প্রথম নবী জরাথ্রুস্ট আবির্ভূত হন। তিনিই পৃথিবীর মানুষকে জানান ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মৌলিক দ্বন্দ্বের কথা। তার দর্শন নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তিনি যে একেশ্বরবাদীর কথা প্রচার করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একেশ্বর সাধনাতেই মুক্তি।

মোস্তফা আরিফ

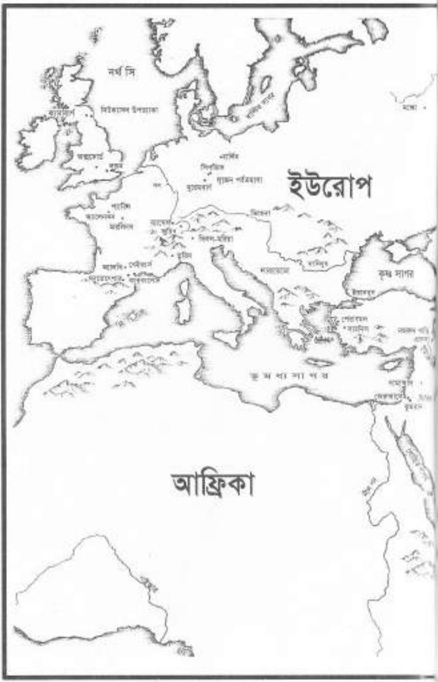
নর্থ সি
ইউরোপ
কৃষ্ণ সাগর
আফ্রিকা

এশিয়া
কাবুল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যেসব পাঠাগার এবং আর্কাইভ এ বইয়ের জন্য ছবি সরবরাহ করেছে, লেখক ও প্রকাশক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাদের অশেষ ধন্যবাদ দিয়েছেন। ছবি সরবরাহ করে বইটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে তাদের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। যারা বিশেষভাবে সহায়তা করেছে তারা হলো : মেরি ইভান্স পিকচার্স লাইব্রেরি, হালটন আর্কাইভ, নিউক্যাসলের স্মৃতি জাদুঘর, ওয়েডেন ফিল্ড আর্কাইভ, তেহরানের ইয়াসাভেলি প্রকাশনী এবং ফটোগ্রাফার স্টিফেন। তাদের ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। তারা এ বইকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে।

সূচি

১. নব দর্শন ২৫

সমরকন্দের সোনালি সড়ক ২৫
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিলন মেলা ৩৯
মোল্লাদের নিষেধাজ্ঞা ৪৭

২. প্রকৃত দার্শনিক ৫২

মানবতাবাদী টলস্টয় ৫৮
সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা ৬৪
ভারতবর্ষে জরাগ্রস্ত দর্শনের প্রসার ৭৩

৩. মহান ঐশীবাহক ৯১
প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আমুর খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের উৎসর্গ ৯১
সম্রাট হত্যা এবং বিশৃঙ্খলা ১১০
এশিয়ায় ধর্মযুদ্ধ শুরু ১২২

৪. ধর্মের আলো ১৩৪

নাকশ-ই-রুস্তম ১৩৪
সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবগোষ্ঠী ১৪৫
মনি অমর ১৬০

৫. মিথরাস রহস্য ১৬৯

পোপের অন্যায্য হুকুমনামা ১৬৯
মিথরাস দর্শনের নতুন দিক ১৮৩

৬. শেষ সময় ২০১

আলেকজান্ডারের বিজয় ২০১
সাম্বাটিয়ন নদী ২১৬
মৃত সাগরে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলন মেলা ২৩০

৭. আহুরা মাজদার দয়া ২৪৭

সাইরাসের শান্তির ঘর ২৪৭
ব্যাবিলন বিজয় ২৫৯
দারিউসের ঘর ২৬৭
স্বর্গ, নরক এবং শয়তান ২৭৫

৮. প্রথম নবী ২৮১

নোরুজ ২৮১
ধর্ম প্রাণবন্ত ২৯৫
আহুরা ৩১২
ভালো কথা, ভালো চিন্তা, ভালো চুক্তি ৩১৮

জরথ্রুস্টের উক্তি ৩২৮
কৃতজ্ঞতা ৩৩০

জরাথ্রুস্টের সন্ধানে

১.
নব দর্শন

সমরকন্দের স্বর্ণালি সড়ক

উজবেকিস্তানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। প্রতিবেশী তাজিকিস্তানের পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের মাথার ওপর বরফাচ্ছাদিত পামির মালভূমি। সঙ্গে ব্রিটিশ কবি এবং প্রবাদসেরা ব্যক্তিত্ব জেমস ইলোরি ফ্লেকারসের সমরকন্দের স্বর্ণালি সড়ক কবিতা। উটের পিঠে বসে তার কবিতা আওড়ে যাচ্ছি :

সমরকন্দের স্বর্ণালি যাত্রা

বহু পথ পাড়ি দিয়েছি, লোকালয় থেকে বহু দূরে
নেই কোনো মনুষ্যের চিহ্ন
সূর্য, ডুবে যাচ্ছে, উটগুলো আস্তে আস্তে হাঁটছে।

চলছে যেন বীরের মতো। বিশ্ব জয় করে ফেলেছে উটগুলো।
হে সাহসী নায়ক, এগিয়ে চলো—
হে বাগদাদের রাজপুত্র, বীরের মতো অগ্রসর হও
যেন লাল কার্পেট বিছানো সড়কগুলো,

আর মদের আসরে আমরা যেন আবৃত
রাতের অন্ধকার যেন রমণীর বোরকা
এর মাঝেও রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য।
তুলিতে এঁকে রাখার মতো দৃশ্যপট।

ময়ূরপঙ্খী পেখম মেলে ধরেছে
[illegible] সম্রাট আলীর তলোয়ার আমাদের হাতে
বিশাল আকৃতির কুমিরগুলো আমরা বধ করেছি।

বিষধর সাপ নখদর্পনে
সবাই রাজার কাছে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করছে।
সুন্দর সন্ধ্যা এবং বয়ে চলেছে অবারিত স্রোতধারা
বালুতটে যেন বয়ে বেড়াচ্ছে ছায়ামূর্তি।
নীরব নিথর ধু-ধু বালুতট
সমরকন্দ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বর্ণালি সড়ক...

কত সময় ধরে চলেছি উটের পিঠে করে তা আমরা জানি না। যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তায় অসংখ্য গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। গর্তে উটের পাগুলো যখন পড়ছে তখনই তাদের চলতে সমস্যা হচ্ছে।

পথ বড় দীর্ঘ। বাস্তবতা হচ্ছে স্বর্ণালি সড়ক থেকে বহু দূরে—হতে পারে দুইশ মাইলেরও বেশি। জমাট বাঁধানো পাথরখণ্ড, প্রতিটি স্তর এতটাই যন্ত্রণাদায়ক ছিল, যার কারণে আমাদের চলতে কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের যানবাহন যেন গর্তে পড়ে যাচ্ছিল। বিপজ্জনক এই পথে চলতে আমাদের উটগুলো কাহিল হয়ে পড়ছিল। শরীর ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। পাকস্থলি যেন পেটের ভেতর থেকে একেবারে মুখ পর্যন্ত চলে আসছিল। কাঁধ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছিল। ধূসর সড়ক। যখন সমরকন্দে পৌঁছালাম, সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেলাম। সবার মধ্যে আনন্দের উল্লাস বয়ে গেল। স্বপ্নময় এক শহরে পৌঁছালাম। প্রচণ্ড গরম। ধুলোবালি গরম এবং দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে আমরা ছিলাম প্রচণ্ড ক্লান্ত। মার্বেল পাথরে তৈরি সেন্ট্রাল স্কয়ারের সামনে জড়ো হলাম। এটা অনেকটা তাজমহলের মতো দেখতে। এখানে পারিবারিক ভ্রমণ খুবই আনন্দময় হয়। সুন্দর ছবি তোলা যায়। সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে, এই পরিবেশে যেকোনো মানুষ সুন্দর এবং প্রত্যাশিত জীবন কাটাতে পারবে। সমরকন্দের এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

'বালুময়' শহর রেজিস্তান। বিশ্ব স্থাপত্যের এবং শিল্পকলার এক অনন্য এবং অসাধারণ সৃষ্টি এই রেজিস্তান। শহরের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে সুন্দর অট্টালিকা। তার চারপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছয়টি সড়ক।

নগরীতে প্রবেশ অথবা বের হওয়ার জন্য রয়েছে প্রতিটি সড়কের শেষ প্রান্তে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী দরজা। রাজধানী সমরকন্দ, এই সুন্দর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা খান উলাগ বেগ, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং মঙ্গোলীয় শাসক তৈমুর লংয়ের (তিমুর দি লেম, তামেরলেইন নামে পরিচিত) নাতি তিনি, মাদ্রাসা-ইসলামিক কলেজ অসাধারণ মেধাবী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি ইসলামি আদর্শে

বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি। মাদ্রাসার সেরা ছাত্র ছিলেন খান উলাগ বেগ।

ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন খান উলাগ বেগ। সমরকন্দ নগরীতে সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে। এটা যেন স্বর্গীয় উদ্যান।

মধ্য এশিয়ার এ সৌন্দর্য নগরীর পাশাপাশি এর বিপরীতে পনেরো শতকে ইউরোপ ছিল পুরো অন্ধকার। বর্বরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপ। অসভ্যতা এবং বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন রাজা পঞ্চম হেনরি। মানুষকে জ্ঞানের পথে, আলোর পথে আনতে তার চেষ্টার কমতি ছিল না কখনোই। ইংল্যান্ডের এই মহান রাজা দেশের মানুষকে বিদ্বান করতে খান উলাগ বেগের পরামর্শ নেন। তাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসেন। এই মহীয়সী এবং অধিক ব্যক্তি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং দর্শনের ক্লাস নিতেন।

এর ঠিক একশ বছর পর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর সমরকন্দ নগরীর নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দিতেন মাদ্রাসার ছাদের ওপর থেকে। তার নির্দেশমতো সেনানায়কগণ তাদের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতেন। এভাবেই বাবর সাম্রাজ্যে সমরকন্দ নগরী আধিপত্য বিস্তার করে।

আরো একশ বছর পর সমরকন্দ নগরীর গভর্নর জেনারেল আলসিন ইয়ালানতুশ বাহাদুর–দুটি মাদ্রাসার দালান নির্মাণে যেন একই সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে সেই নির্দেশ দিলেন, শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য শহরের উত্তর এবং পূর্বে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের পরিধি আয়তকার বৃত্তের মতো বিস্তৃত। কলেজের প্রবেশ দ্বারটি কামানের মতো সুউচ্চ আকৃতির। কামানের শেষ ভাগে একটি ছোট স্থানে আগুন জ্বলছে। স্বর্গীয় প্রার্থনার জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে যে, একনজরেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। কলেজের দেয়ালের পেছনের অংশ নীল রঙের। কলেজের ছাদটি নির্মাণ করা হয়েছে মধ্য এশিয়ার আকাশে নীলাবৃত রং এবং ধূসর পৃথিবীর রঙের সমন্বয়ে। এক কথায় নান্দনিকতার সব ছোঁয়া বিদ্যমান।

দুটি কলেজই পাথরে নির্মাণ করেন তিনি। কলেজ দুটির অবকাঠামো ছিল ভিন্ন আঙ্গিকের। তবে একটি বিষয়ে মিল ছিল, কলেজ দুটির অবকাঠামোতে জ্যামিতিক আঙ্গিকে এবং বর্গাকারে এটি তৈরি করা হয়েছিল। দুইশ বছর ধরে মাদ্রাসা দুটিতে শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। উত্তরের মাদ্রাসাটি পূর্বের মাদ্রাসার পরিচালনায় এবং কলা-কৌশলে ভিন্নতা অবলম্বন করে। নিয়ম-কানুন পরিচালনায় নিজস্ব নিয়ম বেছে নেয় তারা। মাদ্রাসার মূল দালান ছিল দ্বৈত আকৃতির। মসজিদ এবং মাদ্রাসা সংযুক্ত ছিল।

পাশেই ছিল গাছগাছালি। সবুজ এবং হলুদ রঙের পাতা চারদিকে বিছিয়ে রাখা হতো।

তৃতীয়টি ছিল শের দার মাদ্রাসা। যেকোনো মানুষ এই মাদ্রসার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়বে। এর প্রবেশ পথে যে অসাধারণ শিল্পকলার ছাপ রাখা হয়েছে তা অতুলনীয়। পৃথিবীর কোনো মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রার্থনা কক্ষ এত সুন্দর হয় কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ এবং সংশয় রয়েছে।

তবে সামঞ্জস্যতায় ভিন্নতা ছিল। মসজিদ ও মাদ্রাসার রং ছিল গাঢ় সবুজ। নগরীর শীর্ষ কর্মকর্তা শের দার তৈরি করেন তৃতীয় মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার সৌন্দর্যে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ত। মাদ্রাসার স্থাপত্যশিল্প এবং নকশা অনন্যসাধারণ। এর নকশা করা হয়েছিল মুসলিম সংস্কৃতিও ঐতিহ্য সমুন্নত করার জন্য।

পারস্য ভাষায়, শের দার শব্দের অর্থ 'বাঘ-বাহক'। শের দার বিশাল এক আসনে বসতেন। তার আসনের দুই পাশে 'বাঘের মুখাকৃতি'। ঘরের চারদিকে সূর্যের আলো তির্যকভাবে প্রবেশ করত। মাদ্রাসার কক্ষ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে ছাত্ররা যখন প্রখর সূর্যের তাপে ঘেমে যেত তখন কক্ষে প্রবেশ করলেই হিমশীতল ঠান্ডা হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর ঘরটি খুবই ঠান্ডা হয়ে পড়ত। এ ঘরের মধ্যে হরিণের প্রতিকৃত ছিল। সব মিলিয়ে বন্য একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। বাঘের মুখে দীঘল দিনের সূর্যের আলো পড়ত।

তখন ভয়ংকর এক চিত্র ফুটে উঠত। এর মাধ্যমেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ধারণা পেত সবাই। দালানকোঠার স্থাপত্যে সবাই এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়ত, যেন তারা ভাষা হারিয়ে ফেলত। স্থাপত্যগুলোতে ইসলামি শিক্ষার বাস্তবতা তুলে ধরা হতো। পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এসব স্থাপত্যশিল্পে মনোনিবেশ করতেন। ইসলামি চিন্তা, জ্ঞান, দর্শন এবং মতবাদ প্রচারের জন্য তৈরি হতো চলচ্চিত্র। তাতে তুলে ধরা হতো সমরকন্দের কাহিনী।

মাদ্রাসাটি বর্গাকৃতির। শিক্ষকরা মাঝে দাঁড়াতেন। তাদের পরনে থাকত সালওয়ার-কামিজ–পাকিস্তানি জাতীয় পোশাক। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের আগে জাতীয় সংগীত গাইত ছাত্রছাত্রীরা। দেয়া হতো ধর্মীয় শিক্ষা। এটা ভেবে সবাই অবাক হতো, মাদ্রাসার অঙ্গসজ্জা এতটা শৈল্পিক ছিল কীভাবে? কোথাও কোনো খুঁত নেই। একটি বিষয় ভেবে অবাক হতে হয়, সব মাদ্রাসাতে শিক্ষা পরিচালনা একইভাবে হতো কীভাবে? যেসব ছবি ইসলামিক আইনে নিষিদ্ধ তা বাতিল করে দেয়া হতো। এ ব্যাপারে কঠোর শাসন মেনে চলত সবাই। কখনো কখনো যে ভুল হতো না তা নয়। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জানা

গেছে, ১৯২০ সালের দিকে ঐতিহ্যবাহী এ দালানকোঠা পুনঃ সংস্কার করা হয়েছে। এমনকি ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় দফায় সংস্কার হয়। সে সময় সংস্কারের দায়িত্বে ছিলেন সাবেক সোভিয়েত স্থাপত্যবিদগণ। তারা বাঘের মুখাকৃতি শের দারের আসন সুন্দরভাবে নির্মাণ করেন। কমিউনিস্টশাসিত সোভিয়েত স্থাপত্যবিদগণ এ নির্মাণকাজ করলেও ইসলামের মৌলিক নীতি এবং চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কিছুটা ত্রুটি থেকেই যায় তাদের কাজে।

একজন অধ্যাপক এবং এক শীর্ষ কর্মকর্তার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছি। তারা স্থাপত্য শিল্পকলার সঠিক বর্ণনা দিতে পারেননি। শৈল্পিক স্থাপত্যের মধ্যে বাঘের-সিংহের পেছন দিক থেকে সূর্য উঠছে। এ প্রতীকটিতে উনিশ শতকের কাজার এবং বিশ শতকের ইরানের পেহলভি শাসনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। তবে আধুনিক যুগে সন্ত্রাসী মুজাহিদিন-ই-খালেক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থাপত্যে বাঘের স্থলে সিংহের ছবি নির্মাণ করা হলেও এবং তা করে এটা শের দার সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই প্রকাশ পেয়েছে।

শের দার মাদ্রাসা যেমন প্রাচীন তেমনি এর প্রভাব অনেক বেশি বিস্তৃত। এই মাদ্রাসার প্রধান নকশাকারী ছিলেন স্থাপত্যবিদ মোহাম্মাদ আব্বাস, তিনি ইসলামি নকশা তৈরি করতেন, মাদ্রাসার মেঝেতে আরবীয় দর্শনের ইঙ্গিত প্রকাশ করতেন। 'সীমাহীন আকাশের নীলাভ রঙের মতো মাদ্রাসার মেঝে যেখানে নকশা করেন, সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন,' আর পুরো মাদ্রাসা দূর থেকে মনে হতো রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে, রাতে মাদ্রাসার দিকে তাকালে 'মনে হতো নতুন চাঁদ উঠেছে মেঘমুক্ত আকাশে'।

স্থাপত্য শিল্পগুলোতে কী বোঝাতে চায় তা উপলব্ধি করা প্রকৃত অর্থেই কঠিন ছিল। 'শের দারের মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। তার ডান আঙুল আকাশের দিকে তুলে ধরে রাখা হয়েছিল। সবাই চিন্তা করত নতুন কোনো দীনের কথা বলছেন তিনি।' মুসলিম দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও মেধাবী ব্যক্তিগণ এ নিয়ে নিজেদের মাঝে বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের ধারণা, হরিণ এবং বাঘের যে চিত্র তুলে ধরা হতো তা দিয়ে বোঝানো হতো রাজা তার শত্রুকে বধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথবা সম্ভবত এমনও হতে পারে, সমরকন্দের বিখ্যাত এবং শক্তিধর ব্যক্তির চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে রাজার ক্ষমতা এবং শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার দৃপ্ত শপথ। খলিফা আলীকে বোঝানো হতো 'ইসলামের সিংহপুরুষ'। মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর জামাতা এবং শিয়াদের দৃষ্টিতে মহানবীর একমাত্র যোগ্য উত্তরসূরি।

আর সূর্য দিয়ে ইসলামের আলোকে বোঝানো হতো। বাঘ যেমন শিকারে মরিয়া হয়ে ওঠে তেমনি সিংহের প্রতিকৃতি ছিল তা দিয়ে বোঝানো হতো খলিফা আলীর দৃঢ়তা–ইসলামের শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসেবে সিংহ চিহ্ন দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হতো।

অন্য ধর্ম এবং সম্প্রদায় থেকে ইসলাম যে একক সত্তা এবং ভিন্ন, তা এ সূর্যের কিরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। অমিতশক্তির অধিকারী সূর্য মিত্রের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। জরাথুস্টের মতবাদে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বর এবং মানবতাবাদে, মানুষের সঙ্গে মানুষের চুক্তি এবং বিনিময়ে স্বচ্ছতা মেনে চলে। তারা আইনের শাসন মান্য করে। সমরকন্দের শের দারের মাদ্রাসার মতো স্থাপত্য, যেখানে সূর্যরশ্মি ক্রিমান্বিকভাবে প্রতিফলিত হতো আর কোনো সরকারি বা বেসরকারি অফিস-আদালত এত শিল্পমণ্ডিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের থেকে ভিন্ন এবং সনাতনী ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বহন করে সেভাবেই দালানকোঠা নির্মাণ করত।

ইরানের রাজা, বাদশাহ এবং সম্রাটগণ মিত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবতে পছন্দ করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে ইরানের রাজা, বাদশাহ নিজেকে সম্রাট এবং সাধারণ মানুষ পৃথিবীতে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ভাবতে পছন্দ করত। বাঘ এবং সূর্যের নকশা-সংবলিত প্রতীক দিয়ে সমরকন্দের গভর্নর গর্ববোধ করতেন। তার সামন্তবাদী প্রভু এই প্রতীক দিয়েছেন এর মাধ্যমে স্বর্গের নিশ্চয়তা বিধান করতেন তিনি।

ইসলামি নেতা–আর সূর্য দিয়ে ইসলামের আলোকে বোঝানো হতো।

স্বর্গীয় দেবদূত ভাবতেন নিজেদেরকে। প্রজাদের শোষণ করা, ভয়ভীতি প্রদর্শন করা এবং এসব সামন্তবাদী প্রভুর আচরণ ছিল এমন। তারা যেন স্বর্গীয় দূত হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। তাদের নির্দেশমতোই প্রজাসাধারণকে চলতে হবে।

শের দার মাদ্রাসার ভিন্ন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হচ্ছে ইরানীয় বিশ্বে ইসলামের প্রসার ঘটাতে তারা নতুনভাবে নিজেদের উপস্থাপন করত। এটা এমনই, যেন মহিলাদের চাদর পরিধানের মতো। তারা যেমন করে চাদর পরে শরীর আবৃত রাখে, তেমনিভাবে শের দার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা নিজেদের আবৃত করে রাখতেন। ঐতিহ্যবাহী ইরানি শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ পোশাকের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রাক ইসলাম যুগে জরাথুস্টবাদ বিশ্বাসীরা শরীর ঢেকে রাখতেন। এই ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে জেনারেল আলচিন ইয়ালানেতুস বাহাদুরের শাসনামলে।

বর্তমানে ইরানের বিপণিকেন্দ্রগুলোতে সূর্যসংবলিত মিত্রের মুখাকৃতির অতীতের মঙ্গোলীয় নয় বরং বর্তমানের আদর্শের প্রতীক হিসেবে কার্পেট [illegible] বিক্রি হচ্ছে। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এর প্রকৃত অর্থ কী? সূর্যসংবলিত মিথরার প্রতীক কি ধ্যান-ধারণা প্রতিনিধিত্ব করছে? তারা শুধু আপনাকে বলবে, যা আমাকে বলেছে : 'শুধু একটি মুখাকৃতি'।

[illegible] দুবার ভ্রমণে বহু স্থানে ঘুরে বেরিয়েছি কিন্তু আমাকে বহুবার 'হোঁচট খেতে হয়েছে এই কারণে যে, পারস্যের নবীর সন্ধান করতে এবং তার অনুসারীরা পরবর্তী সময়ে ধর্মের যে ধ্যান-ধারণা উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি মূলত কোথায় থাকতেন? ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এসব কথা যেন কোনো কালেই শোনেনি। তারা এগুলোকে লোককাহিনী বলত অথবা বিদেশিদের ইন্ধন রয়েছে এসব কেচ্ছাকাহিনী ছড়াতে, তাই প্রচার করা। তাদের সামনে জরাথ্রুস্টের ছবি প্রদর্শন করা হলেও তারা সরাসরি অস্বীকার করে, জরাথ্রুস্টের শিক্ষা যেন ধূসর হয়ে গেছে। এত বিরোধিতা এবং অনীহা সত্ত্বেও জরাথ্রুস্ট আজও জীবন্ত।

পামির মালভূমির দিকে রওনা হওয়ার সময় শুধু মনে পড়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যের কথা। ১৯৯০ সালে পতন শুরু হয়। বহু সময় মস্কোতে কাটিয়েছি। অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছি। পতনের কারণ সম্পর্কে তাদের অভিযোগ মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে রাশিয়ার মিল ঘটেনি কখনো। আমরা আরো বুঝতে পারলাম, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনস্থ মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি এবং জলবায়ু বেশ ভিন্ন প্রকৃতির।

শীতকালে মস্কোতে তুষারপাত হলেও অ্যাপার্টমেন্টগুলো যেন পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুউচ্চ দালানগুলোতে হিটার ব্যবস্থা করা হয়। নগরীর প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যবসা-বাণিজ্য, বাসা-বাড়িতে তাপ পরিবাহী যন্ত্র সেট করা হয়। দালানগুলোতে এমনভাবে প্লাস্টার দেয়া হয়, যাতে হিম বাতাস প্রবেশ করতে না পারে এবং তাপ প্রবেশ করতে পারে সেভাবে তৈরি হয় দালানগুলো। কাউকে নিজ উদ্যোগে তাপমাত্রা মেশিন স্থাপন করতে হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো অনুমতি এবং সাহায্য করা হয় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব দক্ষিণে, যেন মরুভূমি এবং জীবন যে কত দুর্বিষহ, তা জানা যায় ইহুদি [illegible] এবং ঐতিহাসিক ড. লেজার রামপলের কাছ থেকে। তিনি মধ্য এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা তুলে ধরেন। তার ৫৬ বছরের নির্বাসিত

জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। নির্বাসন কালীন সময়ে তিনি বোখারা ও সমরকন্দে ছিলেন।

তৎকালীন সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের শাসনামলে ড. লেজার রামপলের মতো বহু ব্যক্তিকে পালিয়ে যেতে হয়। তবে সবাই যে সৌভাগ্যবান ছিল, তা নয়। বহু মানুষ পালিয়ে যাওয়ার সময় সোভিয়েত সামরিক জান্তার হাতে গ্রেপ্তার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। নিজ বাসভবন থেকে নিগৃহীত হয়। বিদেশে পালিয়ে গিয়ে জীবন নির্বাহ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ হয়েও তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। তবে অনেকেই ফিরে এসেছিল। ড. রামপলের চাচা থাকতেন প্রাগে। তিনি চেকস্লোভাকিয়ার সামরিক বাহিনীতে চাকরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাকে বহেমিয়ান বনাঞ্চলে পাঠানো হয়। আর সে সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী পুরো প্রাগ দখল করে।

১৯৪৬ সালে রামপলের চাচাসহ তার গ্রুপের সব সেনাসদস্যকে লাল ফৌজ গ্রেপ্তার করে। তাদের জোরপূর্বক কাজাখস্তানে পাঠানো হয়। ওই অঞ্চলে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে সাহায্য করতে এবং তাদের 'রোগ নিরাময়ের কেন্দ্রে' কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে যেসব জোয়ান এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে গুটি বসন্ত হয়েছিল তাদের চিকিৎসাসেবা করা হতো এই রোগ নিরাময় কেন্দ্রে। এ সময় শুধু গুটি বসন্ত নয়, আরো অনেক রোগ ছড়িয়ে পড়ে। একদিন যাত্রাপথে তাদের ওপর হামলা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উঁচিয়ে ট্রাক থেকে লাফ দেয়। শত্রুপক্ষ ট্রাক থেকে সেনাসদস্যদের নামিয়ে দেয় এবং তাদের পরনের জামা খুলে ফেলে। আমার কাছে এটা খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাজ মনে হলো। চাচা আমাকে বহু বছর পর এ ঘটনার কথা বলেছিলেন, 'শত্রুরা সেনাবাহিনীর জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা চলে গেল। সম্পূর্ণ খালি গায়ে তারা আবার ট্রাকে উঠল।' তিনি এ ঘটনা চেকস্লোভাকিয়ার সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের জানালেন। কোনো প্রতিকার পাননি।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সামরিক নিজের মতো করে নতুন করে যাত্রা শুরু করলেন চাচা। এক বছর পর, বিধ্বস্ত চেকোস্লোভাকিয়ার সামরিক বাহিনী আধুনিক মানের গড়ে তুললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্য, ড. রামপল মধ্য এশিয়ায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সোভিয়েত প্রশাসন ইহুদিবাদী বিরোধী প্রচারণায় তথ্যকেন্দ্র পরিণত করে উজবেকিস্তানকে। তাকেও ইহুদিবিরোধী প্রচারণায় পাঠানো হয়। রামপল ভাগ্যবান যে তিনি জীবিত ফিরে এসেছিলেন।

কোনো পক্ষের দ্বারাই তিনি নির্যাতনের শিকার হননি। শান্তিমতোই জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর স্ট্যালিন নিজেও ধর্মীয় গুরু হওয়ার চিন্তা করেছিলেন। একটি জাতির উন্নতির সর্বোচ্চতম পথ কি তাই ছিল, তার চিন্তাতে তারা এবং ইসরায়েলের উপজাতি-গোষ্ঠীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি এই শিক্ষা পেয়েছিলেন প্রাচীন আসিরীয় উপজাতি-গোষ্ঠীর কাছ থেকে। এই জাতি-গোষ্ঠী কীভাবে বিতাড়িত হয়েছিল, নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বাইবেল আদ্যোপান্ত তিনি পড়েছিলেন। তিনি সবার সেবা করার চিন্তা করতেন। এক পর্যায়ে ধর্মীয় চিন্তা বাদ দিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শরিক হন।

সমাজতান্ত্রিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন স্ট্যালিন তাতার জাতি এবং ইসরায়েলের উপজাতি আরবদের আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন করা যায় কীভাবে–এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রাচীন আসরীয় সভ্যতার ওপরও তিনি প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। আর তা ছড়িয়ে দিতেন সবার মাঝে।

মুসলমানদের কাছ থেকে ড. রামপল নতুন ধারণা পেয়েছিলেন, যেটা তার জীবন চলার ক্ষেত্রে নতুন আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিল। তিনি শিখেছেলেন নবী জেরেমিয়ার বাণী। এই নবীর বক্তব্য ছিল : 'বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করো, সুন্দর বাগান পরিচর্যা করো, সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করো, সন্তানকে ঠিকমতো লালন-পালন করো, যে দেশে বাস করো সেখানকার শান্তির জন্য কাজ করো। এতে তুমিও শান্তি পাবে। এটাই আমার দর্শন।' নির্বাসিত ইহুদিরা স্থানীয় অসিরিয়াবাসীদের সমর্থন কীভাবে আদায় করেছিল, সেটাও লিপিবদ্ধ করেছেন ড. রামপল।

'তারপর কী ঘটল?' তিনি আমাকে বললেন, 'মধ্য এশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায় একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মধ্য এশিয়ার এবং সারা বিশ্বের মুসলমানরা নিজেদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে : শিয়া, সুন্নি এবং ইসমাইলি সম্প্রদায়। এই অঞ্চলের মানুষের প্রথম ধর্ম ছিল জরাথ্রুস্টবাদ, ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইরানের জনগণ জরাথ্রুস্ট ধর্ম পালন করত, সর্বত্র জরাথ্রুস্টীয় মতবাদ প্রসার হতে থাকে। তুমি যদি আমার এ কথা বিশ্বাস না করো তাহলে তাদের ধর্মীয় মূর্তিগুলোর দিকে লক্ষ করো। প্রত্যেক স্থানে জরাথ্রুস্টের প্রতীক রয়েছে।' হঠাৎ করেই ড. রামপল কী যেন ভাবলেন? আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং আমাকে বললেন, 'একটু বসো, আমি তোমাকে একটা ছবি দেখাব।'

একজন ইহুদি হয়েও তিনি এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার ৫৬ বছরের নির্বাসিত জীবনে একবারও মনে হয়নি তিনি খুব কষ্টে আছেন। বরং যেখানে

গেছেন, সেটাই নিজের দেশ মনে করেছেন। ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতা তাকে নিষ্ঠুর হতে দেয়নি। তবে একটা বিষয়ে তিনি কিছুটা কষ্ট পেতেন।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন রামপল। আলমারির কাছে গেলেন। আলমারিতে বই, কাগজপত্র স্তূপ হয়ে আছে। মেঝেতে অবশ্য কোনো বই রাখেননি। আলমারি খোলার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভেতরে এবং চারপাশে ইঁদুর দেখা গেল। ময়লার আস্তর জমে গেছে। তিনি আলমারি থেকে একটি বই নিয়ে এলেন। আমার সামনেই খুললেন। এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন। 'এই ছবিটি দেখো। তুমি কি স্বাভাবিক অবস্থায় কখনো এই চিন্তা করতে পারবে, মসজিদে কারো ছবি থাকবে?"

এ দৃশ্য দেখতে পেয়েছি বোখারায়। সেটা ছিল জুইবার জেলায়। সেখানকার মানুষজন নিঃস্ব খালি হাতে বের করে দেয়া হচ্ছে–তারা নিজ ভূমিতে বহিষ্কৃত, তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে, আমি এর কারণ জানতে পারিনি। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে পারস্য আঞ্চলীয় চরিত্র সম্পর্কে অভিভূত করার বা বর্ণনা করা ছিল খুবই বিপজ্জনক। শুধু লিখিত পাঠ্যলিপি ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফ। কিন্তু মানুষজন যেসব বই এনেছিল তারা সেগুলো পবিত্র মনে করত। তাই তারা নিজ হাতে সেগুলো পোড়াতে বা ধ্বংস করতে পারেনি। তারা গোপনে এসেছিল এবং বইগুলো মসজিদের উঠানে রেখেছিল। আমি মসজিদের ছাদে উঠলাম এবং অনেক নাটকীয় ঘটনা দেখতে পেলাম মসজিদের উঠানে ফেলে রাখা বইগুলো বর্তমানে তাসখন্দের জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। 'দশম এবং একাদশ শতাব্দীর যেসব পাণ্ডুলিপি, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। তুমি ভালো করে জানো, পারস্যর এ ঘটনা মহান দার্শনিক ইবনে সিনা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বোখারার লাইব্রেরিতে এসব বই দেখেছেন এবং তা পাঠ করেছেন।'

ড. রামপল একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়ালেন। সেই দেয়ালে ইসলামিক সাধু, এক ডাকাত এবং একজন অসাধু ব্যক্তির ছবি আঁকা রয়েছে। মুসলিম সাধু প্রার্থনায় মগ্ন। মুসলিম এ সাধুর কপালে লাল আলো' বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সূর্যের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। কে এই সাধু? হতে পারেন নবী, অথবা ওলি। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে এটি বলতে পারি, যার ছবিটি ফুটে উঠেছে তিনি প্রাচীন ইসলামি আদর্শের কোনো নবী বা রাসুল নন। কপালে আলোর বিচ্ছুরণ ঠিকমতো লক্ষ করেছ কি? সনাতনী চিন্তা দর্শনে ফিরে গেলে এটা জরাথ্রুস্টের ছবি মনে হবে। এই ছবি এঁকেছেন খ্রিষ্টান চিত্রশিল্পী। তিনি এই মহান সাধকের মুখমণ্ডলের চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন।

'মূল ছবিটি কোথায়?'

'বহুদিন পূর্বে মসজিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,' বিষণ্ণ বদনে কথাটি বললেন ড. রাহমান। কিছুক্ষণ পর হতাশা কাটিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে ব্যক্ত করলেন, 'কিন্তু মানুষের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সোভিয়েত বাহিনী পারেনি উজবেকিস্তানের মানুষের ধর্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দিতে, তার একমাত্র প্রমাণ তাদের পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং আদর্শ। আর এ কারণে মৌলবাদীদের উচিত সোভিয়েত বাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।

ক্যামেরায় যখন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে তখন ঠিকমতো দেখলে মনে হবে কাল্পনিক। বহুদিন পূর্বে সে মসজিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর এখান থেকেই প্রাচীন চিত্রশিল্পীরা ধারণা নিয়ে নিজেদের মতো করে ছবি এঁকেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলেও সেখানকার সাধারণ মানুষ ধর্মকে ভুলে যায়নি। আর এ কারণেই মৌলবাদীরা তাদের ধন্যবাদ জানাতে পারে। মধ্য এশিয়ার দিকে একবার দৃষ্টি ফেরালে সেখানে দেখা যায়, মানুষ কী সুন্দরভাবে তাদের বিবাহিত জীবন পালন করে, শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পালনে নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তুমি দেখতে পাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রথা কতটা দৃঢ়। ইসলাম বিজয়ের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার এই দৃঢ়তা ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় ইসলামের বিজয় হয়েছে।

সেখানকার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস খুবই উন্নত। সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় ইসলামের জাগরণ হয়।

ড. রাহমানের এসব তথ্যকে সমর্থন করলেন আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো চিত্রশিল্পী। তিনি মস্কোর অধিবাসী। তার নাম দৌলত খোদানাজারভ। তিনি রাজনীতিবিদ এবং চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও গোঁড়া নন। তিনি পরিপাটি ও শৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ইসলামি আদর্শ এবং চিন্তাধারা নিয়ে ছবি তৈরি করেন। যেখানে নতুন যা কিছু দেখেন এবং নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখেন। আর খুবই হাসিখুশি ব্যক্তি। প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ উপভোগ করে কাটান। তিনি জানেন কীভাবে ক্যামেরার সামনে ছবির মূল বিষয় উপস্থাপন করতে হয়। এ বিশাল ব্যক্তিত্ব তাজিকিস্তানের ইসলামিক দলের হয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত হেরে যান। এ প্রসঙ্গে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হলে কোনো দুঃখ বা কষ্ট না নিয়ে বরং আনন্দের সঙ্গে বলতেন, 'তোমাদের উচিত আমাকে ধন্যবাদ জানানো। নির্বাচনে হেরে গিয়ে আমি বরং মুক্তি পেয়েছি।' তার হাতের কাছে ছিল একটি

টুকরো পুরনো কাগজ। সেই কাগজে দ্রুত একজন মানুষের ছবি আঁকলেন, 'আমি যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিততাম তাহলে আমাকে হত্যা করা হতো।'

শব্দটি উচ্চারণ করার পরই কাগজে আঁকা সেই মানুষটির ছবিটিতে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিলেন।

খোদানাজারভকে তাজিকিস্তানের ইসলামপন্থি দলগুলো সমর্থন করেছিল, তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'মধ্য এশিয়ায় ইসলাম এত দৃঢ় এবং শক্তিশালী হওয়ার কারণ এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে জরাথ্রুস্টবাদের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে।'

'এবং এটা বিশ্বাস,' তিনি বর্ণনা করলেন, 'এ বিশ্বাস আজও রয়েছে, জরাথ্রুস্টবাদ ভবিষ্যতের আদর্শ এবং দিক নির্দেশিকা। আপনি জানেন কি জরাথ্রুস্টবাদীরা কি বিশ্বাস করে? জিতলেই বিপদ হতো। এমনকি আমাকে হত্যা করা হতো। শত্রুপক্ষের একটুও হাত কাঁপত না।' তার এ বক্তব্য শুনে কিছুটা বিচলিত হয়েছিলাম। খোদানাজারভকে তার দেশ এবং দল মুক্তি দিয়েছিল। তিনি দল এবং দেশ দুটোই ছেড়ে মস্কোতে নির্বাসিত জীবন কাটান। তবে তার একটি মন্তব্যে আমি খুব অবাক হয়েছি। তিনি আমাদের জানান, মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ধর্ম যে এতটা দৃঢ়তাপূর্ণ এবং শক্তিশালী হয়েছে, এর একটাই মাত্র কারণ, এর প্রতিষ্ঠাতা জরাথ্রুস্টবাদ। এটা বিশ্বাস। যে বিশ্বাস আজও বহাল। জরাথ্রুস্টবাদ ভবিষ্যতের আদর্শ। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাস কী, এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বরং তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন–পৃথিবী একটি যুদ্ধক্ষেত্র। সর্বত্র অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ভালো-মন্দের লড়াই চলছে সব স্থানে। প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য দুষ্টের দমন করা। ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করা। সত্য ও ন্যায়কে আঁকড়ে ধরা। জরাথ্রুস্টবাদীরা এ মতে বিশ্বাসী ছিল। তারা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু পরিশেষে তারা হেরেছে। এর একটাই কারণ–তা হচ্ছে, জরাথ্রুস্টবাদ দর্শন পৃথিবীতে মানুষের কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। তারা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, তখন তারা এই দর্শন তত্ত্বকে একটি ধারণা মনে করত।

'পৃথিবী দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। এই প্রথমবারের মতো আমরা বলতে পারি বিশ্বসম্প্রদায়ের কথা। আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যই মানবতাবাদী দর্শনের খোঁজ করতে হয় এবং ইসলাম, জরাথ্রুস্টারের মতো বার্তাবাহক তিনি সেই দর্শনের প্রস্তাব দিয়েছেন।'

খোদানাজারভ এমনভাবে জরাথ্রুস্টের নাম উচ্চারণ করলেন, যেমনভাবে প্রাচীন সময়ের লোকেরা তাকে সেভাবেই ডাকত।

মুসলিম রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রাক-ইসলামিক যুগে নবীর নাম শুনলে অবাক হতে হয় বৈকি। মুসলিম রাজনীতিবিদ খোদানাজারভের পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল জরাথ্রুস্টের প্রতি। তিনি মুসলমানদের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, মধ্য এশিয়ার ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে তেমন বেশি জানা ছিল না, এদের ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন ধারণা পেলাম। মধ্য এশিয়ার ধর্মীয় পরিচয় আমার কাছে একেবারে নতুন, খোদানাজারভের কথা শুনেছিলাম আর তখনই মনে হচ্ছিল তাঁর নবীত্ব কতটা প্রবল এবং একই সঙ্গে মুসলমানরা দিনকে দিন ধূসরে পরিণত হচ্ছে।

ঘটনা ঘটেছিল শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। মানুষ তখন ভালো-ভাবে বোঝার জ্ঞানার্জন করতে পারেনি। জরাথ্রুস্টবাদীরা হেরে গেলেও পৃথিবীকে নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করে যায়। খোদানাজারভ এক টুকরো কাগজে বিশ্ব মানচিত্রের ছবি আঁকলেন। মানচিত্রের চারপাশে রিং আঁকলেন। এটা দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন পৃথিবী দিনকে দিন ছোট হয়ে আসছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে বিশ্ব সম্প্রদায়। প্রত্যেকে তার নিরাপত্তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে মানবতাবাদী দর্শন। ইসলাম পারে মানবতাবাদী পথের দর্শন দেখাতে। সে দর্শনের বার্তা প্রথম পৌঁছে দিয়েছেন জরাথ্রুস্ট। এ ধ্যান-ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম নবী। এতে অনেকেই অবাক হতে পারে। মধ্য এশিয়ার ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মানুষের আচার-আচরণ বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সরে পড়েছে। খোদানাজারভের কথা শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল মানুষের মধ্যে ইসলামি চিন্তা-চেতনা দিনকে দিন যেন ধূসরে পরিণত হচ্ছে। মধ্য এশিয়ায় ইসলামিক প্রভাবের পরিবর্তে অন্য ধর্মের প্রসার ঘটছে। পূর্বের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাবে ততই দেখা যাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ। তাদের দর্শনও ভিন্ন। সেখানে ভারতীয় এবং চীনের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। মূলত পৃথিবী তিনটি দর্শনে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম শতাব্দীতে গান্ধারা সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটেছে। এটা ঘটেছে আফগানিস্তান এলাকায়। এরপর এসেছে গ্রিক সংস্কৃতি। মহাবীর আলেক্সান্ডার এক প্রান্ত জয় করে গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছেন। তারই উত্তরসূরিরা পারস্য, ভারত এবং চীনে ছড়িয়ে পড়েছে। গান্ধারা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন কুষান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তা-চেতনা নিজ শাসিত রাজ্যে ছড়িয়ে দেন। তৃতীয় শতাব্দীতে আফগানিস্তানে নির্মিত হলো বৌদ্ধের বামিয়ান মূর্তি। অবশ্য বিশ শতকে আফগানিস্তানে

তালেবান শাসকরা মূর্তি ভেঙে ফেলে। বর্তমানে ভারত থেকে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম আদর্শস্বরূপ। এ ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে, বুদ্ধের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

এটা ভাবলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যে, বোখারা এবং সমরকন্দ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মূল স্রোতধারা পাওয়া গেছে। যদিও তা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের কারণে অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে গেছে।

ইরান হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এর অতীত ইতিহাস সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তি মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.) ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে জাহিলিয়া যুগের কথা ভুলে যেতে চায়। সেটা ছিল অন্ধকার যুগ। তখন অত্যাচার আর নির্যাতনের শেষ ছিল না, ছিল না মানুষের কোনো সম্মান। নারী জাতিকে অবজ্ঞা করা হতো। আরবরা ইসলামের প্রসার ছড়িয়ে দিল। মুসলমানদের বিজয় হলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। হাজার বছর ধরে চলল মুসলিম শাসন। কিন্তু এর পরই শুরু হলো অধঃপতন। পারস্যরা কখনো ভুলতে পারে না তাদের সেই অতীত গর্বের কথা। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসি তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'শাহনামা'য় সব কিছু বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শাসনের কাহিনী বর্ণিত আছে এ মহাকাব্যে। এমনকি প্রাচীন যুগের আর্যদের কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। এ মহাকাব্যে ইরান-তুরানের মিশ্রণের কথা বলা হয়েছে। নবী জরাথুস্ট এবং তার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আহুরা মাজদা এবং শয়তান অ্যারিম্যান কী করে তাও বলা হয়:

জরাথুস্ট, এই নগরীর সবচেয়ে প্রিয় নবীদের একজন
তিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন ফেরদৌসির আগে
শাহ তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো
তিনি এ নগরী ঘুরে বেড়াতেন সার্বক্ষণিক
মানুষকে শেখাতেন নতুন ধর্মের বিশ্বাস
তিনি ইরানকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতেন
মাঝেমধ্যেই বিশাল কোনো গাছের ছায়ায় বসে পড়তেন
মানুষজনও তার পাশে বসত
জীবন যেন স্থবির হয়ে পড়ত
ভক্তরা তার কথা শুনত
জ্ঞান এবং বিশ্বাস ছিল এর মূলমন্ত্র।

পারস্য ভাষার এই কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করা হলেও একেবারে সঠিক রস আস্বাদন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবিক অর্থে তা সম্ভবও নয়। পার্সি ভাষায় রচিত এই কবিতার ব্যাখ্যা শাহনামা যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তা পাঠকের জন্য অবশ্যই সুখকর পাঠ্য।

মহাকবি ফেরদৌস রচিত শাহনামা কাব্য গ্রন্থে জরাথ্রুস্টীয় মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে সম্পর্কে উপাখ্যান এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের কথা এসেছে। অতীত স্মৃতি যেন উচ্চারিত হয়েছে। এমনকি ইরানের সমাজে ইসলাম ধর্মের বর্ণনা এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবাই রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে, তবে এর অস্বাভাবিক গুণ রয়েছে, আবার এটাও সত্য, সহজ-সরল থেকেও বিষয়টি জটিল। 'এটাও জোর দিয়ে বলতে হয়, জরাথ্রুস্টীয় মতবাদ এবং বিশ্বাস চিরকাল ছিল এবং তা কখনেই ধ্বংস হবে না,' মধ্য এশিয়ার উদ্দেশোই ড. রামপল এ কথা বলেছেন। ইরানেও প্রাক ইসলামের ইতিহাসে খুব সুখকর ছিল না। তবে তারা তেরোশ বছরের এসব অজ্ঞ, অন্ধকারের কথা ভুলে যেতে চায়।

অতীত এসব স্মৃতিকথা ইরানি বয়স্করা বর্ণনা করে আর নীরবে চোখ বোজে। তাদের মনে হয়, কী সুন্দর দিনই না ছিল।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিলন মেলা

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকের কথা। লন্ডনের বিবিসি প্রধান কাটানরা বুশ হাউসে বসে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আলাপ-আলোচনায় এবং গল্পগুজবে মগ্ন। তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকও ছিলেন। তারা পরিকল্পনা করছিলেন কীভাবে দুই দেশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর করা যায় কীভাবে সে আলোচনা চলছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, সংবাদ উপস্থাপনকারী এবং পরিকল্পনাবিদগণ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। বিভিন্ন দেশ ছেড়ে আসা অভিবাসিত নাগরিকগণও ছিলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের যেন এ এক মিলন মেলা। ব্রিটিশ কলোনি-উত্তর নব্য স্বাধীন দেশের নাগরিকরা দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে তাদের মন্তব্য তুলে ধরছে। সবার মধ্যে নব উদারতা থাকলেও চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বহু পরিকল্পনা বেরিয়ে আসছিল। অনেকের মধ্যে সংশয় ছিল। এমনকি তাদের সরকার এবং প্রশাসন সঠিক কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারছিল না। এ পৃথিবীতে এত বড়

সম্মেলন আর কোনো সংবাদপত্র অফিসে হয়নি। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এসেছিল সবার মধ্যে। সবাই পরিবর্তন চেয়েছিল। বৈঠকের পর বৈঠক, তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল ঘন্টার পর ঘন্টা। দিনের পর দিন তা চলেছিল।

তড়িঘড়ি করে বহু দেশের সরকার দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয় যে, সেগুলো ছিল ভুল। পরিসমাপ্তি ছিল খুবই দুঃখের এবং যন্ত্রণাদায়ক। এ সময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটল। উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত এক তরুণ এবং মেধাসম্পন্ন সাংবাদিক বলে উঠলেন, তিনি এবং তার সঙ্গে আগত সাংবাদিকরা এখানে আর থাকতে পারছেন না। দেশে চলে যাবেন। সত্যিই তারা চলে গেলেন পরের দিন। তারা কোথায়–এ প্রশ্ন ছিল সবার মধ্যে। দেশের মানুষের প্রত্যাশা এবং আকাঙ্ক্ষা মেটাতেই ফিরে গেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন না শত্রুও তার পিছু ধাওয়া করছে। দেশের মাটিতে সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে। এ তো গেল উত্তর আফ্রিকার একটি সামান্য ঘটনা। এবার আসি পার্সীয়ার পূর্বাঞ্চলের ঘটনায়। এই এলাকায় আমি বিবিসির প্রোগ্রাম প্রডিউসার হিসেবে বহু দিন কাজ করেছি, মিশ্র অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। সেখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদের অভাব ছিল না। দূরদর্শী নেতা ছিলেন পার্সীয়ায়। এখানকার জনগণের সুখ-শান্তি এবং উন্নতির জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। সুখেই দিন কাটছিল তাদের। সেখানে মার্কসীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। যারা সরকারের নীতি নির্ধারণে, প্রতিটি কাজে বিরোধিতা করত। ভাবতে অবাক লাগে তারা পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, হৃদয়ে যেন তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকত যুক্তরাষ্ট্রের কথা, এবং সে দেশের ছবি এবং গান।

যদিও এই সময়কাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, ইরানের গোয়েন্দা পুলিশ অবশ্য কিছু তথ্য জানে। কেউই রেজা শাহ পাহলেভিকে সমর্থন করত না, কিন্তু প্রচার মাধ্যমে এই কথাটি যে কেউ বলবে সেই সাহস কারো ছিল না, অথবা কোনো মানুষই জানত না, ইসলামিক রাষ্ট্রের সৃষ্টির কথা। সাধারণ মানুষ মার্কসবাদ গ্রহণ করেনি। তাদের একমাত্র দর্শন ছিল ইসলাম। রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামিক করার কাজে অনেকেই গোপনে নিয়োজিত ছিল। ছোট ছোট গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় একত্র হয়ে আলোচনা করত এবং কাজ করত। রাষ্ট্রের কোনো শীর্ষ ব্যক্তির অসততাকে ঘৃণা করত বয়স্ক ব্যক্তিরা তরুণদের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ করত–অজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক এবং সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ব্যাখ্যা দিত। দুটি পক্ষই একে অপরকে প্রতারক বলে চিহ্নিত করত। কিন্তু সবাই একটা

ব্যাপারে ভয়ে থাকত যে, রেজা শাহ পাহলেভি পারস্যকে কখন কী করে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মুহাম্মদ রেজা শাহ পাহলেভির অধীনস্থ ছিলেন আর্য মেহের, পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিষ্ঠাতার সন্তান রেজা খান–যিনি উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের অশিক্ষিত সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও পারস্যের ক্ষমতা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন–এখান থেকেই ইরানের রাজনীতি এবং সামাজিক অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীলতার মধ্যে আবর্তিত হয়, সেইসঙ্গে রেজা শাহ পাহলেভি বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন তো ছিলই। কেউ যদি সামান্যতম বিরোধিতা করত তাকে হত্যা করা হতো। বিরোধী পক্ষকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হতো। এত অত্যাচার, নির্যাতনের পরও রেজা শাহ পাহলেভির বিপক্ষে প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। বরং তা দিনে দিনে বেগবান হয়েছে।

রাস্তায় রাস্তায় বিদ্রোহ। সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতা, বিরোধী পক্ষের হাজার হাজার কর্মী জেলে। জেলখানা যেন উপচে পড়ছে। সীমাহীন নির্যাতন চলতে থাকে। এমনকি জেলখানায়ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মানুষ মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। অত্যন্ত ক্ষমতালোভী রেজা শাহ পাহলেভি বিশ্বাস করতেন, সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে সাধারণের ওপর নির্যাতন স্বাভাবিক ব্যাপার।

তার সাম্রাজ্যের শেষদিকে তিনি ২৫০০ বছরের পুরনো আকামেন সাম্রাজ্যের বর্ষবরণ উৎসব পালন করেন। এতেও জনগণের মন দুর্বল হয়নি তার প্রতি।

আকামেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বিতীয় সাইরাস। এই মহান সম্রাট, যিনি কাজ করছিলেন ইরানি উপজাতি মেডেস এবং পার্সিয়ানদের মধ্যে ঐক্য এবং সুসম্পর্ক গড়ার। তার শাসনামল ছিল ৫৫৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। প্রকৃত অর্থে তার শাসন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আড়াই হাজার বছর চলু ছিল। এটা শেষ হয় ১৯৪১ সালে। আর প্রকৃত অর্থে রেজা শাহ পাহলেভির যুগ শেষ হয় ১৯৭১ সালে। পারস্যের এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস যদি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ইরানের জাতীয় ইতিহাস রেজা শাহ পাহলেভির শোভাযাত্রা, তার ক্ষমতা এবং মানুষকে প্রলোভিত করার কথা। ইরানের সর্বত্র জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হলো। 'যখন সমস্যায় পড়বে, তাস খেলে সময় কাটাও।' আমার মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বন্ধু, যে কি না হলিউডের ছবি নিয়ে ব্যস্ত থাকত, সে-ই এ কথা বলেছে, 'কিন্তু এই ধারণা তার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। মানুষ সব সময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়, অতীতকে মনে রাখে না।'

বাস্তবে দেখা গেছে, বর্ষবরণ উৎসবে সাধারণ মানুষের কোনো আগ্রহ ছিল না। জনতাকে বিশাল জনসভায় রিংয়ের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। তাদের প্রতি বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর কড়া শাসন ছিল। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নাচ-গান হচ্ছিল, তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল শুধু বিদেশি অতিথি এবং প্রচারমাধ্যমের ব্যক্তিবর্গের। এটা এমন অবস্থা যে, রেজা শাহ পাহলেভি ইরানের জনগণের ওপর তার একক কর্তৃত্ব এবং স্বৈরাচারী মনোভাব প্রকাশ করলেন, তিনি যেমনভাবে পূর্বাঞ্চলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বংস করে দিয়েছেন, সেটা তিনি সারা দেশেই সর্বত্র পারেন। ঐতিহ্যবাহীক এই শোভাযাত্রা ছিলেন ৬৯টি দেশের গণমান্য শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ, তাদের মধ্যে ২০ জন রাজা, পাঁচজন রানি, ২১ জন রাজকুমার এবং রাজকুমারী, ১৬ জন রাষ্ট্রপতি, চারজন উপরাষ্ট্রপতি, তিনজন প্রধান মন্ত্রী এবং দুজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই শোভাযাত্রা এবং বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এমনই ছিল, যা রেজা শাহ পাহলেভির ভাষায়, 'রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান শীর্ষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মিলন মেলা।' টেলিভিশনে এক কোটি দর্শক এই নান্দনিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে। বিবিসির পারস্য শাখার প্রতিনিধি সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

এই শোভাযাত্রা ও নাচ-গানের অনুষ্ঠান এতটাই নান্দনিক ও সুন্দর হয়েছিল, যার বর্ণনা করেছেন সেসিলন বি. ডিমিনি। বিধ্বস্ত পার্সেপোলিস নগরী, পূর্ব ৬৮৯ শতাব্দীর দারিউসের রাজধানী, যা কি না মহামতি আলেক্সান্ডার নিজ উদ্যোগে ধ্বংস করেছেন, সেই বিধ্বস্ত নগরীর সামনে থেকেই শোভাযাত্রা শুরু হলো। শোভাযাত্রার পূর্বমুহূর্তে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে দাঁড়ান। তারা চায়নায় লিমোজেন এবং বার্কাট ক্রিস্টাল গাড়িতে ওঠেন। পেছনে পদাতিক বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল এবং ড্রাম বাজাতে থাকে। মেডেস, পারস্য, আকামেনীয়, সেলুসিডস, পার্থিয়ান, সাসনীয়, আব্বাসীয়, সাফভীর এবং তুরস্ক জাতি-গোষ্ঠী–এরা সবাই যেন ঐতিহাসিক গতিধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এসব দেশের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উজ্জ্বল এবং দামি পোশাক পরিধান করেছে, তাদের প্রসাধন প্রত্যেককে আকৃষ্ট করেছে। কেউ পরেছে আলখাল্লা পোশাক, কারো বিশাল শোভামণ্ডিত দাড়ি, অনেকে নিরাপত্তার জন্য হেলমেট দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে, চারপাশে নিরাপত্তা বাহিনী, সব কিছু সুষ্ঠু-সুন্দরমতো চলছে। এই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার অংশ নিতে পেরে সবাই নিজেকে ধন্য মনে করছে। তাদের সব প্রচেষ্টা উজাড় করে দিয়েছে। মোড় ঘুরলেই বিশাল বনাঞ্চল শুরু। সে জন্য

নিয়ম-শৃঙ্খলামতো এগোচ্ছে সবাই, যাতে কোনো বিপদ না হয়। সামনে রয়েছে ব্যানার এবং মাথার ওপর রয়েছে বেলুন। শোভাযাত্রায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনেকেই গাড়িতে উঠল। কেউ চড়ল ঘোড়ায়, বাকিরা হেঁটে সামনে এগোতে থাকে। কেউই বাসে উঠল না। প্রাচীন মুসা, পার্সেপোলিস, এক ব্রাতানা, নিনেভি এবং ব্যাবিলন রাজপ্রাসাদ ভ্রমণ করে তারা কেউই বাসে ওঠেনি। এটা যেন এমনই যে, আসিরীয়রা যখন ইসরায়েলিদের কাছে পরাস্ত হলো, তারাও বহু পথ হেঁটে পাড়ি দিয়েছিল, ইসরায়েলিরা তাদের প্রতি নেকড়ের মতো আচরণ করেছিল।

ইরানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তেরোশ বছরের মধ্যে এই শোভাযাত্রা ছিল সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক অনুষ্ঠান। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি ছিলেন, সেই রেজা শাহ পাহলেভি নিজেই তার উত্তরসূরির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন–কারণ যদিও সাইরাসের রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির সুনির্দিষ্টভাবে তখনো চল্লিশ মাইল দূরে প্যাসাগার্ডে–সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাষণ দিলেন :

সাইরাস, মহান রাজা, রাজাদের রাজা, একেমেনিয়ানের রাজা,
ইরানের রাজা, আমি ইরানের শাহানশাহ,
আমি এবং আমার জাতির পক্ষ থেকে তোমায় সালাম জানাচ্ছি
সাইরাস, মহান রাজাদের রাজা, মহৎ থেকে মহত্তর।
ইরানের সেরা বীর নায়ক। বিশ্ব শান্তিতে নিদ্রিত থাকো।
আর আমরা জেগে আছি তোমার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য।

পার্সেপোলিসে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এক পর্যায়ে ক্লান্ত বোধ করল। তারা বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে, যদিও তাদের আনন্দদানের জন্য নানা রকম মদ সরবরাহ করা হচ্ছিল। এরই মধ্যে কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ নগরীর প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী বস্তু, স্থান পরিদর্শন করে সময় অতিবাহিত করল। যদিও এর মধ্যে জানা গেল স্মরণকালের এই শোভাযাত্রায় অংশ নেননি ব্রিটিশ রানি এবং ওয়েলসের রাজকুমার, পররাষ্ট্র দপ্তরের এক শীর্ষ কর্মকর্তা আমাকে বলেছিল :

'এই শোভাযাত্রায় ভুলটা কোথায় ছিল, যাই হোক? সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণবাসী কি চিন্তা-ভাবনা করছে তা কোনো ব্যাপার নয়। আমরা রেজা শাহ পাহলেভিকে তত দিন ক্ষমতায় রাখব যত দিন প্রয়োজন।' এর এক সপ্তাহ পর ইরানের সাধারণ মানুষ শাহ পাহলেভির জন্য প্রার্থনা করে। তাদের প্রার্থনা ছিল।

'হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এ পৃথিবীর স্রষ্টা এবং করুণাময়ী, বুদ্ধিদাতা, সর্বোত্তম প্রজ্ঞাবান এবং মানবকল্যাণে চিন্তা করেছেন, যিনি আমাদের পবিত্র ভূমিতে অফুরন্ত আশীর্বাদ এবং মঙ্গল করেছেন, এই স্বর্গীয় ভূমি ইরানে নতুন সম্রাট আবির্ভূত হলেন–তিনি হচ্ছেন আর্য মেহের।'

বিবিসির পারস্য শাখার কর্মচারী, যারা অধিকাংশই সে দেশের অধিবাসী, এমনকি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসীরা হতাশ হয়। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মোহাম্মাদ রেজা শাহ পাহলেভি নিজেকে সাইরাসের পারস্যের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সম্রাট ভাবতেন–তিনি এমনই একজন সম্রাট ছিলেন, যিনি নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন এবং কারো প্রতি অবিচার করতেন না। কিন্তু রেজা শাহ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির, তিনি তার শত্রুকে পরাস্ত করতে সব ধরনের অত্যাচারের আশ্রয় নিতেন। রেজা শাহ তার উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন আর তিনি তা করলেন ঈশ্বরের কৃপায় এবং প্রায়োগিক দিক থেকে, এটা মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর সৃষ্টিকর্তা নয়, কিন্তু এটা সাইরাসের ঈশ্বর, তিনি জরাথ্রুস্টের ঈশ্বর।

'সম্ভবত' শীর্ষ এবং অভিজ্ঞ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির পরামর্শে, পরবর্তীকালে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন, তার কৃতকর্মের জন্য, 'সাইরাস এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, শত বছর আগেও ইরান পারস্যের অন্তর্গত ছিল, এটা তুরস্কের অংশ নয়, পারস্যবাসী পুনরায় এ দেশ শাসন করবে।' তুরস্কের বিরুদ্ধে ইরানের জনগণের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সাইরাস বললেন, রেজা শাহ পাহলেভির প্রতি পারস্যবাসী ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে, জনতা দিনের পর দিন উত্তেজিত হতে থাকে। চারদিকে বিদ্রোহ আর বিক্ষোভের পরও রেজা শাহ পাহলেভি ধীরস্থিরভাবে নিজের পরিকল্পনামতো এগিয়ে যেতে থাকেন। 'আমাদের বিভিন্ন প্রদেশে মহামারি এবং দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে এবং সরকারের পুলিশ বাহিনী জনগণকে নির্বিচারে অত্যাচার করছে, হত্যা করছে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে রেজা শাহ পাহলেভি শত শত কোটি দিরহাম খরচ করছেন–তাহলে তুমি কি তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে ভাববে, মনে করবে?'

সর্বত্র বিতর্ক শুরু হয়। সাধারণ মানুষ বলতে শুরু করে, কেন রেজা শাহ পাহলেভি আর্য মেহের উপাধি গ্রহণ করলেন? বহু রাষ্ট্রনায়ক বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করলেন–'আর্যদের আলোবর্তিকা', এর বেশি কিছু বলতে চাইলেন না তারা। 'কিন্তু মেহের,' শব্দটি যারা ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, 'এটি একটি বিশেষ শব্দ। বর্তমান সময়ে ইরানের দৃষ্টিতে এই শব্দের অর্থ

আলোকবর্তিকা অথবা ভালোবাসা অথবা বন্ধুত্ব, কিন্তু এটা শুধু একটি অর্থেই ব্যবহার হয় এবং তা এসেছে মিথরা, ঈশ্বরের সাহায্যকারী এই দৃষ্টিকোণ থেকে।'

এই মিত্র হচ্ছে ঈশ্বরের সাহায্যকারী। বাস্তবিক অর্থে এগুলো সবই কল্পনাপ্রসূত চিন্তা-ভাবনা। ঈশ্বরের কোনো সাহায্যকারী নেই। সাধারণ মানুষের মাঝে এসব ছড়িয়ে দিয়ে শাহেনশাহ কি ইরান থেকে ইসলাম ধ্বংস করতে চান? মার্কসীয় দর্শন এবং চিন্তাবিদগণ শাহেনশাহের এ উপাধি মেনে নিতে পারেনি। মার্কসবাদীরা পার্সীয়াতে প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু এটা একধরনের স্বপ্ন। কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লব ঘটানো ইরানে কখনোই সম্ভব ছিল না।

সারা পৃথিবীর ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়, রাজাদের আইন-কানুন চ্যালেঞ্জ করেছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। ধার্মিক মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল একটাই–রাজশাসনের অন্যায় আইনের বিরোধিতা করা। বিশেষ করে ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল সবাই। প্রত্যেকেই বুঝতে পারল, তারা কতটা ভুলের শিকার। এর পেছনে মূলত ভূমিকা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তারা ইরানের ধর্মীয় নেতাদের ব্যবহার করেছে। ধর্ম হয়েছে ক্ষমতার উৎস। ইরানের সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছে সর্বহারার একনায়কত্ব নয় বরং ইসলামি আদর্শ সেরা।

দশ বছর পর। একদিন রাতে হঠাৎ ফোন পেলাম। আমার মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী বন্ধুর ফোন। ফোনটা পেয়ে খুব অবাক হলাম। তাকে বাসায় আসতে বললাম। নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে বলল, 'আমার দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আমি বিপ্লবে অংশ নিতে যাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া করো।' মার্কসীয় চিন্তা বাদ দিয়ে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনির আদর্শে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

রেজা শাহ পাহলেভির ভুল ছিল–ইরানে ইসলামি জাগরণ ঘটেছিল তা বুঝতে না পারা। উপরন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান জোট কোনো কাজেই আসেনি শাহ পাহলেভির জন্য। প্রকৃত অর্থে পতন শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। জরাথ্রুস্টবাদী শাহর সৈন্য ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা জরাথ্রুস্টের শিক্ষা সঠিকভাবে অর্থে গ্রহণ করেনি। জরাথ্রুস্টের শিক্ষা ছিল পৃথিবী একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

ভালো এবং মন্দের লড়াই চলছে সর্বত্র। এটা প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা। জরাথুস্ট্রের এ আদর্শই পরবর্তীকালে মোহাম্মাদ (সা.) তার নতুন ধর্ম ইসলামে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। ইরানের বিভিন্ন প্রদেশের নাগরিকরা ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা যেন কোনোভাবেই ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে না পারে সে জন্য তাদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করা হলো। এতেও কোনো ফল হয়নি। নতুন ধর্মে দিক্ষা নিয়েও ইরানিরা যে প্রাচীন সব কিছু বাদ দিয়েছে, তা নয়। বরং পুরনো ধর্মের নৈতিক আদর্শ এবং শিক্ষা ঠিকই ধরে রেখেছিল। এ যেন নতুন বোতলে পুরনো মদ। শুধু কিছু মানুষের পরিবর্তন হয়েছে। নিয়ম-নীতি আগের মতোই চলতে থাকে।

সাহিত্যিক এবং দার্শনিক ভলতেয়ারের মতে, ইউরোপীয় রোমান সম্রাটের মতো না তিনি পবিত্র, না তিনি রোমান। জার্মানির ধর্ম পুরোহিতরা তাদের ইচ্ছামতো যেমন খ্রিষ্টধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, ইরানের শিয়া সম্প্রদায় অনেকটা সে রকমভাবে ধর্মের পরিবর্তন এনেছে। নিজেদের মতো করে সাজিয়েছে। সব কিছুর মধ্যে ইরানের জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় গর্ব এবং অহংকার এবং জরাথুস্ট মতবাদে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিল। এতেই বিপদ দেখা দিয়েছিল। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলো। কিন্তু আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি এ সংঘর্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন।

তবে আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সংঘাত হয়নি। ইরানের শাহ পাহলেভি সম্প্রদায় যা করেছিল তা হচ্ছে নিজের মতো করে জনগণকে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দেয়া। তারা নিজেদের মতো করে ধর্ম প্রচার করত। মানুষ বিশ্বাস করত, শাহ পাহলেভি যা করছে তা শুধু অন্যায়ই নয়, অমানবিক। শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা চলে। তাদের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। হয় ইসলামের পথে এসো, নয়তো শয়তানের পক্ষে যাও। এ ধারণার পরিবর্তন দেখা দেয় মধ্য এশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে। সমগ্র এশিয়ায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। ইরানের ইসলামি চিন্তাবিদ এবং গোঁড়া মৌলবাদীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হলো। এই দ্বন্দ্ব বহু প্রাচীনকালের। বহুবিভক্ত জাতি-গোষ্ঠী, যাদের বিশ্বাস ছিল বহু দেব-দেবীতে। মধ্য এশিয়ায় বহু দেশেই ধর্মের সংঘাত হয়েছে। আফগানিস্তানে বহু

ধর্মের বিশ্বাস দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে ইসলামি জাগরণ। কাবুলে বিদ্রোহ হয়েছে। সেখানে সমস্ত দেব-দেবীর বিশ্বাস ভেঙে নতুন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

মোল্লাদের নিষেধাজ্ঞা

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকের কথা। তুরস্ক থেকে ইরান হয়ে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত মহাসড়ক ছিল। বহু পর্যটক এ পথ দিয়ে নিয়মিত যাওয়া-আসা করত। বিশেষ করে তরুণ ভ্রমণকারীরা লিমোজিন গাড়ি চালিয়ে চলে আসত আফগানিস্তানে। বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার অস্ট্রিয়ান নাগরিকরা জার্মানি থেকে মার্সিডিজ লিমোজিন গাড়ি কিনে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করত। দেশে ফেরার সময় গাড়ি বিক্রি করে দিত। অর্জন করত প্রচুর মুনাফা। ভিয়েনা থেকে দিল্লি সড়কপথে গাড়িতে করে পাড়ি দিতে ১৪ দিন সময় লাগে। আমরাও ঠিক এ পথেই ভ্রমণে বের হলাম। অবশ্য আমাদের একটু বেশি সময় লেগেছে। কারণে-অকারণে অনেক স্থানে থামতে হয়েছে। তা করতে হয়েছে আমাদের স্বার্থেই। দর্শনীয় স্থান এবং ঐতিহাসিক পটভূমিগুলোতে পদধূলি দিয়েছি। ইতিহাস জানার জন্যই এ কাজ করতে হয়েছে। এশিয়া সফরে সেটাই ছিল আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমরা জানতাম না সামনে কী ঘটনা ঘটতে পারে। চলার পথে বহু দেশের মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে। বহু ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি। একটা বিষয়ে অবাক হয়েছি যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে ইরানের জনগণের মিল খুবই কম। জর্ডান, সিরিয়া, আরব এবং মুসলিম অধ্যুষিত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্কৃতি এবং ধর্মগত কারণে ইরানের পার্থক্য। ইরানের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। সেইসঙ্গে এ দেশের মানুষ খুবই সংস্কৃতিবান, আচরণে বেশ ভদ্র। জ্ঞানের মর্যাদা দিতে জানে। একই সঙ্গে বেশ উগ্র।

১৯৬০ সালের এক সন্ধ্যা। আমরা তেহরান শহর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। সেদিন ছিল ১০ মহররম। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় নাতি হুসেনের মৃত্যুবার্ষিকী। করুণ মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটি করুণ দিবস হলেও শিয়ারা পালন করে খুব ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে। তারা তাজিয়া নির্মাণ করে। শিয়ারা হায় হুসেন, হায় হুসেন বলে কাঁদতে থাকে। চেইন দিয়ে নিজেকে প্রহার করতে থাকে।

নিজেকে রক্তাক্ত করে। সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় তাজিয়া বানিয়ে চলে মিছিল। মানুষ তাজিয়া বহন করে আর কালো কাপড় পরিধান করে। অনেকটা খ্রিষ্টধর্মের পুরোহিত যেমন ক্রুশচিহ্ন বহন করে আর কাঁদতে থাকে তেমনি শিয়ারা হুসেনের তাজিয়া বানিয়ে বহন করে আর কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলে। এটাকে কি খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে মেলানো যায়? আর্য সম্প্রদায় থেকে অনেক কিছুরই প্রসার ঘটেছে। ইরানের ইসলাম কি সেই আর্যগোষ্ঠী থেকেই এসেছে! এমন ধারণা পোষণ করতেন আয়াতুল্লাহ খোমেনি। ইরানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়েই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলে। সংস্কৃতির মধ্যে এ একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইরানের ইসলামপন্থি, ইহুদি এবং ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিধি-নিষেধ বুঝতে দেরি হলো না। কয়েক সপ্তাহ পরে ইরানের পূর্ব সীমান্তে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এই অঞ্চল আফগানিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত। বিশাল মরু এলাকা। প্রচণ্ড ধূলি ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পথ হারিয়ে ফেললাম আমরা। বহু অনুসন্ধানের পর পথের খোঁজ পেলাম।

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো সাংস্কৃতিক দিক থেকে আফগানিস্তান পার্সীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ইরানে শিয়ারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর এবং শক্তিশালী। ঐতিহাসিকভাবে মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ইরানের মূল ভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণা একে অপরের সঙ্গে অভূতপূর্ব মিল ছিল। শত সমস্যা এবং ভয়ংকর রাস্তাঘাট সত্ত্বেও ইরানের শিক্ষা এবং আধুনিকতার চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। এর বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে আফগানিস্তানে। সর্বত্র ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতা। সর্বত্র পশ্চাৎপদ চিন্তা-ভাবনা এ দেশটির রাষ্ট্রনায়কদের। কাবুলের সামাজিক অবস্থা কখনো সুষ্ঠু পথে ধাবিত হয়নি। দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত ছিল সর্বত্র।

ইতিহাসের ঘটনা পুনরায় কখনো ফিরে আসে না; সেটা যত দুঃখজনক অথবা উপহাসজনক ঘটনাই হোক না কেন। সাদৃশ্যগত কিছু মিল হয়তো পাওয়া যায়। আধুনিক আফগানিস্তানের সঙ্গে পুরনো কোনো পবিত্র নগরীর তুলনা চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রে কিছু ব্যাপক ক্ষমতাধর ব্যক্তির মিলন। এর সঙ্গে অনেকটা প্রাচীন ইসরায়েল, মিসর, আসিরিয়া এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, বহু পরে মেসিডোনিয়া, পার্সিয়া এবং রোমে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

আফগানিস্তানে দুর্বিষহ জীবন নেমে আসে উনিশ শতকে। এই শতকে রুশ সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ রাজাদের দখলদারিত্ব নীতি আফগানিস্তানকে পর্যুদস্ত করে তোলে। আর বিশ শতকের শেষের দিকে রুশ সাম্রাজ্য এবং আমেরিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এটা পাকিস্তানের প্রভাব পুরো দেশকে ধ্বংস করে দেয়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ইসলামপন্থি মৌলবাদীরা লড়াই করে। এর মধ্যে উত্থান ঘটে মৌলবাদীদের। এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শেষ হতে না হতেই বিশ্বে পরাক্রমশালী যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। বাইবেলে বলা হয়, জীবন দুটো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতিবাহিত হয়। একটি হচ্ছে বিশ্বাস, আরেকটি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে রাজনৈতিক ইচ্ছা। ক্ষমতার লোভ মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। আর ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের মনোবল দৃঢ় করে। আফগানিস্তানের নাগরিকরা যে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে তার প্রতি আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্র। মরুভূমির এ অঞ্চলের মানুষ লড়াই করে বেঁচে থাকে। তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। নিজ মাতৃভূমির নদ, উপত্যকা, গাছপালা, বনজঙ্গল দেখেই সে বড় হয়েছে। এই সুন্দর মাতৃভূমি পরিচালিত হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশে–এটাই তালেবানদের বিশ্বাস।

ত্রিধারায় আফগানিস্তান সব সময় সমস্যায় পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনটি কারণে যুদ্ধ হয়েছে এই দেশটিতে। এই তিন দর্শন হচ্ছে প্রাচীন সনাতনীপন্থি। ধর্মীয় মৌলবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতাবাদী। আর ক্ষমতা একেক সময় একেক দলের হাতে পড়েছে। এই পবিত্র ভূমিতে শাসকের পর শাসক পরিবর্তন হয়েছে। একদল আরেক দলের নেতাকে হত্যা করেছে নিষ্ঠুরভাবে। একটা বিষয় পরিষ্কার, কেউই দেশটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেনি।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে রাজধানী কাবুল পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং রাজনীতিবিদদের থেকে ভিন্ন ধ্যান-ধারণা প্রচলন করে। এ সময় নগর সংস্কৃতির ছোঁয়া মেলে। দেশ পরিচালনায় রাজা এবং তার পরিবারবর্গ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করত। রাষ্ট্রের পুঁজিবাদীরা সব সম্পত্তির মালিক ছিল। রাষ্ট্রের সর্বত্র পার্সি এবং ফরাসি ভাষা চালু ছিল। পার্সি এবং ফরাসিদের অহরহ দেখা যেত। তাদের চলন-বলনে ভদ্রতা ছিল এবং মার্জিত পোশাক পরিধান করত। তারা কখনোই মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ইরানের ধ্যান-ধারণা পোষণ করত না। এমনকি বাজার এবং মসজিদে নিজস্ব ঢঙে চলত আফগানরা।

আফগানিস্তানের এক প্রান্তে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও বেশির ভাগ এলাকা ছিল হতদরিদ্র। অধিকাংশই মাদ্রাসায় পড়ালেখা করত। প্রত্যেকের দাড়ি রাখা ফরজ ছিল। এরা ছিল পাঠান উপজাতি। পশতু ভাষায় তারা কথা বলত। মূলত তাদের আগমন ঘটেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে। এরা যেন রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। হাতে থাকত রাইফেল, শটগান এবং ভারী অস্ত্র। অনেক সময় গ্রেনেড বহন করত। অনেক সময় দেখেছি হাসপাতালে বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে এসেছে, যাদের অনেকেই নিজেকে যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। হিংস্র এসব মানুষ তাদের অতীত ইতিহাস বলত, যাতে প্রকাশ পেত নির্যাতন এবং নিষ্ঠুরতার কথা। এদের বেশির ভাগই পাকিস্তানের উপজাতি-গোষ্ঠী। ইরানের সভ্যতা থেকে বিন্দুমাত্র শিক্ষা নেয়নি তারা। আফগানরা রাইফেল, শটগান এবং পিস্তল কিনে সীমান্তবর্তী গ্রামের ভেতরে অথবা গহিন বনে বাস করত। তারা সব সময় পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী খাইবার-পাস এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। এ অঞ্চলে তাদের প্রতিপক্ষের শক্ত ঘাঁটি। বাস্তবিক অর্থে কাবুল সরকার পাঠানদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বড় ধরনের পরিকল্পনা করে। রাজা এবং তার প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের উপজাতিদের পূর্ণ সমর্থন করত। এ অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানের রাজার প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। তিনি এ অঞ্চলকে পাকতানিস্তান বলতেন। এক পর্যায়ে এই অঞ্চল আফগানিস্তান থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দখল নেয় ব্রিটিশ সেনারা। এর অংশবিশেষ মিশিয়ে দেয়া হয় দক্ষিণের সঙ্গে। পাকতানিস্তান না মিশতে পেরেছে পাকিস্তানের সঙ্গে, না পেরেছে আফগানিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে। এখান থেকেই তালেবানদের যাত্রা শুরু। ১৯৯৬ সালে তালেবানরা কাবুল নগরী দখল করে। শুধু তা-ই নয়, পুরো দেশ নিজেদের আয়ত্তে নিতে বেশি সময় লাগেনি। ক্ষমতায় বসেই ইসলামিক শাসন কায়েম করে তালেবানরা। বিশ্ব থেকে দেশটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তাদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা। রাষ্ট্রের সর্বস্তর সামরিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়ভাবে পুশতুনওয়ালিদের দখলে চলে যায়। ত্রিধারা সৃষ্টি হয় রাজনীতিতে। এর মাঝেও কাবুল ও পুরাতন নগরীতে যারা ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ছিল তারা নির্যাতিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ এক অন্ধকারে ধাবিত হয়। সামনে কোনো আশার আলো নেই। তালেবানরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ করে দেয়। নারীদের চলাফেরায় প্রবল নিষেধাজ্ঞা চালু হয়।

১৯৮০ সালে যা শুরু হয়েছিল সেটাই ছিল আফগানিস্তানে অন্ধকারে ধাবিত হওয়ার প্রথম পথ। মধ্যযুগে বিদেশিরা এ দেশটিতে বিদ্রোহ করেছিল; কিন্তু তখনো কাবুলের রাস্তায় আতিথিয়েতার পরিবেশ বজায় ছিল। সে সময় জালালাবাদে যাওয়ার সময় ঘোড়ার গাড়িতে করে যেতাম। আমাদের ঘোড়ার নাম ছিল খিজির। এ ছাড়া আমার বাসায় কাজ করত আফগানিস্তানের হাজরানি। তারা রান্নার কাজ করত। তারা নিজের দেশের কথা বলত। চোখের পানি ফেলত। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কাবুল নগরী ঘুরে বেড়াতাম। নগরীতে আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন ছিল, তেমনি ভেড়ার পাল, উট ও গাধা চলাফেরা করত। অভূতপূর্ব মিশ্রণ ছিল। সবচেয়ে ভালো লাগত বহু রঙের মসজিদ, কয়েদখানা, রাজপ্রাসাদ, অতীত যুগের আধুনিক হোটেল, এডওয়ার্ডিন যুগের সরকারি প্রাসাদ, প্রাচীন যুগের বিধ্বস্ত কোনো রাজপ্রাসাদ দেখতে। অবাক হতে হয় কাবুলের নদীর ওপর সেতু দেখে। শীতকালে নদীর গভীরতা কিছুটা হ্রাস পায়। পানি শুকিয়ে যায়। হালকা বরফ দেখা যায়। চৈত্র-বৈশাখে মাসে নদী খুবই খরস্রোতা হয়ে ওঠে। ছেলেরা নদীর পানিতে সাঁতার কাটে। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নদীর কূলে ফলের দোকান, শাকসবজি বিক্রেতা দেখতে পেলাম। এখান থেকে ক্রেতারা সওদা কিনে লঞ্চে করে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যায়।

এভাবে পথ চলতে চলতে আমরা জনমানবশূন্য এক স্থানে এসে পড়লাম। তারপর আবার শহরের দিকে ফিরে এলাম। প্রাচীন এই নগরীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় যা দেখলাম তাতে একটা কথাই মনে হলো, কোনো প্রাণ নেই। রাজধানী কাবুল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক দালানকোঠা, বিমানবন্দর, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। রাজধানীর সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের মিল নেই বললেই চলে। বিদেশি পর্যটকরা রাজধানী কাবুলেই ভ্রমণ করতে ভালোবাসে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুন্দর যোগাযোগ রয়েছে। এই বিশাল নগরীতে প্রাচীন ইসলামপন্থিদের নিয়ম-কানুন প্রচলিত ছিল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

কাবুল জাদুঘরের পরিচালক এই নগরীর অতীত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এই জাদুঘর তালেবানরা একেবারে ধ্বংস করে ছেড়েছে। এ এক মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদদের জন্য এটা হতাশার দিক। জাদুঘরের পরিচালক আমার সঙ্গে একমত হলেও তিনি নতুন তথ্য দিলেন। প্রাক ইসলামিক যুগে ইরানের মতো আফগানিস্তানের কেউই কখনোই জরাথ্রুস্টবাদে

বিশ্বাসী ছিল না। এমনকি তারা কোনো সময়ই পূজা পালন করে না। আফগানিস্তানে কখনোই বাইরের জগতের ধর্মীয় বিশ্বাস স্থায়ী হয়নি। ইসলাম ধর্মের প্রতি ছিল তাদের অগাধ আস্থা। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ঘোরাফেরা করলে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

আফগানিস্তানের প্রবেশের পথ প্রধানত তিনটি–উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্যভাগ দিয়ে এ দেশটিতে প্রবেশ করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৌশলীরা তাদের কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৌশলীরা পশ্চিম সিমান্ত দিয়ে সড়ক উন্নয়নের কাজ করতেন। রাশিয়ানরা করতেন পূর্ব দিকের। আফগানিস্তানিরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে কারা প্রথমে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে। রাজপ্রাসাদের কর্মচারীরা শ্রমিকদের শক্তি জোগাত। তাদের উৎসাহ দিত নেচে-গেয়ে। ফলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করত। প্রকৃত অর্থে সড়ক উন্নয়ন আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের কোনো কাজেই আসেনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুকূপ তৈরি করেছে। আফগানিস্তানের প্রশাসকরা ১৯ শতাব্দীর ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল। ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার সাম্রাজ্য কীভাবে দেশটিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের ওপর নির্বিচারে নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা ভুলে গিয়েছিল। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া সহজ হলো ঠিকই, সেইসঙ্গে হিংস্রতাও বৃদ্ধি পেল।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা ঘেঁষে সালাংপাম উপত্যকার পাশ দিয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে গেলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। বসন্তকালে সড়কপথে চলাচল করা কষ্টসাধ্য নয়; কিন্তু শীতকালেই বিপদ বেশি। সালাং গুহার ভেতর দিয়ে শত মাইল পেরিয়ে অবশেষে পুল-ই-খুমরি নগরীতে পৌঁছালাম। এখানেই দ্বিতীয় শতাব্দীর তৈরি জরাথুস্টের মন্দির রয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। মন্দিরের পাশেই সড়ক, সে স্থানে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। সূর্য ডুবুডুবু অবস্থায়। মন্দিরের কাছে গেলাম আমরা। এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাদের আপ্যায়ন করলেন। হালকা নাশতা দিলেন। তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম এই নগরীর অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে। জানতে চাইলাম প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস। আমাদের পাশে বসলেন তিনি। হাতে চুরুট ছিল, তা ধরালেন। গভীর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। কী যেন ভাবছিলেন। এরপর শুরু করলেন কল্পকাহিনী। মনে হচ্ছিল সব অবিশ্বাস্য।

আফগানিস্তানের বীর যোদ্ধা থেকে শুরু করে রাজা-বাদশাহ কার কী ভূমিকা বিরামহীনভাবে বলে চলেছেন। ইতিহাসের কোনো অংশই যেন তিনি বাদ দিলেন না। মহাবীর আলেক্সান্ডার। ইসলাম ধর্মের পুরোধা হজরত মুহাম্মদ (সা.), তার জামাতা আলী এবং মোগল সাম্রাজ্যের মহানায়ক কুবলাই খানের কথাও চলে এলো তার আলোচনায়। বৃদ্ধ লোকটি সবশেষে যা জানালেন তা রীতিমতো চমক সৃষ্টি করল। এখানে প্রতি শুক্রবার রাজা মসজিদে এসে প্রার্থনা করতেন। রাজা প্রকৃত অর্থে ছিলেন জাদুকর। সাধারণ মানুষ কোনো দিন তা বুঝতে পারেনি। তিনি কখনোই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং সৃষ্টিকর্তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। মসজিদের ভেতরে অগ্নিকুণ্ড ছিল। সাধারণ মানুষকে সেই আগুনের ওপর পা ছোঁয়াতে হতো। আগুনের তাপে পা পবিত্র হতো, এটা ছিল তাদের বিশ্বাস। এর সব কিছুই শয়তান দেখত। সে জানত রাজার মধ্যে কোনো বিশ্বাস নেই। রাজাকে হত্যার জন্য ইস্কান্দারকে পাঠানো হলো। মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাজাকে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে মহানবী (সা.) তার জামাতা আলীকে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধের জন্য। তার সঙ্গে ছিল চার শতাধিক বীর যোদ্ধা। ইস্কান্দার তার সন্তানকে পাঠিয়েছিলেন তুরস্কের খান রাজাকে মোকাবিলা করতে। যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল। রাজা এক অধ্যাদেশ জারি করেন, যেসব যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য এখানে এসেছে তাদের পরবর্তী তিন দিন বিশ্রাম নিতে হবে। এরপর যুদ্ধ শুরু হবে। যোদ্ধারা গাছের নিচে শিবির গাড়ল। তিন দিন পর শুরু হলো যুদ্ধ। ভয়াবহ যুদ্ধ হলো। সব যোদ্ধা নিহত হয়। রাজা ভারতে পালান। আর মসজিদ আগুনে পুড়ে ছাই হয়। মিশে যায় মাটির সঙ্গে। এই হলো কাহিনী। বিধ্বস্তের যে নিদর্শন দেখা যায় প্রাচীন সময়কাল থেকেই তা ছিল। হজরত আলীর অভিশাপ পড়েছে তাদের ওপর। ওই সময়ের পর থেকে বিধ্বস্ত মসজিদের সামনে কেউই আসে না। কিন্তু সারা দেশের মানুষ এখানে এসে বাতি জ্বালায়। বিশেষ করে নতুন দম্পতি এসে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন হিসেবে এ কাজ করে তারা। যদিও মৌলবাদী তালেবানরা এ প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। তারা এটা বন্ধ করে দিয়েছে।

চায়ের দোকানের বৃদ্ধ মালিক তার কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। এ সময় মুয়াজ্জিনের ডাক শুনতে পেলেন তিনি। বললেন, প্রার্থনার সময় হয়েছে। মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেলাম।

আফগানিস্তানের অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংসের পথে। বহু বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে দেশটি। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ইংল্যান্ডে এবং রোমান নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যখন অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ক্ষমতায় আরোহণ করে। আফগানিস্তানেও এর ব্যতিক্রম হলো না। মৌলবাদী এবং তালেবানরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, টাওয়ার, মিনারাত, বৌদ্ধ মন্দির এবং গৌতম বুদ্ধের শিলাকৃতির বহিমান মূর্তি ভেঙে ফেলে। এমনকি জরথ্রুস্টের প্রাসাদ এবং অগ্নিমন্দির ধ্বংস করে দেয়।

কিন্তু এসব অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য যতই ধ্বংস করা হোক না কেন, এগুলো ঐতিহাসিক স্থান হয়ে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে থাকে। সাধারণ মানুষ কখনো ভুলে যায় না। এসবের মধ্যে আফগানিস্তানের ঐতিহ্যবাহী নগরী বাল্ক। এই নগরী দেশের উত্তর প্রান্তে পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এই নগরী। নগরীর সাধারণ মানুষ গর্বের সঙ্গে বলে, নগরীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাম্র যুগে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের এক হাজার বছর পূর্বে তাম্র যুগের সূচনা হয়। বাল্ক নগরী এতটা প্রাচীন। এই নগরীকে বলা হয় ইরানের সভ্যতার পাদপীঠ। ইতিহাসবিদরা বাল্ককে যেকোনো নগরীর শ্রেষ্ঠ নগরী বলে অভিহিত করেছেন। জাদুঘরের পরিচালকের মাধ্যমে জানতে পারলাম, এই বাল্ক নগরীতে জরথ্রুস্ট তার প্রথম সমাবেশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই জাদুঘরে রক্ষিত আছে মহান সেনাপতি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিয়ের দলিল। তিনি বিয়ে করেছিলেন রাজকুমারী রোকসানাকে। এ ছাড়া আব্বাসীয় বিপ্লবের মহান নেতা আবু মুসলিমের প্রতিকৃত, উমাইয়া বংশের ঐতিহ্য, ইসলামি সাম্রাজ্য, মুসলিম মহিলা কবি রাবেয়ার কবিতা, বার্মার ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং 'দ্য থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান' মহাকাব্যের অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ১৩ শতাব্দীতে মঙ্গলরা এই নগরী ধ্বংস করে দেয়। তারা তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বাল্ক নগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তৈমুর লংয়ের দলের দ্বারা। এটা ছিল ১৫ শতাব্দীর ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীকালে উজবেকিস্তান এবং তুরস্কের ভয়াবহ আক্রমণে ফের বাল্ক নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন নগরী বাল্ক এখন বিধ্বস্ত অবস্থায়। যত দূর দৃষ্টি যায়, নগরীর প্রাচীন সৌন্দর্য এখনো অনেকের দৃষ্টি কাড়ে। বাল্কে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। আফগানিস্তানের অধিকাংশ নির্মাণশিল্পে দেয়ালগুলো তৈরি হয় লাল মাটির ইট দিয়ে। প্রখর সূর্যের তাপে এই মাটি শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এটা অনুধাবন করা

খুব কঠিন হয়ে পড়ে যে, দেয়ালগুলো কোথায় শেষ হয়েছে এবং কোথায় কুপ্যুঠের সূচনা হয়েছে; কোথা থেকে প্রকৃতির শুরু এবং কোথায় মানুষের নির্মাণকাজ শেষ। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বিকালের দিকে ভ্রমণে বের হলে দেখা যায় ইট-পাথরের নির্মাণশ্রমিকরা কাজ করছে দেয়াল নির্মাণে। অবাক বিষয় এই যে, দেয়াল দেখাই যায় না স্পষ্টভাবে। নির্মাণশ্রমিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। তারা যেখান থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করে। এটা সেই মতাদর্শের মতো, জরাথ্রুস্ট যেখান থেকে তার ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন সেখানেই শেষ করলেন। তিনি আফগানবাসীর কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্রষ্টা একজন। তার কোনো অংশীদার নেই। বাল্খ নগরীর জাদুময়ী বিকালে সেই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস হয়েছিল জরাথ্রুস্ট ইরানের উত্তর-পূর্বাংশের দিক থেকেই তার ধর্মীয় প্রচার শুরু করছিলেন। সেই দেয়ালটাকে যেন স্বর্গীয় উপাদান মনে হলো। জরাথ্রুস্টের আদর্শে বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সংখ্যায় কম হলেও তারাই ছিল সবার কেন্দ্রবিন্দুতে। বাল্খ নগরীর এই দেয়ালটি পৃথিবীতে পুনঃ স্থাপিত হয়েছে জরাথ্রুস্টের আদর্শে বিশ্বাসীদের দ্বারা–ইরানিরা এ ধারণা বিশ্বাস করত। অগ্নি উপাসনালয় মন্দিরটি জিন এবং অপশক্তি ধ্বংস করে ফেলে। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ কখনো বলতেই পারেনি জরাথ্রুস্ট কী লক্ষ্য এবং আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

রুবাইয়াতে ওমর খৈয়ামে লেখা হয়, 'হায়, তুমি এলে মানুষ তোমারে চিনতে ভুল করল।' একাদশ শতাব্দীতে শেলির অজিমিন্ডা কবিতায় বানও অনুরূপ। ওমর খৈয়াম তার মহাকাব্যে ইরান এবং আফগানিস্তানের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসের কাহিনী লিখেছেন। খৈয়াম জানতে চেয়েছিলেন কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ। অনন্তকাল ধরে তিনি এ প্রশ্ন করেছেন।

যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন, নবীরা চিরকাল সম্মানের। তাদের কেউ কখনো ভুলে যাবে না। তারা মহান, তারা শ্রেষ্ঠ। নবীরা তাদের দেশ ছাড়িয়ে আদর্শ দিয়ে বিশ্ব জয় করেন। বহু মানুষ তাদের আদর্শে দিক্ষিত হয়। এমনই নবী জরাথ্রুস্ট। আধুনিক বিশ্বেও মানুষ জরাথ্রুস্টকে ভুলে যেতে পারে না। দার্শনিক, চিন্তাবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জরাথ্রুস্টকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, জার্মানির লেখক নেতসি ফিনি তার বই জরাথ্রুস্টকে উৎসর্গ করেছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে জরাথ্রুস্টকে নতুন করে হাজির করেছেন। জরাথ্রুস্টের আদর্শ যে মুছে যায়নি তা প্রমাণ করে দিতে

চান। মধ্য এশিয়ার এই নবীকে নিয়ে লোকসংগীত রচিত হয়েছে। কবি রিচার্ড স্ট্রস‌ও লিখেছেন জরাথ্রুস্টকে নিয়ে কবিতা। তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ছবি। সেই চলচ্চিত্রে জরাথ্রুস্টকে দেখানো হয়নি। তার বক্তব্য ভেসে এসেছে। তাকে নিয়ে রচিত লোকসংগীত একাদশ শতাব্দীতে লোকমুখে প্রচারিত হতো। কবি নেতসিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাকে নিয়ে যে ছবি তৈরি হয়েছিল এর প্রভাব কেমন ছিল? কবি হিসেবে তিনি শুধু বলেছিলেন, অসাধারণ। আর লোকসংগীতগুলোতে একেবারে শুরুতে মৌলিক কথা বলা হয়েছিল। মানুষের হৃদয় গেঁথে যেত। জরাথ্রুস্টকে নিয়ে রচিত গানের নাম দেয়া হয়েছিল 'স্পার্ক জরাথ্রুস্ট'। জার্মানির দার্শনিকরা চেষ্টা করেছেন জরাথ্রুস্টের মতবাদ এবং আদর্শ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে, যে দর্শন এবং মতবাদ আধুনিক সমাজকে আজও নাড়া দেয়। এটা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না, জার্মানির দার্শনিকরা কেন হঠাৎ করে ইরানের নবীকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। তারা জরাথ্রুস্টের মুখপাত্র হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেন সারা পৃথিবীতে। জার্মান কবি নেতসি প্রাচীন ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর সেখান থেকেই তিনি জরাথ্রুস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন। জরাথ্রুস্টের ধর্ম এবং আদর্শ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। অন্য ধর্ম এবং মতবাদের সঙ্গে জরাথ্রুস্টের পার্থক্য অনুধাবন করতেন তিনি। প্লেটো, সক্রেটিস এসব মহামান্য দার্শনিক তাদের নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন। জরাথ্রুস্টের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তার বক্তব্য প্রচার করেছে তার আদর্শে বিশ্বাসীরা। তার কথা গির্জার পাদরিরা পন্থ জেরস, পন্থ অগাস্টিন এবং পন্থ মেথডিমে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এর মধ্যে শুধু পন্থ মেথডিমে প্রকৃতভাবে জরাথ্রুস্টের চিন্তা, চেতনা, দর্শন ঠিকমতো লেখা ছিল। নেতসি সেই পুস্তক পাঠ করেই জরাথ্রুস্টকে নিয়ে বই লেখেন। ইউরোপীয় দর্শনে নতুন মাত্রা এনে দেয় নেতসির এই পুস্তক।

তিন হাজার বছর আগে জরাথ্রুস্টের যে আদর্শ, তা আজও মানুষের হৃদয়ে ঝড় তোলে। প্রাক ইসলামিক যুগের প্রথম সংকলন থেকে শুরু করে আজকের ইরান সর্বত্র জরাথ্রুস্টের আদর্শে বিশ্বাসীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অনেকের বিশ্বাস, জরাথ্রুস্টের অগ্নিমন্দির ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই তার প্রতি-আকর্ষণ কমে গেছে। তবে এ কথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয় যে, নেতসি এবং রিচার্ড স্ট্রস ইউরোপের মানুষ হয়েও জরাথ্রুস্টকে নিয়ে এত নিখুঁত গবেষণা কীভাবে করলেন। তাকে নতুন করে বিশ্বের মানুষের কাছে আবারও তুলে

বলেন। জরাথ্রুস্টের ধর্ম প্রচার, আদর্শ এবং শিক্ষার কথা দীর্ঘদিন মানুষ ভুলে দিয়েছিল, সেটাই আবার জানতে পারল। জরাথ্রুস্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? তা কি লেকলি এবং রিচার্ড স্ট্রস জানতে পেরেছেন কখনো? জরাথ্রুস্টকে আজও স্মরণ করা হয়। মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান করে নিয়েছেন। তিন হাজার বছর ধরে সমানভাবে আদৃত। অবাক হতে হয়, বয়স্করা জরাথ্রুস্ট যে পথে চলতেন সেই পথ দিয়েই হাঁটাহাঁটি করত। রোমান, গ্রিক এবং মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসীরা চলত জরাথ্রুস্টের আদর্শে। পার্সীয়ারা কি এর থেকে দূরে থাকতে পারে? প্রশ্ন জেগে ওঠে, জরাথ্রুস্টের নাম এবং খ্যাতি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের হৃদয়ে তিন হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস নতুন করে গেঁথে গেল। তার শিক্ষা এবং আদর্শ এবং ধর্ম প্রচার হতে লাগল।

২.
প্রকৃত দার্শনিক

ভাববাদী টলস্টয়

বিশ্বযুদ্ধের এক বছর পর অস্ট্রিয়ার ছোট্ট রেলস্টেশনে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। বহু বিদেশি পর্যটক রেলস্টেশনে বিচ্ছিন্নভাবে বসে ছিল। অনেকেই তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোথায় যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এক ডাচ তরুণ রেলস্টেশনের ক্যান্টিনে বসে ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করছিল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করছে। তার পাশেই বসে ছিল এক দম্পতি। সংবাদপত্র পড়ছিল তারা। তরুণের বাম পাশের একটি চেয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের এক পর্যটক বসে ছিল। ডাচ তরুণের কথাবার্তায় সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সব কিছুতেই তার মধ্যে অধৈর্য ভাব। সে তার গ্লাস এবং ক্যামেরা নিচে রেখে দিল। ধূসর রঙের চুল পরিবেশিত জার্মানির নাগরিকও রয়েছে। তার মধ্যে রুক্ষতা স্পষ্ট বিদ্যমান। তার দেশ যুদ্ধে হেরেছে। এতেই সে ব্যথিত। পরে জানা গেল, সে একজন কর্নেল। রেলস্টেশনের ক্যান্টিনে এক কৃষাণীর দেখা পাওয়া গেল। তার কোলে ছোট্ট একটি শিশু। একজন সেবিকাও রয়েছে।

ক্যান্টিনে সবাই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় তরুণ হোটেলের বেয়ারাকে এক বোতল মদ আনতে নির্দেশ দিল। বেয়ারা মদ নিয়ে এলো। আমেরিকান পর্যটক এবং জার্মান সাবেক কর্নেল আলোচনা করছিলেন। দুই দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা চলছিল। যুক্তরাষ্ট্র টলস্টয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। বৃদ্ধ লোকটি বলল, লিও টলস্টয়ের ব্যাপারে আমার আগ্রহ বেশি। তার দর্শন পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দিয়েছে। বিরক্ত স্বরে বলল, টলস্টয় ভাববাদী, প্রকৃত দার্শনিক নেতসি। একমাত্র একাই তিনি।

কবি জন গলসওয়ার্দি তার 'দ্য লিটল ম্যান' কবিতায় যুদ্ধের ক্ষতির চিহ্ন তুলে ধরেছেন। সাম্রাজ্যবাদের চেহারাও তুলে ধরেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি

পর্যায়ে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। জার্মানিদের দর্শন একটাই-টলস্টয় ভাববাদী এবং নেতসি প্রকৃত দর্শনবাদী। জার্মানের ছাত্রছাত্রীরা লিও টলস্টয় থেকেও নেতসিকে বেশি ভালোবাসে। কেন টলস্টয়কে ভাববাদী বলা হচ্ছে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না কোনো জার্মানি। কেন নেতসিকে সেরা দার্শনিক বলা হচ্ছে তা জানা যায় তিনি কী লিখেছেন, কী দিয়ে গেছেন পৃথিবীর মানুষকে তা থেকে। তিনি জরাথ্রুস্টের দর্শন তুলে ধরেছেন। জরাথ্রুস্টকে নিয়ে নেতসির দর্শনতত্ত্ব সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তত্ত্ব এবং যুক্তি দিয়ে নেতসি জরাথ্রুস্টের দর্শন সবার সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। জরাথ্রুস্টকে নবী বলা হচ্ছে। তার বক্তব্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মিশে গেছে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, বাবা-মা সবাই জরাথ্রুস্টকে ভালোবাসে। তারা জরাথ্রুস্টের দর্শন মেনে নিয়েছে। রহস্যময় জরাথ্রুস্ট। গ্রিক উপাখ্যানেও তার কাহিনী বর্ণিত আছে। জরাথ্রুস্ট নামের অনেক অর্থ রয়েছে। জরাথ্রুস্ট একটি বিস্মিত নাম। প্রাচীন পার্সীয়াবাসী জরাথ্রুস্টের অর্থ দিয়েছে মরুর উট। পার্সীয়ার এই নবীকে নিয়ে রিচার্ড স্ট্রস ছবি তৈরি করেছেন। ছবির কথা যত সহজে দর্শক বুঝতে পেরেছে, তার দর্শনতত্ত্ব ঠিক ততটাই কঠিন। স্ট্যানলি কুবরিকস তার 'এ স্পেস অব অডেসি'তে দেখিয়েছেন জরাথ্রুস্টের দর্শন বা মতবাদ।

> *তরুণরা তার দর্শন গ্রহণ করেছে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে, সত্যের পথে মানুষকে নিয়ে এসেছে জরাথ্রুস্টের দর্শন। ব্রাজিলীয় গায়ক এমার ডেজো জরাথ্রুস্টের ভাববাদ নিয়ে গান করে ১৯৭৩ সালে গ্রেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।*

Z দিয়ে নেতাশে রহস্যময়ের কথা বলেছেন তার কাছে Z মানেই জরাথ্রুস্ট। Z দিয়ে প্রাথমিকভাবে জ্যাকারি, জেবেডে জেবেদে এবং জেপেনিয়া বোঝান, এগুলো সবাই গ্রিক উপাখ্যান থেকে রচিত হয়েছে। এগুলো সবই জরাস্টার বা জরাথ্রুস্টের কথাই বলা হয়েছে। এটি গ্রিকদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন পারস্য ভাষায় তাকে জরাথ্রুস্ট বলা হয়। জরাথ্রুস্ট অর্থ হলো উটের পিঠে আরোহী বার্তাবাহক।

> *এ স্পেস অব অডেসি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তরুণসমাজের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। একই সঙ্গে জন স্ট্রস তার 'নীল দানিয়ুব' এবং 'দা থার্ডম্যান' ছবিতে জরাথ্রুস্টের আদর্শ এবং মতবাদ তুলে ধরেছেন।*

এ স্পেস অব অডেসিতে মানবতার কথা বলা হয়েছে। মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ সত্যনিষ্ঠা, সততা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই চিরকালের। এই

ছবিতে দেখানো হয়েছে বিশাল একটা দড়ির দুই পাশে মানুষ এবং পশু দাঁড়ানো রয়েছে। পশুর শক্তিকে পরাস্ত করছে মানুষ।

সত্য এবং ন্যায়ের জয় হয়েছে। নেতসির দর্শন মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। আর এ দর্শনের পেছনে অনন্য ভূমিকা পালন করছে জরাথ্রুস্টের আদর্শ। জরাথ্রুস্ট বলতেন, মানবকল্যাণই প্রধান ধর্ম। জার্মানির দার্শনিক পার্সীয়ার নবীর প্রতি এবং তার দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সারা পৃথিবীতে তার মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

জরাথ্রুস্টকে নিয়ে দার্শনিক নেতসি তার মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত দর্শনতত্ত্ব গবেষণা করেছেন। নেতসির দর্শনতত্ত্বে জানা যায়, জরাথ্রুস্ট ভালো এবং মন্দ, সৃষ্টিকর্তা এবং শয়তানের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। ভালো এবং মন্দের মধ্যে যে লড়াই, পরিণামে ভালো জিতবে।

দৌলত খোদনাজারভ মস্কোবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন : পৃথিবী একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সৃষ্টিকর্তা এবং শয়তানের মধ্যে লড়াই হচ্ছে সার্বক্ষণিক। ভালো-মন্দের এ লড়াই চলবে চিরকাল। এ সত্যটাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন দার্শনিক নেতসি। কবে, কীভাবে জরাথ্রুস্টের আদর্শে একাত্ম হয়েছিলেন তার নিজেরও জানা নেই।

নেতসির জীবন আদর্শ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে তিনি কতটা জরাথ্রুস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। নেতসি শিশুকাল থেকেই এমনভাবে কথা বলতেন যে, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে পারত না যে এটা একটা শিশুর কথা।

১৮৪৪ সালের ১৫ অক্টোবর পূর্ব জার্মানির লিপজিগ শহরের উপকণ্ঠে রকেন নগরীতে তিনি দার্শনিক জীবন শুরু করেন। এই শহরটি উত্তেনবার্গ থেকে ৩০ মাইল উত্তরে।

এখানেই মার্টিন লুথার প্রোটেস্ট্যান্টদের সংস্কারের বিপ্লব করেছেন। সাধু সন্ন্যাসী এবং খ্রিষ্টান পাদরিদের ৯৫টি প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পুড়িয়ে দিয়েছেন। ফেলে দিয়েছেন পুরনো সব তত্ত্ব। নেতসি পরিবার খুবই ধার্মিক ছিল।

তার বাবা কার্ল লুজিগ ছিলেন রকেনের ধর্মানুসারী। পার্সীয়ার রাজা ফ্রেডরিখ উইলিয়াম চতুর্থ তার কাছে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেছিলেন।

নিজের জন্মদিনে নিজের নামানুসারে সন্তানের নাম রেখেছিলেন ফ্রেডরিখ উইলিয়াম। বাবা হিসেবে তিনি নিজেও মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে যেতেন শিশু নেতসির ধর্মীয় দর্শনতত্ত্বের কথা শুনে।

তার মনে প্রশ্ন জাগত, এ সন্তানের ভবিষ্যত কী? সে কি সৃষ্টিকর্তার পথে যাবে, নাকি শয়তানের ছায়া পেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে? এখান থেকেই ধর্মীয় দর্শন মতবাদ প্রচার হতে থাকে।

কারাক্রুস্ট এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রচিত হতে থাকে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছিলেন লুথার। খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যে খুব নিরাপদে ছিল, সেটাও বলা যাবে না। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মতবিভেদ সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

চিন্তা-চেতনা, কথাবার্তায়, কোনো কাজে চুক্তির বিরোধিতা, শাসকশ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য–এ সবই শিশু নেতসিকে আলোড়িত করত। এভাবেই বড় হতে থাকে। তার কর্মময় জীবনও ছিল খুবই বিচিত্র।

বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। মতাদর্শীবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। তার ওপর অনেক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়। একে একে সবই উতরে গেছেন। নেতসির সুন্দর জীবন এবং আনন্দময় সময় খুব বেশি দিন কাটেনি। সুখের সাগরে ভাসতে পারেননি। পাঁচ বছর বয়সেই নেতসি বাবাকে হারান। মস্তিষ্কজনিত রোগে তার বাবার মৃত্যু হয়।

তার ছোট ভাই জোসেফ অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। নেতসি একা পড়লেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন সমাজ থেকে। পরিবার থেকেও তিনি আলাদা হয়ে পড়লেন। যেন নির্বাসিত জীবন শুরু হলো।

রোকেন গির্জার সন্নিকটে এক শোনার অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিলেন। এখানে বাবাই সত্য, ন্যায় এবং দর্শনের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতেন। বাবা-মা, ভাইবোনের সঙ্গে তার সুন্দর জীবন শুধু স্মৃতির পটে চলে গেল। ছোট্ট শহরে নুমবার্গের এক কোণে নিজেকে স্থায়ী করে নিলেন।

এই নগরীর পূর্ব দিকে পূর্ব জার্মানি। শিল্প নগরীতে পরিণত হয়েছে নুমবার্গ। নগরীর পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মালি নদী। নেতসির আমলে এটাকে নগর না বলে উপশহর বলাই শ্রেয়। কৃষিপণ্য হাটবাজারে অবাধে বিক্রি হতো।

এ নগরীতেই ছিল রোমের ঐতিহ্যবাহী গির্জা। সাধু পিটার এবং পলের প্রতিকৃতি এখানেই স্থাপিত রয়েছে। ফ্রেডরিখ নেতসি এই নগরীতে আট বছর ছিলেন। তাকে প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়েছেন দাদি, মা, দুই ফুফু এবং তার ছোট বোন এলিজাবেথ। অল্প বয়সে বাবা হারানোর দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য পরিবারের সবাই তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন। একদিন নেতসি শোপেনহাওয়ারের দর্শনের বই খুলে দেখলেন।

ছোট্ট বয়সেই বইটি পড়ে তিনি অবাক হলেন। এক জায়গায় গিয়ে থমকে গেলেন। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে নারী-পুরুষের ভালোবাসার কথা। পুরুষ নারীকে তখনই ভয় পায় যখন সে তাকে ভালোবাসে। নারী তার ভালোবাসার জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারে।

ভালোবাসার কাছে অন্য সব কিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে পুরুষের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, 'তুমি নারীর প্রেমে আসক্ত হয়ো না। নারীর কাছে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজেকে বিসর্জন দেয়া'।

কিশোর নেতসি ছোট বয়সে এ দর্শনের মর্মার্থ বুঝতে পারেননি। তবে এ বাণী তার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। জরাথ্রুস্টের দর্শনে তিনি মোহিত হয়ে পড়েন।

একটা বিষয় ভেবে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন, কেন শয়তান তার বাবা এবং ছোট ভাইকে নিয়ে গেল? ঈশ্বরকে তিনি মহান করে দেখেছেন।

তার দৃঢ়বিশ্বাস, মৃত্যু এনে দেয় শয়তান। মনস্তাত্ত্বিকবাদগণদের মতে, ছোট শিশু বাবাকে হারালে এর জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে। নেতসিও তা-ই ভাবতেন।

ধীরে ধীরে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ভাবলেন, এর উত্তর পেতে ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে। সেটাই করলেন। বাইবেলের আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন।

ছোটকালেই বাইবেল এমনভাবে পড়লেন যে, তার বন্ধুরা তাকে লিটল মাস্টার বলে অভিহিত করেন।

স্কুলেও কঠোর পরিশ্রম করতেন। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সব পাঠ ছিল তার মুখস্থ। এই পারিবারিক ঐতিহ্য ধরেই নেতসি এগোতে থাকেন।

এই পরিবার থেকে পাঁচ প্রজন্ম ধরে ২০ জন পাদরি হয়েছেন। এর মধ্যে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট স্কলার হন। ১৭৭৬ সালে পরিবারের একজন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। নেতসি ফ্রেডরিক ১৪ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নুরেমবার্গ থেকে তারা চলে যান। ওয়েনগার্টেনে। এখানে তার মা বাড়ি কেনেন, নেতসি পরবর্তী সময়ে এই বাড়িটাকে জাদুঘরে পরিণত করেন।

কিশোর বয়সে জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে খুব বেশি জেনেছেন নেতসি, তা বলা যায় না। তিনি দান্তের দর্শন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আস্তে আস্তে সব কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সময় পাল্টে যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানির সাহিত্য, সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। শিল্পকলা, সংগীত এবং দর্শনেও নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবৃত্তিক যে আন্দোলন শুরু হয়, তা পূর্ণতা পায় উনিশ শতকে।

পৃথিবীতে জার্মান দার্শনিকরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। সেইসঙ্গে চলতে থাকে মতের বিরোধিতা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দর্শনতত্ত্বের এই ভাবধারার শেষ পরিণতি ছিল দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

এই মহান তার ১৮০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তবিক অর্থে দার্শনিকের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরও তার মূল্যবোধ জার্মানিতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে জার্মানিতে সাহিত্য এবং দর্শনে রোমান্টিকতাবাদের প্রভাব শুরু হয়। দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেন পৃথিবী কীভাবে তার গতিপথ নির্ধারণ করে। কর্ম মানুষের চলার পথকে কীভাবে প্রসারিত করে তা নতুন করে ভাবতে শুরু করেন দার্শনিকরা। ধর্ম থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা উপলব্ধির জন্য ধর্মের প্রয়োজন। এর সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে। প্রকৃতির ওপর প্রযুক্তির প্রভাব সন্নিবেশিত হয়।

> *রোমান্টিকতাবাদে মানুষ উৎসাহিত হলেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি কেউ। এ এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়। বিশ শতকের ষাটের দশকে ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে সংস্কৃতির বিরোধ শুরু হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা প্রচার করতে থাকেন রোমান্টিকতাবাদের কোনো শেষ নেই। ধর্মকে তারা নিংড়ে ফেলে দিতে চান।*

অন্যদিকে ধর্মপ্রচারক পাদরিরা বলতে থাকেন সাহিত্যের সীমা-পরিসীমা আছে। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়। কার্যত সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সভ্যতার সংকটে পতিত হয় ইউরোপ। নেতসি উপলব্ধি করলেন ইউরোপের দার্শনিক এবং চিন্তাবিদগণ ভুল করছেন। তিনি গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনতত্ত্বের প্রতি আস্থাশীল হন।

মানুষের জীবনে দর্শনতত্ত্বের প্রভাব কতটা হতে পারে বিশ শতকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তরুণরা চে গুয়েভারার বিশালাকৃতির ছবি নিজের বেডরুমে রাখত। উনিশ শতকে টমাস কার্লাইল, জন ক্রমওয়েল এবং ফ্রেডরিখ নেতসি ছিলেন তরুণদের কাছে বীর নায়ক।

ফ্রেডরিখ নেতসি ছুটির দিনে বাসায় সাহিত্য এবং সংগীত ক্লাব তৈরি করেন। সেখানে বন্ধুদের নিয়ে রোমান্টিক কবিতা পাঠ করতেন, জাঁ পল রিখটারের রোমান্টিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতেন।

তৎকালীন সংগীতের পুরোধা এয়াগনারের গান ছিল তাদের মুখে মুখে। কিন্তু এই সুখের দিনও বেশিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। স্কালফোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর আকস্মিক পরিবর্তন হয়। ১৮৫৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সব কিছু পাল্টে গেল।

সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যদিও তার মতবাদ এবং দর্শন নিয়ে বিরোধের জন্ম হয়। জেনেসিস ধর্মগ্রন্থে প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা যেভাবে বলা হয়েছে, ডারউইন ঠিক তার বিপরীতে অবস্থান নেন।

মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি বা পরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে। তবে ডারউইন তত্ত্বের ভুলও রয়েছে। আজ পর্যন্ত বানর থেকে কেউ মানুষ হয়নি।

একটি দর্শন বেশ কাজে লেগেছে, জেনেসিস ধর্মগ্রন্থে বলা আছে—ঈশ্বর যদি প্রতিটি বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি না করতেন তাহলে একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য বোঝা যেত না। ফলে পশুর ওপর মানুষের যে প্রভাব, তা পরিষ্কার হতো না।

> *সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হতে পারত না মানুষ। পশুর জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়নি। মানুষকে সব ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে।*

ডারউইনের মতবাদ নিয়ে সারা ইউরোপে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং গির্জায় পাদরিরা তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

এরই মধ্যে ১৮৬৪ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ফ্রেডরিখ নেতসি। তিনি দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই দর্শনতত্ত্বের গোড়ায় কথা পাঠ করে ফেলেন। ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি তার বিদ্বেষ জন্মাতে থাকে।

ধর্ম তাকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে মা এবং বোনের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে যেতে অস্বীকার করেন। বাবার মতো তিনি আর গির্জার পাদরি হতে চাইলেন না।

দর্শনতত্ত্ব নিয়ে মেতে ওঠেন। লাতিন, গ্রিক এবং রোমের প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তার পড়াশোনা করেন। তার চিন্তা-চেতনার মধ্যে জরাথ্রুস্টবাদ এখান থেকেই জাগ্রত হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা

ফ্রেডরিখ নেতসি তার দর্শন এবং সাহিত্য প্রচার শুরু করেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রাইন নদীর পাশেই বন বিশ্ববিদ্যালয়। তার চিন্তা এবং দর্শন নিয়ে ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা কী ভাবছিলেন সেটা নতুন করে ভাবতে হচ্ছে সবাইকে।

তিনি পারস্যের নবীর দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নবী জরাথ্রুস্ট। পারস্যের এই নবীর সনাতনী বিশ্বে নতুন দর্শন এনে দিয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বহু লেখক, চিন্তাবিদ ও ধার্মিক এই মহান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এ কথা ঠিক যে, জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা দিতে পারেননি চিন্তাবিদগণ। সনাতনী চিন্তাবিদদের অনেকের মতে, জরাথ্রুস্ট গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ভবিতব্যবাদী এবং জাদুকর।

তার দর্শন পিথাগোরাস থেকে প্লেটো পর্যন্ত সবাইকে প্রভাবিত করেছে। তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত দূত। ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের সময় চিন্তাবিদগণ পার্সীয়ার এই নবীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে।

সভ্যতার ইতিহাস এবং ধর্মের প্রসার কীভাবে ঘটেছিল তা অনেকেই বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটা সত্য যে, জরাথ্রুস্ট ছিলেন সেই পথপ্রদর্শক। এ ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টমাস হাইড।

তিনি ১৭০০ সালে জরাথ্রুস্টের মতবাদ প্রচার করেন। তিনি গ্রিক, লাতিন, হিব্রু এবং আরবি ভাষায় খুঁজে পান ধর্মের অতীত ইতিহাস এবং পার্সীয়ার প্রাচীন নবীর কথা।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বর্তমান যে মতবাদ, তা জরাথ্রুস্ট থেকে আগত। এটা দার্শনিকদের বিশ্বাস। ১৭৩০ সালে ফরাসি উপন্যাসিক এবং নাট্যকার রোমা তার নাটকে দেখান ধর্মের ওপর ব্লাশফেমি আইনের প্রভাব। তিনি জরাথ্রুস্টকে নিয়ে নাটক তৈরি করেন।

ফরাসি লেখক এবং দার্শনিক ভলতেয়ার তুলে ধরেন ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম-কানুন এবং মানুষের দয়ামায়া ও মানবতার কথা :

'সার্বভৌম এই আইন চীন এবং জাপানে ব্যাপৃত হয়
জরাথ্রুস্টের দর্শন পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষ তার জন্য কাঁদছে
এক ঈশ্বরকে ভালোবাসো, নীতিবান হও, জন্মভূমিকে ভালোবাসো।'

এটা সত্য, জরাথ্রুস্ট তিন শতাব্দী ধরে দার্শনিকদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তার দর্শনকে তারা সেরা বলে মেনে নিয়েছেন। বহু দার্শনিক বলেছেন, জরাথ্রুস্ট প্রকৃত অর্থে মানুষকে কী শেখাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। জরাথ্রুস্টবাদীরা প্রকৃত অর্থে পার্সীয়ার, নাকি ভারতবর্ষের সেটাও অনেকের জানা নেই।

মধ্যযুগে ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমাকার ধারণ করে। এশিয়ায় চলছে মুসলিম শাসন। মুসলিম শাসকরা কখনোই জরথুস্ত্রের দর্শন মেনে নেননি। বরং তারা এটাকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাস মনে করতেন। কাফির হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়।

কিন্তু এটা এখন পরিষ্কার, পাশ্চাত্যের সম্রাটগণ যে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, সেটা জরাথ্রুস্টের দর্শনের কারণেই সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠী এশিয়ায় তাদের কলোনি আরো প্রসারিত করল। শাসকগোষ্ঠী তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সব অপকর্ম শক্তির জোরে আইন করে নিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো মুসলিম এবং হিন্দুসমাজ।

এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ-গোষ্ঠীতে ফাটল ধরাল লেডি কানকটের একটি বক্তব্য। এতে ঐতিহ্যবাহী হিন্দুসমাজ এবং গৌরবময় মুসলিম সমাজে রক্তের হোলি বয়ে যায়।

বিশ শতকের আরেক পর্যটক লেডি শাহেলো পার্সীয়া থেকে ভারতবর্ষ সফর করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ধর্মযাজকরা খুবই দরিদ্র, চেহারায় হতশ্রী অবস্থা এবং জনগণের কাছে সবচেয়ে নিগৃহীত। জরাথ্রুস্টবাদীরা তাদের থেকে ভিন্ন। তাদের ধর্ম অন্যদের থেকে পৃথক।

প্রাচীন বোম্বের নাগরিকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পৌত্তলিক পূজায় ব্যস্ত থাকত। ধর্মীয় অনুশাসন অনেকেই বুঝতে পারত না।

ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সব কিছু ছিল ঘোরের মধ্যে। জ্যোতির্বিদ্যায় অনেকেই পারদর্শী ছিল। অনেকেই জ্যোতিষীদের কাছে যেত। সচেতন মহল এটা সহজে মেনে নিতে পারত না।

ইতিহাস ছিল তাদের নখদর্পণে। সব কিছু থেকে তারা ছিল ভিন্ন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আদান-প্রদান করার চেষ্টা করত। বহু ধর্মের, বর্ণের মিলন ঘটে আরব সাগরের উপকূল দিয়ে।

১৭১৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর মি. বাউচার সুরাট থেকে জরাথ্রুস্টবাদের ওপর একটি বই নিয়ে আসেন। বইয়ের ওপরের অংশে লেখা ছিল ভেনিদাদ। এ বইটি ছিল বডিলিন লাইব্রেরিতে।

বইটিতে জরাথ্রুস্ট ধর্মের স্বর্ণ সময়ের কথা উল্লেখ করা আছে। অনেকেই এ বইয়ের মৌলিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেনি। বইয়ের অনেক পাতায়

দুর্বোধ্য ছবি ছিল। এ বইয়ের কপি লিখিত আকারে পুনর্মুদ্রণ করে প্যারিসে পাঠানো হয়। সেখানকার এক ছাত্র বইয়ের লেখা নতুন করে উদ্ধার করে।

জরাথুস্ট মতবাদ এবং দর্শন নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬-৫৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে স্যার এরিকসন পেরির লেখা জরাথুস্ট দর্শন বিশ্বকে নতুন করে চিন্তায় ফেলে দেয়।

আব্রাহাম এরিকসন পেরি ছিলেন মুদির দোকানদারের সন্তান। ছিলেন ক্যাথলিক তিনি। সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়ে এরিকসন মেধা ও প্রজ্ঞার জোরে ইতিহাসবিদ হয়ে ওঠেন।

প্রাক ফরাসি বিপ্লবের কাহিনী তিনি রচনা করেন। পড়াশোনা করেন তিনি। প্রোটেস্ট্যান্টদের ধর্মগ্রন্থ ছিল তার নখদর্পণে। এ ক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের উৎসাহ পান তিনি। পার্সি এবং আরবি ভাষায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। উটরেচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে তিনি কোনো সরকারি চাকরির চেষ্টা করেননি। বরং আরো গবেষণা মনোনিবেশ করেন।

প্যারিসে ফিরে যান। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করেন এখানে বসেই।

বডলিন লাইব্রেরি থেকে জেনদাদের ধর্মীয় বই তার হাতে যখন পৌঁছাল তখন তিনি ২৩ বছরের যুবক। তিনি অনুধাবন করলেন তাকে কী করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতবর্ষে যাবেন। যাবেন সুরাটে; যেখান থেকে এ বই তার হাতে এসেছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করলেন। বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ করলেন। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণ এ জন্য পারিপার্শ্বিক যেসব গ্রন্থের প্রয়োজন তা সহজে মিলছিল না। আর এ সময়ে ১৭৫৪ সালে ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে উপনিবেশবাদের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা উত্তর আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকা এবং ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু ওই বছর ব্রিটেন ভারতবর্ষে তার সৈন্য প্রেরণ করে।

এরিকসন সৈন্যদের জাহাজে উঠে পড়েন। বাড়ির কাউকে কিছু না বলে ভারতবর্ষের উদ্দেশে রওনা হন। তার পরিকল্পনার কথা কাউকে জানাননি।

ছোট্ট একটি ব্যাগে দুটি শার্ট, দুই জোড়া মোজা, দুটো প্যান্ট, গণিতের এক সেট সরঞ্জাম, একটি হিব্রু বাইবেল এবং পূর্বে যাওয়ার মানচিত্র নেন। প্যারিসের নৌবাহিনী যখন তার উদ্দেশ্য জানতে পারল তারা তাকে প্রথমে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু তিনি অটল থাকায় কোনো সমস্যা হয়নি। তারা তাকে পূর্ব ভারতের পন্ডিচেরীতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। এটা ছিল সে সময় ফরাসিদের কলোনি।

যাত্রা ছিল খুবই দুর্বিষহ। ফ্রান্স থেকে ভারতে আসতে পাঁচ মাস সময় লেগেছিল। জাহাজে সময় যেন কাটছিল না। এই সময় তিনি বেশ কয়েকবার অসুস্থ হন। ডায়রিয়া হয় তার। সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল, জাহাজে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে।

শতাধিক জাহাজকর্মী মৃত্যুবরণ করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন এই রোগে মারা যান। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর তরুণ এরিকসন যখন পন্ডিচেরীতে পৌঁছালেন তখন তিনি খুবই দুর্বল। এর পরও মনোবল হারাননি।

পণ্ডিচেরী দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রবন্দর এবং পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় ভ্রমণকেন্দ্র। অধিকাংশ বাড়ি ফরাসি কায়দায় তৈরি। এ অঞ্চল এক সময় ফরাসিদের কলোনি ছিল তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়।

নগরীর পুলিশরা ফরাসি স্টাইলের টুপি পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ফরাসির জাহাজগুলো বন্দরে ভিড়ত। তাদের গতিপথ কিছুটা পরিবর্তন হয়। ছোট ছোট নৌকা দিয়ে বন্দরে আসত মালামাল এবং মানুষজন। সাগরের মূল চ্যানেলে জাহাজ রক্ষিত থাকত।

এভাবেই এরিকসন ভারতে পৌঁছালেন। বন্দরে নেমেই তিনি ভারতের ফরাসি মিশনের প্রধানের বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দেন।

তার চলাফেরায় বিষণ্ন ভাব। পরনের শার্ট ছেঁড়া। চলাফেরায় কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটতে হাঁটতে এক স্থানে গিয়ে থামলেন। তিনি দেখলেন অসাধারণ সুন্দর এক অট্টালিকা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুশোভিত ছয় ফুট লম্বা এক ব্যক্তি। তার পরনে সাদা জ্যাকেট। কোনো সন্দেহ নেই তিনিই ভারতীয় ফরাসি মিশন প্রধান।

পণ্ডিচেরীতে ফরাসি সাম্রাজ্যের নিদর্শন যেন প্রকাশ পেয়েছে। ডি পোরেনকে দেখা মাত্র মিশন প্রধান এগিয়ে এলেন। তিনি প্রভুর মতো নয়, বরং সাধারণ আচরণ করলেন।

> *হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে মিশে গেলেন। গভর্নর জেনারেল মন্ত্র পাঠ করার মতো বললেন : আমাদের সাক্ষাৎ হলো। অব্রাহাম হেইক্যান ভারতবর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৮ মাস সময় ব্যয় করেছেন।*

ভারতে ফরাসি কলোনিতে তার মেধা, যোগ্যতার মূল্যায়ন ঠিকমতো হয়নি। বরং চাতুর্যকে তারা গ্রহণ করেছিল।

এসব সত্ত্বেও তার নিজস্ব একটা দর্শন ছিল। তিনি জরাথ্রুস্ট দর্শন নিয়ে গবেষণা করতেন। পার্সি ভাষায় যত ধর্মীয় বই ছিল তা তিনি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নিজে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

দিন-রাত পরিশ্রমের কারণে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন আব্রাহাম হেইক্যান। হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ কাটাতে হয়। পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হয়। এ সময় নতুন চিন্তা তার মাথায় প্রবেশ করে। তিনি আবিষ্কার করেন বাংলায় লাটিন পার্সি ভাষার খুবই কদর।

তিনি নৌপথে বাংলার উপকূল অঞ্চল চন্দননগরে পৌঁছান। এই অঞ্চলটি ছিল সে সময় ফরাসিদের অধীনে। স্থানীয় সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার যোগসাজশে একটি ক্যাম্প গড়ে তোলেন। পন্ডিচেরীর মতো চন্দননগরে থাকার সুব্যবস্থা ছিল না বলেই তাকে ক্যাম্প গড়তে হয়।

ফরাসি শীর্ষ কর্মকর্তারা তার কাছে ঘেঁষতেন না। তিনি তাদের খুব বেশি মূল্যায়ন করতেন না। বরং চন্দননগরে এসে বাংলা এবং পার্সি ভাষা শেখার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে ওঠেন আব্রাহাম হেইক্যান।

গভীরভাবে লক্ষ করেন, ফরাসি অধীনস্থ চন্দননগর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সৈন্যদের দখলে চলে যাচ্ছে। তিনি পুনরায় সুরাটে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা প্রদেশ। সুরাট উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে হাজার মাইল দূরে। ডি পোরেন গঙ্গা নদী পাড়ি দিলেন নৌকায় করে।

তিনি আশা করছিলেন মাত্র নদীতে নৌকা পৌঁছানোর পর স্টিমারে উঠবেন। এটা ছিল ১৭৫৭ সালে ফেব্রুয়ারির ঘটনা। এই গঙ্গা নদীর আধিপত্য ও বিস্তার ফরাসি এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ফলে যেকোনো মানুষের নৌপথে ভ্রমণ ছিল অসম্ভব। ১৭৫৭ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে ব্রিটিশ বাহিনী পুরোপুরি বঙ্গোপসাগরের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

ব্রিটিশদের দখলে পন্ডিচেরী চলে যায়। নৌপথে ভ্রমণ আর নিরাপদ থাকল না। সমাধানের একটাই পথ–সড়কপথে পরিভ্রমণ করা। কিন্তু পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ ভ্রমণ করতে হলে নৌপথ ছাড়া এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়া সম্ভব নয়। ডি পোরেন বাংলা থেকে সুরাটে এক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করলেন।

তার ভ্রমণ সম্পর্কে স্যার এরিকসন পেরি বর্ণনা করেছেন :

> *বাংলা থেকে পন্ডিচেরী বারোশ মাইল দূরে। বাংলার ফরাসি ক্যাম্প থেকে সড়কপথে দুর্যোগপূর্ণ সড়ক এটি। কখনোই কোনো ইউরোপীয় বিপদসংকুল এই পথ পরিভ্রমণের চিন্তা করত না। যে মাসে প্রচণ্ড গরম পড়ত।*

জঙ্গলে ঘেরা সড়ক। গহিন বনে বাঘ এবং হিংস্র পশুর বিচরণ ছিল। এত বিপদ সত্ত্বেও ডি পোরেন এই পথ পাড়ি দিতে মনস্থির করেন। তার এই

ভ্রমণের সাথী হন একজন মাঝি। তিনি ৫ মে ১৭৫৭ সালে রওনা দেন। বাংলা থেকে পন্ডিচেরী পৌঁছান ১০ আগস্ট। তার এই ভ্রমণ যেমন ছিল বিপজ্জনক, তেমনি চিত্তাকর্ষক। বহু বিপদ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছান। খাবার সংকটে পড়েছেন, ডাকাতের হাতে সব হারিয়েছেন।

পথে বহু লাশ দেখেছেন। পন্ডিচেরীতে পৌঁছা মাত্র দেখা পেলেন ভাইয়ের। তার ভাইকে সুরাটের ফরাসি কারখানায় নির্বাহী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন ডি পেরোন।

তারা মালবার উপত্যকা পাড়ি দিয়ে মাহি এলাকায় চলে যান। সেখান থেকে ইহুদি অধ্যুষিত কোচিনে গিয়ে আশ্রয় নেন। কোচিন থেকে গোয়া, আরাদবাদ, ইখোরা উপত্যকা, কান্দেশ এবং সর্বশেষ সুরাটে পৌঁছান।

এই সফর ছিল দুই বছর। বাংলা যেমন গবেষক এবং মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের মেধার প্রয়োগের স্থল ছিল, সুরাটে ততটা ছিল না। উপরন্তু ইউরোপের দুই শক্তিশালী রাষ্ট্র ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের সেনারা পরস্পরের সঙ্গে উপমহাদেশে যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের সঙ্গে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীরও কখনো কখনো খণ্ডকালীন যুদ্ধ হতো।

এমনকি পার্সি সম্প্রদায় সনাতনী এবং সংস্কারপন্থিদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত ব্রিটিশরা।

এ ক্ষেত্রে ফরাসি দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের প্রতি সবার আগ্রহ ছিল বেশি। তাদের ধ্যান-ধারণা অনেকে মেনে নিত। পর্তুগিজ মিশন প্রধান তার এক বইয়ে বর্ণনা করেন :

> *'আব্রাহাম ডি পেরোন অনেক কিছুর দাবিদার। তিনি অনেক সমাধান করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কখনো অর্থের লোভ ছিল না। ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি। আলেক্সান্ডার ডি পেরোন কঠিন সমস্যা সমাধান করতে উভয় পক্ষের কথা শুনতেন।'*

প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করতেন। ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বরে হল্যান্ডের মিশন প্রধান এম টেইলকার্ট তাকে চিঠি লেখেন :

শ্রদ্ধেয় ডি পেরোন,
আপনার কাছে যাকে পাঠানো হচ্ছে তার কাছে জরাথ্রুস্ট দর্শনের একটি বই রয়েছে। আপনাকে বইটি উপহার দেয়া হলো। এ গ্রন্থে জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য লিখিত রয়েছে। আমার বিশ্বাস, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বইটি

পড়বেন। বইয়ের পাতা যেন হারিয়ে না যায়। আর যত দ্রুত সম্ভব আবার ফিরিয়ে দেবেন।'

ডি পোরেন বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন। তিনি আধুনিক পার্সি ভাষায় নতুন করে লিখলেন। পার্সি ভাষায় অনুবাদ হলো বইটি। এটা ছিল কোনো ইউরোপীয় চিন্তাবিদের প্রথম পার্সি ভাষায় কাজ। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা। দিনটি ছিল ২৪ মাস ১৭৫৯ সাল।

অব্রাহাম হেইক্যান বেদান্ত অনুবাদ করেন পরবর্তী সময়ে। বেদান্ত অনুবাদের পূর্বে একজন প্রবীণ শিক্ষকের কাছে বেদান্ত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। আধুনিক চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং সমাজসংস্কারের কাছ থেকে বেদান্ত ভাষায় প্রজ্ঞা অর্জন করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এগোতে থাকেন ধীরে ধীরে। অব্রাহাম হেইক্যান নতুন দর্শনের সন্ধান পেলেন। পশ্চিমা বিশ্বের জরাথ্রুস্টের দর্শন যেন হারিয়ে পড়েছে ভারতের সুরাট নগরীতে–এটা দেখে অবাক হলেন হেইক্যান।

আনকা ডি পোরেন জরাথ্রুস্ট মতবাদ বা দর্শনের তিনটি বই প্রকাশ করেন ১৭৭১ সালে। তিনি যে সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন তা দাবি করেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে হতাশ হয়েছেন।

দার্শনিক ভলতেয়ার তার তিন খণ্ডের জরাথ্রুস্ট দর্শনে অনেক ভুল তুলে ধরেছেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিন ভাষার ছাত্র উইলিয়াম জোন্স জরাথ্রুস্ট দর্শন অনুবাদ করেন। এই প্রজ্ঞাবান শিক্ষক পার্সি থেকে ফরাসি ভাষায় যথেষ্ট সুচারুরূপে কাজ সমাধা করেন। পরে তাকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পার্সি ও ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যে তিনি ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ডি পোরেনের তীব্র সমালোচনা করেন। সঠিকভাবে জরাথ্রুস্ট দর্শন তিনি তুলে ধরতে পারেননি। ফলে পাঠক সমাজে এর প্রভাব পড়েনি। উইলিয়াম জোন্সের মতে, জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না ডি পোরেনের।

উইলিয়াম জোন্সের এ লেখা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

> *তিনি তার বন্ধুকে লেখেন : 'ফরাসিদের প্রতি আমার ঘৃণা হচ্ছে। ডি পোরেন সাধারণ দর্শন বুঝতে পারেননি। মুসার ওপর যেমন তাওরাত এবং মোহাম্মদ (সা.)-এর ওপর কোরআন নাজিল হয়েছিল, তেমনি জরাথ্রুস্ট দর্শন প্রচার করেছিলেন জরাথ্রুস্ট নিজেই। কিন্তু জরাথ্রুস্ট তার দর্শন বা চিন্তার কথা নিজে লিখে যাননি। তার মুখের কথা তার মতাবলম্বীরা সংগ্রহ করে রেখেছিল। আর এই মতবাদ হারিয়ে গিয়েছিল। বহু সন্ধানের পর তা সংগ্রহ করা হলো। বহু সময় ধরে তা সংগৃহীত হয়েছে।'*

স্যার উইলিয়ামস জোন্স জরথ্রুস্ট মতবাদ এবং দর্শন সংগ্রহের জন্য ভারত ভ্রমণ করেন। ভারতীয় ধর্মের প্রাচীন ভাষা-সংস্কৃতি শেখেন। তিনি ছিলেন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পর বহু বছর পার হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন স্যার উইলিয়ামস জোন্স পার্সি ক্লাসিক পাঠ করেন। পার্সি সনাতনী কবিতা এবং গ্রন্থ অনুবাদের চিন্তা করেন।

পার্সি ভাষার বিশেষ শব্দগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করেন স্যার উইলিয়ামস। পাঠ করেন ধর্মগ্রন্থ অ্যাভেস্তা। ডি পোরেন এই গ্রন্থ নিজস্ব চিন্তা-চেনতনায় সংস্করণ করেন। তবে ডি পোরেনের চিন্তা-চেতনা এবং দর্শনতত্ত্বে কিছু ভুল ছিল বলে মনে করেন উইলিয়ামস। পার্সি ভাষায় মূল শব্দগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেন, পার্সির শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে উৎসারিত।

এক পর্যায়ে তিনি বিস্মিত হন যে, পার্সির মৌলিক দশটি শব্দের সাত থেকে আটটি এসেছে সংস্কৃতি থেকে।

ডি পোরেন সংস্কৃত ভাষা জানতেন না। তার বিশ্বাস এবং ভালোবাসা ছিল সংস্কৃতির প্রতি। এত কিছুর পরও ডি পোরেনের দৃষ্টিভঙ্গির দোষারোপ করেন স্যার উইলিয়ামস।

তিনি উল্লেখ করেন :

> *'ডি পোরেন তার তরুণ বয়সে জরথ্রুস্টবাদের দর্শন বুঝতে ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ফরাসি ভাষায় যুরাথ্রুস্ট দর্শন উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার নিজ দেশবাসীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন।'*

দার্শনিক জোন্সেরও সংস্কৃত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধ্যান-ধারণ ছিল না। তিনি পার্সি এবং ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। এ ক্ষেত্রে মহান কাজ করেছেন স্যার উইলিয়ামস।

> *এশিয়ার ভাষার উন্নয়নে তিনি কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হচ্ছে : সংস্কৃত ভাষার গঠনশৈলি খুবই অসাধারণ এবং চমৎকার। গ্রিক এবং লাতিন থেকেও অনেক সুবিস্তৃত। এখানে আরো বহু বিষয় জড়িত রয়েছে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়টি জড়িত। লাতিন এবং গ্রিকরাও জরথ্রুস্টবাদেও বিশ্বাসী হতে থাকে। তবে তাদের চিন্তা-চেতনায় কিছুটায় ভিন্নতা ছিল। এখানে সংস্কৃতি এবং প্রাচীন পার্সির সম্মিলন ঘটে। স্যার উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত এবং পার্সির এই যে মিলন তাতে অভিভূত হন। তিনিও জরথ্রুস্টবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।*

জরাথুস্টবাদের প্রসার ইউরোপে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভি পোরেনের কারণে। ১৮২০ সালে ড্যানিশ দার্শনিক জরাথুস্ট দর্শনের পাঠ্যসূচির প্রসার ঘটাতে থাকেন। এই দর্শন নিয়ে বর্তমান সময়ে ব্যাপক গবেষণা করছেন দার্শনিকরা। ১৮৫৭ সালে স্যার এরিকসন পেরি জরাথুস্ট দর্শন ফরাসি, জার্মানি এবং ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৮৬০ সালের প্রথম অর্ধ দশকে ব্যাপকভাবে জরাথুস্ট দর্শন প্রচারিত হতে থাকে।

জার্মানিতে জরাথুস্ট দর্শনের প্রসার

বন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফ্রেডরিখ উইলহেম নেশজে পারস্যের এই ঋষির কথা বহু আগেই শুনেছেন। তিনিও এই মহামানবের দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। জার্মান ভাষায় জরাথুস্ট দর্শন পাঠ করে অভিভূত হন। এই দর্শনের মৌলিক কথা হচ্ছে : 'ভালো এবং মন্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।' সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্যায় থেকে মানুষ কীভাবে দূরে থাকতে পারে। লোভ-লালসা থেকে অবশ্যই সরে থাকতে হবে।

পরের সম্পত্তি লুট করা বা নিরীহ মানুষকে ঠকানো কোনো ধর্মের মধ্যে পড়তে পারে না। মানুষকে সত্যের পথে থাকতে হবে। নেশজের বোন এলিজাবেথ উল্লেখ করেন, জরাথুস্টবাদে তার ভাই এতটাই আকৃষ্ট হন যে, তিনি তার পরবর্তী জীবনে এই দর্শন বাস্তবায়নে নানা স্বপ্ন রচনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা বলা বা ধারণা করা কঠিন যে, জরাথুস্টবাদ তিনি কীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। নেশজের ধর্মীয় দর্শন জরাথুস্টবাদে প্রকাশ হয়েছিল। অন্য এক জার্মান দার্শনিক স্কোপেনহার দর্শন যেন জরাথুস্টবাদের সঙ্গে মিলে যায়।

তার চিন্তা-চেতনায় ফুটে ওঠে এ পৃথিবীতে জন্ম না নেয়াই উত্তম। আর পৃথিবীতে আগমন ঘটলেও যত দ্রুত সম্ভব পরলোকে গমন করলেই ভালো। এতে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ কম হয়। স্কোপেনহারের এই মতাদর্শে অভিভূত হন নেশজে।

তার মনে হয়, এ যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। নেশজে নতুন করে চিন্তায় ডুবে গেলেন। স্কোপেনহারের দর্শন পাঠ করে তিনি কাঁদলেন। ভাবলেন, নিশ্চয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। বাবা ওয়াগনারের মৃত্যু তাকে বিচলিত করে তুলল।

বহু চিন্তা-ভাবনা করে লেখেন :

'গহিন অরণ্যে বসে আছি–কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছি না
সত্য এবং মিথ্যা সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে।
উপভোগ করছি প্রকৃতির আলো

সত্যের ছায়া যেন আমাকে আবৃত করে রেখেছে।
এই ঝরনাধারা, এই সূর্য, চন্দ্র–এ যেন অনন্ত
হঠাৎ করে এক বন্ধুর আলো-ছায়া দেখতে পেলাম।
মনে হয় জরাথুস্ট আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছে।'

একজন যেন হঠাৎ করে দুজনে পরিণত হলেন। জরাথুস্ট তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। এটা আক্ষরিক বিষয় নয়। অনুভূতির ব্যাপার। ধর্মীয় নৈতিকতা ফুটে উঠল।

জরাথুস্টবাদের যে উদ্যমশক্তি, তা প্রবলভাবে আলোড়িত হলো নেশজের দেহ-মনে। ধর্মীয় স্বাধীন সত্তা তাকে প্রলুব্ধ করল। এটা বুঝতে পারলেন, সত্য এবং ন্যায়ের পথে যে থাকে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান পান।

প্রকৃতির রূপ-রস একজন গ্রহণ করেন কিন্তু জানতে চান না; তিনি অন্ধকারেই থেকে যান। যিনি জানতে চান তিনি অনেক কিছুই দেখতে পান। সত্য সন্ধানকারীর চোখে-মুখে সর্বদা আলোর ছোটাছুটি ওঠে। এ আলো ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। সত্য পথযাত্রী ঐশীবাণী শুনতে পান। ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন।

আর সব সময় সর্বশক্তিমানের সন্ধানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, অপার্থিব জগতের লোভ-লালসা থেকে ঊর্ধ্বে থাকেন তিনি। নেশজে এসব চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতি জরাথুস্টবাদ থেকেই পেয়েছেন।

চার খণ্ডে বিস্তৃত জরাথুস্টবাদ সঠিকভাবে পরবর্তী সময়ে লেখেন নেশজে। তিনি এই ধর্মগ্রন্থের সব দিক তুলে ধরেন। তার কথাই ছিল :

'এক ঈশ্বরবাদী হও। সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ো না। পরের সম্পত্তি দখল করো না। ব্যভিচার করো না। জরাথুস্টের প্রকৃত শিক্ষা মানবতাবাদ–সেটা সবার জন্য অবশ্যম্ভাবী। এই ধর্ম দর্শন মানতে অলৌকিক কিছু করে দেখাতে হয় না। বরং যে মানুষ সত্যের পক্ষে থাকবে, ন্যায়বিচার করবে, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, লোভী হবে না, সেই হবে প্রকৃত মানুষ। মানবতা, নৈতিকতা তৈরি হবে মানুষের কর্মের মধ্যে। এটাই হবে প্রকৃত ধর্ম।'

ধর্মপ্রচারক এবং প্রথম নবী হিসেবে খ্যাত জরাথ্রুস্ট নিজেও কিছু ভুল করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়। জরাথ্রুস্ট যে শিক্ষা দেন তা হচ্ছে :

> *'ঈশ্বরের অস্তিত্ব শেষ। ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিবিশেষের জন্য স্বস্তিদায়ক, তবে নিজের থেকেই মুক্তির পথ খুঁজতে হয়। খ্রিষ্টীয় ঈশ্বর পাশ্চাত্য সভ্যতার সেরা ধ্যান-ধারণা দিতে পারে না। ফলে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ব্যক্তি তথা সমাজের ওপর যেন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।*

ধর্মীয় বিশ্বাস, নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিকতার যেন কোনো মূল্য নেই। সময় এসেছে নতুন কোনো মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় চিন্তাধারার জাগরণ ঘটানোর।

ধর্মের ভালো এবং মন্দ দিক যেন তীব্রভাবে ফুটে উঠছে। মানব চেতনায় নতুন করে জন্ম দিচ্ছে মূল্যবোধের। সমাজে কেউ ভালো হলে অন্যজন শয়তানের সমতুল্য।

ভালো এবং মন্দের মিশ্রণ ঘটছে। পাশাপাশি অবস্থান করছে। মন্দ আছে বলেই ভালোর মূল্য অনুধাবন করা যায়। অসৎ আছে বলেই সৎ লোকের মূল্য ফুটে ওঠে। এ জন্য সমাজে বসবাসরত সবাই সমানভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচারে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন :

> *'পশুর কোনো জ্ঞান বা বোধশক্তি নেই। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার আচরণ পশুর মতো হতে পারে না। মানুষকে সর্বপ্রকার অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে। অতি মানবীয় গুণাবলির মাধ্যমে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। যদিও অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের সাফল্য অর্জন করতে পারে না। সম্পদের লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ তাকে পেয়ে বসে। এর থেকে যারা উত্তরণ ঘটাতে পারে তারাই প্রকৃত মানব। এর জন্য ইচ্ছাশক্তিরও প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে মানুষ ত্যাগ-তিতিক্ষা করে সে-ই ভালো মানুষ। আর এর বিপরীতে যার অবস্থান, সে মানুষরূপী শয়তান।'*

জরাথ্রুস্টবাদের এই দর্শন খ্রিষ্টীয় সমাজে ব্যাপক নাড়া দেয়। তিনি এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেন খ্রিষ্টীয় সমাজকে নাড়া দিলেন। বাস্তবিক অর্থেই খ্রিষ্টানরা কি যিশুর দর্শন ঠিকমতো মেনেছে? জরাথ্রুস্টের মতে, তারা ধর্ম মানেনি।

জরাথ্রুস্টের আদর্শে বিশ্বাসীরা বলতে পারে কে ভালো? এর সহজ উত্তর মানুষের অভ্যন্তরে নৈতিকতা জাগরিত হলেই সে সেরা মানুষে পরিণত হয়। এর জন্য তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন হয়। আর খারাপ কোনোটি? যে মানুষের মধ্যে পাপাচার এবং খারাপ কিছুর জন্ম নেয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা সে কোনো কিছুই মনে রাখে না। উপরন্তু লোভ-লালসা তাকে ধ্বংস করে দেয়। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। পরকালের কথা চিন্তাই করে না। শুধু সম্পদের লালসা তাকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। নেশজে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এক দর্শন নিয়ে পড়ে থাকতেন।

জরাথ্রুস্ট মতবাদ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি এই ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্য পৃথিবীতে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি ভাবতে থাকেন, হয়তো জরাথ্রুস্ট ধর্ম বিশ্বে প্রচার করে যেতে পারবেন না। তিনি হয়তো'পরলোকে চলে যাবেন।

১৮৮৯ সালের ৩ জানুয়ারি সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলপাইন পর্বতমালায়। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তার মন খুবই অস্থির। পর্বতমালার বিপরীতে জাতীয় গ্রন্থাগার। বৃষ্টি থামলে সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। নিচে ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নীরবে তাকিয়ে থাকলেন ঘোড়ার দিকে। তার কাছে মনে হচ্ছিল, এই অবোধ প্রাণীটাও প্রকৃতির লীলাখেলা অনুধাবন করে। যাই হোক, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। ধীরে ধীরে গ্রন্থাগারের দিকে গেলেন। সেটাই ছিল তার শেষবারের মতো লাইব্রেরিতে গমন। তিনি যেন উপলব্ধি করলেন ঈশ্বর প্রদত্ত ভালো এবং মন্দের মৌলিক পার্থক্য।

লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করলেন। তার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম নিল। কিন্তু কোনো কিছুরই যেন সঠিক উত্তর মিলছে না।

> *নেশজে নিজের মনেই বলতে থাকেন : 'ঈশ্বর মানুষকে পাঠিয়েছে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে। ভালো কাজ করতে। স্রষ্টা এক এবং অনন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। সমাজে কারো কোনো ক্ষতি করা যাবে না। অপরাধ করা ঠিক হবে না।'*

তিনি যেন মহান হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনোই সচেতন ছিলেন না। নিজেকে সে রকম কিছু ভাবতেন না। অসুস্থতার মধ্যেও নেশজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচারে একের পর এক বই লেখেন। ভগ্নদশা শরীর নিয়েও তিনি এক দশক বেঁচে ছিলেন। তার বোন লিসা তার সেবাযত্ন করেছেন। লিসা কখনো কাঁদলে তিনি বলতেন, 'তুমি কি সুখী নও? এই পৃথিবীর প্রতিটি

মানুষকে একদিন চলে যেতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কারো যেন কোনো ক্ষতি না করি।' এর পরই তার মৃত্যু হয়। মাত্র ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন।

নেশজে নতুন করে জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচার করেন। মানুষকে আবারও ভাবতে শেখান ইহলৌকিক বিষয় খুবই সাধারণ ব্যাপার। অনন্তকাল ধরে মানুষকে পরকালে থাকতে হবে। সেটাই মানুষের প্রকৃত ঠিকানা।

জরাথ্রুস্টবাদকে নতুন করে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন নেশজে। এই ধর্ম এবং দর্শনের মৌলিকত্বে অন্য সব ধর্মের সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যায়।

> *ইসলাম ধর্মেও যেমন বলা আছে : 'তোমাদের জন্য পৃথিবী একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। স্বল্প সময়ের জন্য এখানে আগমন। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে হবে। ন্যায়বিচার করতে হবে। অপরের অনিষ্ট বা ক্ষতি করো না।'*

জরাথ্রুস্টের ধর্ম প্রচার এবং নেশজের দর্শন নিয়ে ভাবছিলেন পল জিগবাসজেক। ট্রেনে নিজের আসনে বসে ছিলেন। ট্রেন ভিয়েনা থেকে জুরিখের উদ্দেশে ছুটে চলেছে। অস্ট্রিয়ার প্রদেশ ভোরালবার্গ সীমান্ত অতিক্রম করছে ট্রেন। আলপাইন পর্বতমালা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে খুবই ভালো লাগছিল।

এই আলপাইন পর্বতমালায় বসেই নেশজে জরাথ্রুস্টের ধর্ম প্রচার করে গেছেন। আমার বিপরীত আসনে বসেছিল তরুণ পর্যটক। সে ওয়াকম্যান কানে লাগিয়ে সম্ভবত গান শুনছিল। কান থেকে ফোন সরিয়ে নিল।

জানালা দিয়ে পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছিল। পাহাড় থেকে যেন ঝরনার শব্দ ভেসে এলো। সে কিছুটা অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। কিছুটা বিচলিত সে।

আসলে তার মনের ভেতরে আলোড়ন শুরু হয়েছে। সত্য দর্শনে ভাবুক হয়ে উঠছে সে। প্রকৃতির কাছে মানুষ ফিরে এলে নিজেকে চিনতে পারে। নেশজের মৃত্যুর শত বছর পরেও এবং জরাথ্রুস্ট ধর্ম পৃথিবীতে প্রাচীন হলেও মানুষ যেন আবারও পুরনোকেই খুঁজছে। এই তরুণ পর্যটক যেন তার প্রমাণ।

পৃথিবী যতই নতুন শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যাক, মানুষ ধর্ম, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে। মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে সত্য ধর্ম। বিশ শতাব্দী পার হয়ে গেছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, বিশ শতাব্দীর কথা মানুষ স্মরণ করবে জরাথ্রুস্ট এবং নেশজের দর্শনের কথা।

চিন্তাবিদ, দার্শনিক, লেখক, চিত্রশিল্পি, গায়ক, মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যেকেই জরাথ্রুস্ট দর্শনের কাছে ঋণী।

বিশ্বখ্যাত গায়ক রিচার্ড স্ট্রস, গুস্তাভ মোহলার এবং ফ্রেডরিখ ডেলুস তার ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে গান্দ রচনা করেছেন। একইভাবে তার দর্শন অন্ধকার সমাজকে আলোর পথ দেখিয়েছে। নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সরকার জরাথ্রুস্টের মতবাদ এক লাখ ৫০ হাজার কপি ছাপিয়ে তরুণদের মাঝে বিতরণ করেছে। তরুণরা সর্বত্র ছুটে গেছে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাণী প্রচার করেছে।

এমন অনেক মানুষ ছিল, যারা ধর্মের বিপক্ষে তারাও জরাথ্রুস্ট মতবাদ শুনেছে। তারা এটা উপলব্ধি করেছে, লোভ-লালসা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে এই মতবাদে।

> *এ ক্ষেত্রে নেশজে বলেন : যখনই ধর্মীয় কোনো পুরোহিত বা গির্জার প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি, তখনই তারা নানা রকম অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সম্পদের লোভ-লালসা ছিল।*

জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীকে জরাথ্রুস্ট মতবাদ বোঝাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন নেশজে। নাৎসিদের মধ্যে উগ্রজাতীয়তাবোধ কাজ করত। ফলে তারা নিমেষেই অন্যকে ধ্বংস করে দিত। এটাও একধরনের ক্ষতি।

জরাথ্রুস্টবাদে কোনো মানুষের ক্ষতি করার কথা বলা হয়নি। নেশজের বোন এলিজাবেথ নাৎসি বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিটলারকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নিজ গৃহে নাৎসিদের সোনা কৃতিত্বের স্বরূপ জাদুঘর তৈরি করেন। এটা নেশজের পছন্দ ছিল না।

মৃত্যুর আগে তিনি লিখেছিলেন :

'আমি আমার ভাগ্য সম্পর্কে জানি। আমার এক সহযোগী আমার কাছে এলো। সে কিছু বিষয় জানতে চাইল। মানুষের ধর্মীয় যে শঙ্কা এবং শেষ মুহূর্তে মনোবল ভেঙে পড়ে তার কী কারণ হতে পারে? মানুষ কেন সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগে? বাস্তবিক অর্থে এসবের কোনো উত্তর আমার জানা ছিল না। আমি নিজেও স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বাস্তবিক অর্থে আমি নিজেও জানি না এর সঠিক উত্তর।'

নেশজের অনুসারীরা তার আদর্শ ও মতবাদ মেনে চলার চেষ্টা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ ছিলেন নেশজে। বিশ্বখ্যাত জার্মান দার্শনিক সিগমন্ড ফ্রয়েড তাই উল্লেখ করেছেন : 'এই পৃথিবীতে যত দার্শনিক অতীতে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসবেন।

তারা কেউই নেশজের সমকক্ষ হতে পারবেন না। তিনি সত্যকে এবং ন্যায়ের পথে সবাইকে পরিচালিত করেছেন। জরাথ্রুস্ট দর্শন তার থেকে আর কেউ বেশি বুঝতে পারেননি এবং প্রচার করেননি।'

দার্শনিক কার্ল জাং প্রতি সপ্তাহে নেশজের জরাথ্রুস্টবাদ নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ এই পাঁচ বছর জুরিখ মনস্তাত্ত্বিক ক্লাবে প্রতি রবিবার সেমিনার করতেন। বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সেমিনার বন্ধ করে দিতে হয়। পোল্যান্ডের চিন্তাবিদ মার্টিন বাবের তার জীবনে নেশজে এবং জরাথ্রুস্ট দর্শনের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি।

তিনি পোলিশ ভাষায় জরাথ্রুস্ট ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেন। তার মতে, নেশজে প্রকৃত দার্শনিক। তিনি একক এবং অনন্য।

ইরান এবং মধ্য এশিয়ায় প্রথম নবী হিসেবে চিহ্নিত জরাথ্রুস্টের শিক্ষা ছিল নৈতিকতা। আর এই বার্তা নেশজে প্রাচীন পারস্যের সবার মাঝে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত ধর্মীয় কল্পকাহিনী এবং মোহ ও লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ জরাথ্রুস্ট দর্শন ভুলে গেছে। মানুষের ভেতর ভালো এবং মন্দের লড়াই পুনরায় শুরু হয়েছে।

মন্দের আস্ফালন দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। লোভ-লালসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তা কল্পনাকেও হার মানায়।

আলপাইন পর্বতমালা পেরিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। অনেক কিছুই ভাবছিলেন পল ক্রিসবাসজেক। আলপাইন পর্বতমালা যখন পার হচ্ছিল ট্রেন, তখন তার মনে অনেক প্রশ্ন উদয় হলো। এই পর্বতমালায় যেন জাদু আছে।

পাহাড় থেকে গান ভেসে আসছে। কে গাইছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আধ্যাত্মিক গান। আসলে পল ক্রিসবাসজেকের মধ্যেই আধ্যাত্মিক দর্শন পেয়ে বসেছে। তিনি নিজের মনেই উপসংহার জানার চেষ্টা করলেন। এ যেন নেশজের জরাথ্রুস্ট দর্শনের প্রতিফলন ঘটছে। তিনি ভাবতে লাগলেন জরাথ্রুস্টের শিক্ষা তার মধ্যে কাজ করছে।

দুই হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টীয় ধর্মের চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ এবং সেইসঙ্গে দার্শনিক প্লেটোর মতবাদ বাস্তবিক অর্থে বস্তুজগতের প্রতি মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং পার্সিয়ান নবীর বার্তা ধর্মীয়ভাবে শান্তির বারতা এনে দিয়েছে। নেশজে খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তার সব ভালোবাসা, প্রেম প্রকৃতির প্রতি।

পাহাড়, পর্বত, বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালায় স্রষ্টার সন্ধান করতেন। পৃথিবীতে মানুষমাত্রই লোভী। মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতেন তিনি।

এই দার্শনিক ঈশ্বরের সন্ধান করতেন। স্বর্গের পথে হাঁটতে চাইতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শেষ বিচার বলে কিছু আছে। মানুষের লোভ-লালসার বিচার একদিন হবেই। প্রত্যেককে পাপের শাস্তি পেতে হবে। ভালো কিছুর জন্য পুরস্কার পাবে।

বিশ্বাসী এবং সেরা মানুষ পরজগতে অতি মানবিক গুণসম্পন্ন হবে। সে থাকবে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে।

জরাথ্রুস্টের দর্শন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন নেশজে। তিনিই নতুন করে জরাথ্রুস্টবাদ বিশ্বে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলেন। গির্জার ধর্মপ্রচারকরা এটাকে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে মতবাদ বলে ঘোষণা দিলেন। জরাথ্রুস্ট দর্শনকে গির্জায় বিরোধিতা করল।

পূর্বদিকে সূর্য উদিত হচ্ছে। সমরকন্দের শেরদার ইসলামিক কলেজে মূল প্রবেশ দ্বারে সূর্যের প্রতিকৃত তৈরি করে রাখা হয়েছে। সেই সাথে সিংহের প্রভাব বোঝানো হয়েছে। প্রখর তেজোদিপ্ত এবং জন্তের সূর্য শক্তির কাছে সবাই পরাস্ত। জরথুস্টবাদে ঈশ্বর এবং মানবতাবাদের কথা বুঝানো হয়েছে।

দার্শনিক ফ্রেডরিখ উইলিয়াম নেসতাজে। তিনি জরাথুস্ট দর্শন আধুনিক যুগে পুনরায় জীবন্ত করে তুলেছেন।

সিল মারিয়া। সুইজারল্যান্ডের একটি গ্রাম। এখানে রয়েছে এনগাডিন উপত্যকা। এই উপত্যকা ২০০০ মিটার ঢালু। সাধু-সন্ন্যাসি এবং ধর্ম প্রচারকদের বিশ্বাস, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই উপত্যকাতে এসে জরাথ্রুস্ট দর্শনের প্রকৃত তথ্য জানা যায়।

মন্টসেগার পর্বতমালা। এখানেই মহান হেরাসির অনুসারিরা মিলিত হয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের জনগোষ্ঠী কুয়াশাচ্ছন্ন এই পর্বতমালায় একজোট বেঁধে মহান হেরাসির সাধনা করেছিল।

মন্টসেগার নগরীর প্রবেশ পথ। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৫০০ শ্রমিক দীর্ঘ দশ মাসেরও বেশি সময় পরিশ্রম করে এই নগরীর গিরি পথ তৈরি করেছিল। এখান থেকেই জরাথ্রুস্টের শিক্ষা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পরে।

কারাকাস নগরী। পঞ্চম শতাব্দিতে নিসিপথের রাজা এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন। এই রাজপ্রাসাদ নিয়ে হাজারো উপাখ্যান রয়েছে। বিশেষ করে ভিক্টোরিয় যুগের রূপকথা রয়েছে পরতে পরতে। তবে ইরান ও পারস্যের জরাথ্রুস্টের শিক্ষার কথা রয়েছে এই রাজপ্রাসাদে।

সারায়েভোর দুটি বিশাল টাওয়ার– মমো এবং উজেব। এই দুটি টাওয়ারের নাম রাখা হয় বিখ্যাত দুই কৌতুক অভিনেতার নামে। এই টাওয়ার দুটি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন দেখলেই যোজোম্বিন যুগের কথা মনে হবে। যোজোম্বিন ছিলেন জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসী।

রোমের নম্রতা। সাসনিয় সম্রাট শপুর রোম সম্রাট ভ্যালেরিয়ান এবং আরবীয় শাসক ফিলিপের সম্ভাষণ গ্রহণ করছেন। জরাথুস্ট্রবাদ দর্শনের ধর্ম প্রচারক কার্তির পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন। ইরানের সাইরাস পাহাড়ের সন্নিকটে পাথরে এই চিত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মিথ্রাস মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দুই বার মন্দির নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ব্রিটেনে রোমান শাসকের অবসানের পর আবার ভেঙ্গে ফেলা হয়।

মিথরাস, মধ্যরাতের ঈশ্বর। এই মন্দিরেই ষাড় হত্যা করা হতো। প্রাচীনকালে এই মন্দির নিউক্যাসেলের অতীত ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছিল।

দারিউসের জন্য উপহার। নববর্ষের আগমনে পার্সেপোলিস নগরীর ধর্ম প্রচারকগণ শাহের জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। ব্যাবিলন থেকেও উপহার আসত।

ইসরাইলি নবীর সমাধিস্থল। দানিয়েলের সমাধি ক্ষেত্র। পশ্চিম ইরানের সুসা নগরীতে এই সমাধি ক্ষেত্র। মেসোপোটেমিয়ার ইহুদীরা এবং ইরানের জরাথুস্টবাদীরা এখানে নিয়মিত পরিভ্রমণ করত।

৩.

মহান ঐশীবাহক

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
আমুর খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের উৎসর্গ

এশীয় মাইনর থেকে শুরু করে ইউরোপে জরাথ্রুস্ট দর্শনের প্রসার ঘটতে থাকে। তার অনুসারীরা প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে নতুন মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। বিশেষ করে দক্ষিণ ফ্রান্সের পিরেনিয়ান পর্বতমালায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী ঘটাতে থাকে জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রচার।

পিরেনিয়ান পর্বতমালাটি ছিল স্পেন সীমান্তসংলগ্ন এলাকায়। এ এলাকায় ছিল মন্টেসেগারের দুর্গ। পিরেনিয়ান পর্বতমালা থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট নিচে এর অবস্থান। দুর্গটির নিরাপত্তার জন্য সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এখানেই বাস করত জরাথ্রুস্ট ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসীরা।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তারা মত প্রকাশ করত। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। শুধু ফ্রান্স নয়, ইউরোপের বহু দেশ থেকে লোকজন পিরেনিয়ান পর্বতমালায় এসে ধর্ম দীক্ষা নিল। এই ধর্মের প্রতি নিজেকে উৎসর্গিত করল। বহু মানুষ সমাজ-সংসার ছেড়ে চিরস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস শুরু করল।

জরাথ্রুস্ট ধর্মের শুধু এশিয়াতেই নয় বরং ইউরোপজুড়ে প্রসার ঘটতে থাকে। পারস্যের এই ধর্মীয় নেতা পৃথিবীর মানুষকে নতুন করে শেখালেন ভালো এবং মন্দের পথ। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আসতে বললেন।

১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মন্টেসেগার দুর্গ দখল করে নেয় জরাথ্রুস্টবাদীরা। কোনো রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয় বরং মানুষকে ভালোবাসা, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যকে পথের দর্শন দেখায়। প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে মতবাদ দিতে থাকল। এর মাধ্যমে একটি বিষয় প্রকাশ হলো, পাশ্চাত্যে প্রচলিত বিশ্বাসের দিন যেন

ফুরিয়ে আসছে। ক্যাথলিক ঊর্ধতনরা প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানে।

এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হতে আরো ১০০ বছর পার হয়ে যায়। আলবিজেনসিয়ান নগরীতে ধর্মযুদ্ধ শুরু হলে দুর্গ পুরো নিয়ন্ত্রণে আসে। এই নগরীর নাম ছিল আলবি। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এই নগরীতে প্রথম আঘাত আসে। যুদ্ধ সংঘটিত হয়। টানা ৫০ বছর সত্য ও ন্যায়ের জন্য ধর্মযুদ্ধ চলে। একদিকে তৃতীয় পোপ, অন্যদিকে রাষ্ট্র। ইউরোপের পশ্চিমাংশ জুড়ে এই ধর্মযুদ্ধ হয়।

বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। সম্পদের ক্ষতি হয়। এক পর্যায়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ধর্মপ্রচারক পাদরিগণ রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনে নেন। রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। দুটি শক্তির উদ্ভব ঘটে।

একটি সত্য ও ন্যায় এবং অন্যটি মিথ্যা ও শয়তান কর্তৃক দুষ্কর্ম। এ কথা বহু আগেই জরাথ্রুস্টের পুরনো মতবাদেই শিক্ষা দেয়া হয়। মধ্যযুগে গির্জায় ধর্মপ্রচারকরা সহজে এটা মেনে নিতে পারেনি।

মানুষ কেন এত লোভী হয় এবং তার জন্য সব কিছু জলাঞ্জলি দেয়। একবারও কি সে জানে না লোভের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে? জরাথ্রুস্ট পারস্য থেকে শুরু করে পৃথিবীজুড়ে লোভ-লালসা ত্যাগের কথা বলেছেন।

সকল প্রকার পূজা অর্চনায় বিরোধিতা করতেন। পারস্য, বর্তমানে ইরানের জনগোষ্ঠী এক সময় অগ্নি উপাসক ছিল।

জরাথ্রুস্ট বলতেন, সকল ক্ষমতা সর্বময় ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। তার সঙ্গে কোনো কিছুর মিলন ঘটানো মহাপাপ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ যে রক্তপাত ঘটিয়েছে, তা শুধু নিজের ক্ষতিই ডেকে এনেছে।

একটা পর্যায়ে সে নিজেই শেষ হয়ে গেছে। পোপের প্রতিনিধি আরনন্ড অ্যামলাক এবং সিনেটের ষষ্ঠ রেমন্ড ধর্ম এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা কারো অজানা নয়।

কেউই লাভবান হয়নি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধর্ম এবং রাষ্ট্র। একটা পর্যায়ে দুজনেরই জীবনাবসান ঘটে।

কিন্তু যে রক্তের হোলিখেলা চালু করে দিয়ে যান, তা অব্যাহত থাকে বহুদিন। শেষ পর্যন্ত মানুষের মুক্তি আসে। ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মানুষ মুক্তি পায়।

রাজার শাসন থেকেও ফ্রান্সের মুক্তি ঘটে। খ্রিষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী এলাকাগুলোতে পোপ কীভাবে ধর্মযুদ্ধের অধ্যাদেশ জারি করে যেন রক্তের হোলিখেলা শুরু করলেন।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল চতুর্থ ধর্মের যুদ্ধ তাকে নতুন করে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এই যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত এবং অপ্রত্যাশিত।

কোনো পক্ষই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। প্রচলিত ধর্মের প্রতি যুদ্ধ এবং শত্রুপক্ষকে ধ্বংসের জন্য প্রত্যেকেই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। এভাবেই এগোতে থাকে বিশ্ব। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসেও যখন কোনো কোনো রাষ্ট্রে ধর্ম নিয়ে লড়াই চলে তখন ভাবতে অবাক লাগে যে, মানুষ কী শিক্ষা পেল।

একচ্ছত্র আধিপত্য, ক্ষমতার দাম্ভিকতা, প্রচলিত ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, শাসকগোষ্ঠীর লোভ-লালসা আজও কতটা সমাজকে নীচু করে রেখেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

মানুষ সত্যিই যেন ভুলে গেছে জরাথ্রুস্টের মতবাদ। বহু মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে শুধু শাসকগোষ্ঠীর লোভের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কথাই ধরা যাক। এ সময় নাৎসি বাহিনীর হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। অত্যন্ত সম্পদশালী নগরী বেইগার ধ্বংস হয়ে গেছে। নারী-পুরুষ, শিশু, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি ধর্ম উপাসনালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ যেন শয়তানের জয় হলো। গির্জায় পাদরিরা কেঁদেছে। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। তারা বলেছে :

> *'তাদের ধ্বংস করো। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। পোপের কাছে বিশ হাজার নাগরিক গিয়ে তাদের ইচ্ছার কথা জানালো। তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে লড়াই করতে চাইল।'*

ধর্মযুদ্ধে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। লাখ লাখ যোদ্ধা ধর্মযুদ্ধে সোৎসাহে প্রাণ দেয়। নীতি এবং আদর্শের জন্য তারা লড়াই করে। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের লড়াই অব্যাহত থাকে। এ লড়াই ধর্মের জন্য যতটা, তার থেকে বেশি ছিল সত্য-মিথ্যার লড়াই।

মধ্যযুগে ক্যাথলিক অর্থডক্সদের ধর্ম প্রচারণায় রাষ্ট্র যে বাধার সৃষ্টি করে তাতে আবারও রক্তপাত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে আবারও ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ধর্মের জন্য জীবন দিতে কেউ যেন পিছিয়ে ছিল না।

কিন্তু দুই পক্ষের মানুষকে জিজ্ঞেস করা হলো কেন তারা যুদ্ধ করছে? তারা কী সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে? কোনো ধর্মই কি মিথ্যার আশ্রয় নেয়? মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধ তা মূলত নিজেদের অস্তিত্বের এবং ক্ষমতার দম্ভের লড়াই ছিল।

কেউই এটা বুঝতে চায়নি যে, এই নশ্বর পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আদর্শগত দিক থেকে ধর্মযুদ্ধে খ্রিষ্টান এবং মুসলমান কেউই উপকৃত হয়নি। ধর্মযুদ্ধের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ফিলিস্তিন বা এই অঞ্চলে অন্যকোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকল না।

ধর্মযুদ্ধে একবার ইসলামপন্থিরা জিতল। পরবর্তীকালে খ্রিষ্ট এবং ইহুদি সম্প্রদায় সব দখল করে নেয়। ঐতিহাসিক লে রয় লড্রিস মধ্যযুগে পিরেনিয়ান গ্রামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

পিরেনিয়ান গ্রামটি ছিল মন্টেলিওর কাছাকাছি। এর উত্তরে ছিল মন্টেসেগর। এর পাশেই পাহাড় ঘেরা এক গ্রাম। সেই গ্রামে এক মাতা তার শিশু সন্তানকে হারিয়েছিল। মৃত সন্তানের জন্য সে কাঁদত। একদিন স্বপ্নে সে দেখতে পেল তার সন্তান বলছে :

'কেঁদ না। ঈশ্বর তোমাকে আরো একটি সন্তান দেবেন।'

সেটা ছেলে বা মেয়ে যেকোনোটাই হতে পারে। এটা অষ্ট্রীয় অঞ্চলের এক মহিলার জীবন কাহিনী। এভাবেই দিন পার হতো মহিলার। এক পর্যায়ে সে উন্মাদ হয়ে পড়ে।

১৯৩৯ সালে নাৎসি বাহিনী বহু সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার করে। নাৎসিদের যেমন ধর্মের প্রতি কোনো বিশ্বাস ছিল না তেমনি মধ্যযুগে ক্যাথলিক গির্জার প্রধানদের নৈতিকতার অবনতি ঘটে। কিন্তু উভয় পক্ষই ইহুদিদের শত্রু ভাবত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসক এবং বিশ শতকের শাসকবৃন্দ একটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠী সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজব্যবস্থায় লড়াই করে। এ ক্ষেত্রে স্ট্যালিন মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন।

মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে গির্জার প্রধানগণ ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের ওপর শত অনৈতিক নিয়ম-কানুন অবলীলাক্রমে চাপিয়ে দিত। কিন্তু সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থাও যে সুখের ছিল তেমন নয়। রাশিয়ায় প্রকৃত অর্থেই কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না। শাসকশ্রেণী ভুলে গিয়েছিল সব নিয়ম-নীতির কথা। তারা কোনো দর্শন মানত না।

সাম্যবাদী ব্যবস্থার নামে শোষণ যেন সাধারণ নিয়মে পরিণত হলো। অবিনশ্বর পৃথিবীতে সব কিছু ছেড়ে একদিন বিদায় নিতে হয়, তা যেন ভুলে গেল। সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করল।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শন যেন পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হলো। একদিন ঠিকই সাম্যবাদ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। মানুষের মধ্যে আবার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্যাথলিক গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা শুরু হলো।

জরাগ্রস্ট দর্শন নতুন করে আলোড়িত হলো মানুষের মধ্যে।

ইউরোপের সাধারণ মানুষ শত বছরের বেশি সময় ধরে গির্জার দ্বারা নির্যাতনের শিকার। এ থেকে তাদের মুক্তি এলো জরাগ্রস্ট দর্শনে এবং মতবাদে। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং এর অবস্থা গির্জা নয়, সাধারণ মানুষ নির্ধারণ করে নিল।

মানুষ মুক্তি চায়। সে বিশ্বাস করে, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সম্পদের লোভে লালায়িত হলে চলবে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং তার কাছেই নত হতে হবে। পোপরা ধর্মের প্রচার করলেও সম্পদের প্রতি তারা ছিল লালায়িত।

ক্যাথলিক পোপরা নিজেদের স্বার্থে ধর্ম এবং ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দিত। ধর্মীয় নেতারা বিশ্ব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করেই মত দিতে শুরু করলেন। এ ক্ষেত্রে রোমের সম্রাটগণ গির্জার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নিলেন। পোপ সমন জারি করলেন–প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে তারা।

মধ্যযুগে ধর্মীয় সাংস্কৃতিতে সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। গির্জায় ধর্মগুরুরা নিজেদের মতো করে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। সাধারণ মানুষকে দক্ষ হতে হয়েছে।

শুধু খ্রিষ্টান ধর্মে নয়–হিন্দু, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক জাতি-গোষ্ঠী কেউই বাদ যায়নি। মূলত সাধারণ জনসাধারণের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল ধর্মীয় গুরুরা।

মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটতে থাকে। ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠী ধর্মের আইন-কানুন প্রয়োগ করতে থাকে। তারা চেষ্টা করে ধর্মীয় আইনের শাসনের মাধ্যমে পারিবারিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলো ক্যাথলিক গির্জার পুরোহিতদের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বিকল্প তারা কিছু ভাবতে পারত না।

ইউরোপ যখন অন্ধকারে ছিল সাধারণ মানুষ প্রকৃতির কোনো বৈষম্য দেখলেই ভীত হয়ে পড়ত। তাদের বিশ্বাস ছিল, গির্জার পুরোহিতরাই তাদের উদ্ধার এবং রক্ষা করবে। এ সময় পোপ বলেন,

'প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা।'

বরং ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা যুক্তিসংগত এবং মানুষের কল্যাণের জন্য।

এভাবেই যেন সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ধর্মের প্রতি প্রচলিত বিশ্বাস জরাথ্রুস্টবাদেও নেই। ইরান এবং মধ্য এশিয়ার প্রথম নবী পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়েছেন যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাধনা করো। সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি জিনিসই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার অস্তিত্বের কথা কোথাও তিনি অযৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেননি। পর্বতমালা থেকে শুরু করে সাধারণ সমতল ভূমি এবং নদী থেকে মহাসাগর পর্যন্ত কোথায় নেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, সর্বত্র তিনি বিরাজমান।

সহস্র বছর পূর্বে আমরা যদি ফিরে যাই তাহলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরফাচ্ছাদিত এই মন্টেসেগার নগরী। এই নগরী ছিল খুবই সুন্দর এবং সাজানো-গোছানো। পরিকল্পনার ছাপ সর্বত্র। সভ্য নগরীর সব কিছুই সুস্পষ্ট বিরাজমান ছিল। কিন্তু এই জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। বহুমাত্রিক পূজা অর্চনা আর সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে নানা কূপমণ্ডূকতায় বিশ্বাস শুরু করল। এখানে কবিতা, গান, নাচের আসর চলতে থাকে। অশ্লীলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নারীর প্রতি হয় চরম অবিচার। এভাবে এক সময় মহাপতন আসে। এই নগরীর ইতিহাস যেন এক রূপকথা।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ফরাসি কবি শেরেন ডি ট্রয়েস এই নগরী এবং রাজা আর্থারকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেও অবাক হন, কীভাবে এই নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা ভেবে। এটা হয়েছিল মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্মের

প্রতি আস্থা এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি অনাস্থার কারণে। এখানেও জরাথ্রুস্টবাদের দর্শন যেন প্রভাবিত হলো। তার দর্শন ছিল পৃথিবীতে দুটি মৌলিক ক্ষমতা বিদ্যমান। একটি হচ্ছে ঈশ্বর কর্তৃক সর্বময় ক্ষমতা, অন্যটি ধ্বংসের বা শয়তান কর্তৃক পরিচালিত। শেষে ঈশ্বরই জয়ী হবেন। কারণ তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

মধ্যযুগে গির্জার প্রধান অর্থাৎ ফাদার এবং তার পরিচালনাকারীরা স্বীকার করলেন শয়তান বলে কিছু একটা আছে এবং সে খুবই বিপজ্জনক শক্তি। মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। আর ঈশ্বর মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুটির মধ্যে একে অপরের তুলনা হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শয়তানের সৃষ্টি নিয়ে আছে বিশাল এক কাহিনী। সে আগুনের সৃষ্টি। মূলত সে ছিল জিন জগতের অধিবাসী। সর্বশক্তিমান যখন এই জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন ঠিক তখন ফেরেশতার অনুরোধে সর্বশক্তিমান তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। সে সর্বত্র উপাসনা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে সর্বশক্তিমানের এক নির্দেশ না মানায় সে হয়ে যায় শয়তান বা ইবলিস। সর্বশক্তিমান তাকে এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত তার আয়ু থাকবে। এর ফলে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসীরা শয়তানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর যা-ই বলি না কেন, তিনি মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন। মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। বিপরীতে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে প্রতি মুহূর্তে বিচলিত করার চেষ্টা করছে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জীবনপ্রবাহ সব কিছুই ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত। জরাথ্রুস্ট দর্শনে সেটাই বলা হয়েছে।

মধ্যযুগে খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ ধর্মযাজক হজরত ইব্রাহিম, ইসহাক, ইহুদিদের নবী জ্যাকব সবাই সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। তারা মানুষকে একটা কথাই বলেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে। সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করতে নিষেধ করেছেন তারা। লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকতে হবে। এই পৃথিবী থেকে কোনো কিছু আশা করা বৃথা মাত্র। মানুষ কোনোমতেই শান্তি আসা করতে পারে না। তারা প্রতিনিয়ত জটিল অবস্থার শিকার হচ্ছে। জরাথ্রুস্ট দর্শনে এ কথা বলা হয়েছে : মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যায় তাহলে সে কোনো শান্তি পাবে না। কোনো ক্ষমা নেই, নেই আনন্দ। সুখ-শান্তি, দয়া-ভালোবাসা কিছুই তার মধ্যে থাকবে না। পৃথিবীতে যত দিন সে

থাকবে তত দিন যেন শুধু যন্ত্রণার মধ্যে বাস করবে। এক অন্তর্জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারবে সর্বক্ষণ। পার্থিব জগৎকে দোজখের সঙ্গে তুলনা করেছেন জরাথ্রুস্ট। জীবন প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। সুস্থভাবে কোনো কিছুই সে ভোগ করতে পারবে না। সে তার বিশ্বাস নিয়ে বাস করবে; কিন্তু সেই বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। পুরো জীবন একটা ধোঁয়াশার মধ্যে থাকবে। পুরো জীবন অন্ধকারে থাকবে। কারো সাহায্য-সহযোগিতা, উপদেশ-পরামর্শ কিছুই পাবে না। এই অস্থিরতার কারণে এক পর্যায়ে কোনো কিছুই খেতে পারবে না। পানি, দুধ, মাংস, মাছ, ডিম, মাখন, পনির কোনো সুস্বাদু খাবার তার কাছে ভালো লাগবে না। তার মধ্যে কোনো ভালোবাসা থাকবে না। পার্থিব জগতের কোনো ভালো কিছুর জন্য সে প্রার্থনা করতে পারবে না। যেহেতু সৃষ্টিকর্তার কথা সে শোনেনি, তাকে মানেনি, তাই এক পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সে একাকী হয়ে যাবে। তার অনুসারীরা তাকে খুঁজবে। এক অর্থে শয়তানের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাবে। এ যেন নিজের ক্ষতিই ডেকে আনল সে। এর বিপরীতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসীদের রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। ব্যাপ্টিস্টবাদীরা বলে, শ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টান হতে হলে ঈশ্বরের প্রার্থনা করো এবং শেষ পর্যন্ত তার আরাধনা করো। লোভ-লালসা ত্যাগ করো। জরাথ্রুস্টবাদের কথাও একই। তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনার কথা বলেছেন।

পশুপাখি যেমন প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে, তেমনি পাপীরা সমাজে বংশ বৃদ্ধিই করে মাত্র। সে যেমন নিজের কোনো উপকার করতে পারে না, তেমনি তার বংশের কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। শয়তানের কুমন্ত্রে দীক্ষিত হয় সে। এমন অবস্থা দাঁড়ায়, সে যে নারীকে বিবাহ করে তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ভয় থাকে না। তাদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো চিহ্ন থাকে না। ভালো কাজের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না।

খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ব্যাপ্টিস্ট মতবাদে আকৃষ্টরা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হয়। তারা ঈশ্বরের কথা শোনে। নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে ধনসম্পদের লোভ কম। তারা পার্থিব জগতে উন্নতি চায় না। তারা শুধু একটাই প্রার্থনা করে : ঈশ্বরের সাধনা করতে হবে। তার ভালো কিছু পেতে হবে। সর্বোপরি বেহেশতের সন্ধান পেতে হবে।

প্রতিটি ধর্মে রয়েছে বিশ্বাস। এটাই মৌলিকত্ব। মৌলিক দর্শনগুলো এবং উপাখ্যানগুলো ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সাধারণ মানুষ সমর্থন

করে। ইতিহাস থেকে যেটুকু জানা যায় তা হচ্ছে–পারস্য এবং খাজরাজ গোষ্ঠীর জরাথ্রুস্টের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। জরাথ্রুস্ট দর্শনে তাদের বিশ্বাস ছিল না। এক পর্যায়ে খ্রিষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসীরা নতুন করে ধর্ম দর্শন পাঠ করতে থাকে এবং নতুন পথের সন্ধান করে। প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাস শুধু একটি উপাখ্যান মাত্র। সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসীদের মূল ভিত্তি আসলে কী তাও সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। কারণ একেক শাসক, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় একেকটি শক্তির আরাধনা করত। এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি যাদের বিশ্বাস আর মূর্তিতে বিশ্বাসীদের মধ্যে একটা বড় ধরনের দ্বন্দ্ব বেধে গেল। যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার আরোগ্য পেতে চায় সে কখনো মূর্তি উপাসনা করতে পারে না।

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, তা ইংরেজ সাহিত্যিক শেক্সপিয়র জানতে পেরেছিলেন পিথাগোরাসের তত্ত্বের মাধ্যমে। পিথাগোরাস গণিতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তিনি এর মাধ্যমে মানুষের যে দর্শন তত্ত্ব প্রয়োগ হয়, তা-ই বোঝাতে চেয়েছিলেন। গণিতের মাধ্যমে তিনি একেশ্বরবাদীর দর্শন বোঝাতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক অর্থে জরাথ্রুস্ট মতবাদের কথাই যেন তিনি নতুন করে উপস্থাপিত করলেন। মানুষের জীবন এবং আত্মা একটি ছোট্ট পাখির মতো। যেকোনো সময় তা চলে যেতে পারে। পাখি যেমন বনবাদাড়ে শান্তিতে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি মানুষের আত্মা এক সময় চলে যায় সর্বশক্তিমানের কাছে। সেখানে তার বিচার হয়। ভালো কিছু করলে স্রষ্টার পুরস্কারস্বরূপ বেহেশত পায়। তখন তার আত্মা শান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। খাজরাজ গোষ্ঠী এই তত্ত্ব এবং ধারণা পেয়েছিল গ্রিক গণিতজ্ঞদের কাছ থেকে। এমনও অনুমান করা হয়, প্রাচ্যের দার্শনিক এবং ধর্মীয় গুরুরা এই দর্শন প্রচার করেছেন। যে-ই প্রচার করুক না কেন, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পৃথিবীতে এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি সবাইকে আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পারস্য এবং মধ্য এশিয়ায় প্রথম নবী হিসেবে পরিচিত জরাথ্রুস্ট মতবাদে সৃষ্টিকর্তার কথাই বলা হয়েছে। এ কথা সত্য, সৃষ্টিকর্তার দর্শন বোঝার ক্ষমতার সাধারণের মধ্যে নেই। আবার এটাও সত্য যে, প্রত্যককে সুষ্ঠু এবং সঠিক পথে পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। সাধারণ বিশ্বাসীরা এ আশা করতে পারে যে, তাদের পুনর্জন্ম ঘটবে। এর অর্থ এই নয় যে, সে পৃথিবীতে আবার আসবে। পুনর্জন্ম বলতে বোঝায় আত্মার পরিশীলিত রূপ। মানুষ মরণশীল; কিন্তু আত্মা অমরণ। জরাথ্রুস্ট প্রচার করেন, যে মানুষ সর্বশক্তিমানকে মরার আগে একবার বিশ্বাস করবে, তার মুক্তি ঘটবে। নিজেকে

শুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলে কেউ যেন তা নষ্ট না করে। এ কথা সর্বজনবিদিত, সর্বশক্তিমানের ওপর বিশ্বাস স্থাপনই মানুষের মুক্তির পথ।

পাশ্চাত্য বিশ্বের গির্জার পুরোহিতরা জরথ্রুস্ট প্রচলিত ধর্মের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারাও এক ঈশ্বরের সাধনা করেছেন; কিন্তু নীতিগত কারণে তাদের চিন্তা-চেতনায় ভুল ছিল। যিশুখ্রিষ্ট সর্বশক্তিমানের প্রতি মানুষকে সঁপে দিতে বলেছেন। আরাধনা করতে হবে ঈশ্বরের। সেখানে কোনো শরিক থাকবে না। পরবর্তীকালে দেখা গেল, খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা যিশুকে পূজা অর্চনা শুরু করল। সর্বশক্তিমানের সঙ্গে অংশীদার করল। ঈশ্বরের পুত্র বানাল তাকে। যার কোনো ভিত্তি নেই। পামিরের ধর্মযাজক জ্যাক ফর্নিয়ার এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যিশুর প্রকৃত অবস্থান খ্রিষ্টধর্মের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি পোপ হয়েছিলেন। ধর্মের সব অপপ্রচার, নীচুতা, হীনম্মন্যতা দূর করতে এবং এক সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছিলেন তিনি। প্রচলিত ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করেছেন। তিনি বাইবেলের পুরনো সংস্করণ ফরাসি এবং বলকান ভাষায় অনুবাদ করেন। বলকানরা চৌদ্দ শতাব্দীর শেষ দিকে পাশ্চাত্যের বিশেষ কিছু এলাকায় ইসলামের জয়যাত্রা রচনা করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অটোম্যান সুলতানের সহায়তায়। বহু মানুষ ইসলামের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল, সর্বশক্তিমানের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীগণ দলে দলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। প্রাচ্যের বিভিন্ন মিশনারি সংগঠক পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের জ্ঞান দিতে শুরু করে। বিশেষ করে রোমের পোপদের অত্যাচারে বহু সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়া কনস্ট্যান্টিনোপলের অত্যাচারের কথা সকলের জানা। বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। তারা রিফ্যুজি হয়ে পড়ে। অনেকেই মন্টেসেগার নগরীতে চলে যায়। বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া এমনকি পবিত্র বাইজানটিয়াম নগরী থেকে চলে যেতে থাকে। দশম শতাব্দীতে বুলগেরীয় ধর্মপ্রচারক কসমস তার 'সেরমন' গ্রন্থে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখা লেখেন। তারই অংশবিশেষ :

'প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ অর্থে একদম মেষ শাবকের মতো। তারা খুবই নম্র, ভদ্র এবং খুবই নীরব প্রকৃতির। তারা কোনো বাজে কথা বলে না। তারা হাসতে জানে না। তাদের আচার-আচরণ দেখে কখনো মনে হবে না নিজ ভূমি থেকে প্রত্যাগত। তারা যে খ্রিষ্টধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত

হয়েছে সেটাও বোঝার উপায় নেই। কিন্তু এ কথা সত্য, ভেতরে ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ের মতো। প্রতিশোধের নেশায় জ্বলতে থাকে সর্বক্ষণ। তারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর শয়তানের থেকেও অধম। শয়তান যেমন সব সময় যিশুর ক্রশকে ভয় পায় এবং ঈশ্বরের শক্তিকে ভয় পায়, তেমনি এসব প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা ধর্মযাজকদের ভয় করে। তারা প্রকৃত অর্থে কোনো আদর্শ বিশ্বাস করে না।' তারা সাধু-সন্ন্যাসীদের মতাদর্শকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে তেমন নয়। এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাসীরা একটি কথাই বলে : স্রষ্টাই সব। তিনি এই নশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন ধ্বংস করবেন।

প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের আরো একটি দৃঢ়বিশ্বাস হচ্ছে—অভাবনীয় কোনো ঘটনা ঈশ্বর কর্তৃক ঘটে না। বরং তিনি যা কিছু করেন সব কিছু হিসাব-নিকাশ করা। আর শয়তান মানুষের কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে।

প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের আরো একটি বিশ্বাস–পৃথিবীতে যত অপকর্ম বা নোংরামি, ক্ষতিকারক দিক তার কোনোটাই সর্বশক্তিমানের সৃষ্টি নয়। বরং এটা শয়তানের প্ররোচনা। প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা এটাও বিশ্বাস করে না যে, যিশুখ্রিষ্টের ভোজসভা উৎসব ঈশ্বরের নির্দেশে হয়নি। আর যিশুকে যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সে যিশু ছিল সেদিন ইউক্রাইস্ট। তারা ধর্মযাজক, গির্জার মতবাদ অস্বীকার করল। শুধু এক ঈশ্বরের প্রার্থনায় নত হলো। এমনকি মুসার নির্দেশ অমান্য করল। নবীর গ্রন্থ মানল না। কুমারী মেরিকে অস্বীকার করল। তার প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করল না।

কসমস থেকে আরো জানা যায়, যারা সমাজে একেবারে নিরীহ প্রকৃতির ছিল তাদের প্রতিও গির্জার পুরোহিতগণ নানা নিয়ম-কানুন জারি করতেন। প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা এসব অস্বীকার করত। কসমসের মতে, শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ সংসারী হলো। তখন থেকে তাকে লোভে পেয়ে বসল। মাংস এবং মদ খেতে শুরু করে। জীবনের রূপ, রস, আনন্দ থেকে সরে গিয়ে পঙ্কিল পথে পা বাড়াল। কসমসের এই ধারণা সত্য নয় বলে অনেক পুরোহিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদীরা সবাই যে গির্জার প্রধান ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে ছিল তা নয়। তারা সবাই মিথ্যা ধারণার প্রতি বিশ্বাসী ছিল এমন বলা যায় না। বরং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গির্জার ধর্মযাজকরা যেন সত্য প্রচার করে সেই

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। মধ্যযুগে গির্জার প্রধানদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশ সংশয় ছিল। তারা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেন। মানুষের মধ্যে গির্জার কর্মকাণ্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর মাঝেও যারা সত্য, ন্যায়নিষ্ঠা এবং স্রষ্টার দর্শন নিয়ে ভাবতেন তারাই সর্বশক্তিমানের আরধানা করতেন। যারা মতাদর্শ মানতেন না তারা আবার নারী-পুরুষ একত্রে চলতেন। বাস্তবিক অর্থে সমাজ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে সর্বশক্তিমানের প্রতি আস্থা, অন্যদিকে শয়তানের ধোঁকায় প্রলুব্ধ মনুষ্য সমাজ। পাশ্চাত্য দর্শনের মতে প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের যাত্রা বা সূচনা হয়েছিল বুলগেরিয়া থেকে।

গির্জায় পুরোহিত এবং নানরা তাদের কীর্তি নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হন। তারা ধর্মের অনুশাসন প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তারা প্রচার করেন নিজেদের মতো করে। না ছিল তাদের মধ্যে প্রকৃত খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচার, না ছিল জরাথুস্ট মতবাদের প্রতি বিশ্বাস। এমনও কথা প্রচলিত ছিল যে, গির্জার প্রধান ধর্মযাজক এবং নানরা সমকামিতায় জড়িয়ে পড়েছেন। বহু অনৈতিক কাজ করেছেন তারা। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে। স্রষ্টার দর্শন ও মতবাদ থেকে সরে যাওয়ায় এটা ঘটেছে। এর পরিণতি ভালো হয়নি। এক পর্যায়ে মন্টেসেগার নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পাপাচারে ভরে যাওয়ার কারণে সর্বশক্তিমান কর্তৃক এই শাস্তি প্রণয়ন হয়েছিল।

মন্টেসেগার নগরী কেন বিধ্বস্ত হলো তার ছোট্ট এবং বহুল প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে : 'রাইমের ধর্মযাজক একদিন অপরাহ্নে ভ্রমণে বের হন। তিনি চলতে চলতে পথে এক সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পান। ধর্মযাজক গার্বিস তিলবারি তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। তাকে এই প্রস্তাব দেন। তরুণী অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সে বলে, আমি আমার সতীত্ব হারাতে চাই না। কোনো প্রকার নোংরামিতে জড়াতে চাই না।'

ধর্মযাজক দেরি না করে মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন প্রধান বিশপের কাছে। শাস্তিস্বরূপ মেয়েটিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো। কিন্তু সেই পুরোহিতকে কোনো জেরা করা হয়নি। মানুষের এই অপরাধ এবং অবিচারের প্রতিশোধ সৃষ্টিকর্তা ঠিকই নিয়েছেন। একদিন মন্টেসেগার নগরী ধ্বংস করে দিয়েছেন। খ্রিষ্টধর্মের প্রধানদের শুধু এসব অপরাধের কারণেই তাদের পতন হয়েছে, তা নয়। অর্থডক্স এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রচুর। এ কারণে বহু রক্তপাত হয়েছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে মহান এবং অমরত্ব লাভের উপায় খুঁজে বের করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু

উভয় গোষ্ঠীই যেন ভুলে যায় তারা স্বল্প সময়ের জন্য এই নশ্বর পৃথিবীতে এসেছে।

প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং মধ্য এশিয়াজুড়ে জরাথ্রুস্ট দর্শন যেন হারিয়ে যেতে বসে। প্রত্যেকের মধ্যে যদি এক সৃষ্টিকর্তার শাসন মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা থাকত তাহলে তারা লোভ-লালসা ও অপকর্ম করতে পারত না। গির্জার প্রধানদের অপকর্ম এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান দ্বাদশ পোপ জনকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। এ ঘটনা দশম শতাব্দীতে ঘটে। তিনি দশম শতাব্দীতে গির্জায় পুরোহিতদের নানা অপকর্ম তুলে ধরেন। ধর্মের নামে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবলীলাক্রমে হত্যা, খুন, অপকর্ম, অবাধ যৌনাচার চলতে থাকে। গির্জা যেন মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ধর্ম যেন মুক্তি নয়, বরং অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয় প্রতিটি মানুষের কাছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, গির্জার নান ও মুক্ত চেতনার মানুষ একে অপরের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত সেন্ট জর্জ গির্জা একটি পতিতালয়ে পরিণত হয়।

বিচারে দ্বাদশ পোপ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, মন্টেসেগার নগরীর মতো আমি পতন চাইনি। আবার এটাও ঠিক, অপরাধের শীর্ষ চূড়ায় ওঠার ইচ্ছা ছিল না। কারণ আমি জানতাম, সব কিছুর শেষ আছে। আমি সেই সব পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি, যারা এর বিরুদ্ধে অনন্ত সংগ্রাম করে অকাতরে জীবন দিয়েছেন। নিশ্চয়ই স্রষ্টা তাদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু সামাজের সর্বত্র অপকর্ম, নোংরামি–এ সবই হয়েছিল এক ঈশ্বরের নির্দেশ না মানার কারণে। দ্বাদশ পোপ যেন জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথাই উচ্চারিত করলেন। মানুষের শাস্তি হয়েছিল প্রকৃত প্রদত্ত। এমনও দেখা গেছে, গভীর রাতে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু ভোর হতে না হতেই তার চিহ্নটুকু পাওয়া যায়নি। কেমন করে কীভাবে ঘটল তা কারো জানা নেই। এ ছিল প্রকৃতির শাস্তি। মন্টেসেগার নগরী ধূসর এক পাহাড়ে পরিণত হলো। ধ্বংসের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ হলো। এমনও স্থান দেখা গেল, মাটির নয়, বরফের পাহাড়। প্রকৃতির বৈপরীত্য চোখে পড়ার মতো। মাটির এবং বরফের এই পাহাড়গুলো এতই খাড়া যে তাতে আরোহণ করা সহজ ছিল না। রাজা বা শাসনকর্তার নির্দেশ না মানলে বিদ্রোহীকে এই পাহাড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হতো। এমনও অবস্থা ছিল, সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাসীদের নির্যাতন করা হতো। হাত-পা বেঁধে তাদের পাহাড়ে ফেলে দিয়ে ঠেলে দেয়া হতো মৃত্যুর দিকে। মন্টেসেগার নগরীর প্রধান গির্জায় ধর্মযাজক বিশপ অ্যালবি এসব নৃশংস কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধ এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাসী আর বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে লড়াই হতো। এভাবে চলত বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ যুদ্ধ হয়। প্রকৃত অর্থে এ ছিল ধর্মযুদ্ধ। পাঁচশ বছর ধরে মন্টেসেগার নগরীতে যুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে ছিল ধর্মের বিচারকগণ। আর তাদের বিরুদ্ধে রাজশাসন। এক পর্যায়ে গির্জার পুরোহিতরা পিছু হটলেন। দুর্গ দখল করা হলো। এ ঘটনা ঘটে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ মার্চ। শত্রুপক্ষের সবাই আত্মসমর্পণ করে। শত্রুপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো রাজশাসনের কথামতো না চললে তাদের পুড়িয়ে মারা হবে। ধর্মযাজকরা শাসনকর্তার নির্দেশ মেনে নিলেন। তারা রাজ্য শাসন এবং আইন প্রক্রিয়া থেকে ধর্মীয় মতবাদ তুলে নিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধান হলো। পরে কোনো পক্ষই কারো প্রতি আক্রমণ করল না।

মন্টিসেগার নগরীর শরণার্থীরা ভয়াবহ দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাসীরা এ সময় বহু নির্যাতনের শিকার হলো। বিভিন্ন স্থানে প্রতিপক্ষের আক্রমণের শিকার হলো জরাথ্রুস্টবাদীরা। বহু স্থানে তাদের প্রধান পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা হয়। তাদের অনেকেই মন্টেসেগার পর্বতে আশ্রয় নেন। এত কিছুর পরও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা হারায়নি। জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসী ধর্মীয় নেতাদের মৃত্যুতে মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানায়। এক ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। ধর্মে যে শান্তির কথা বলা হচ্ছিল তা যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। ধর্মীয় উগ্রতা যেন পরতে পরতে। সেইসঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে শোষণ এবং নির্যাতন করত। নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছাল। নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ও সাহস ছিল না মানুষের। কিন্তু প্রকৃতি একদিন ঠিকই প্রতিশোধ নেয়। মন্টেসেগার নগরীর পাহাড়-পর্বত এবং প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করতে থাকে। সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের জন্য তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায়–শিশু, বৃদ্ধ, বনিতা, সুস্থ-অসুস্থ নারী-পুরুষ এমনকি সৈনিকরা পর্যন্ত এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বাঁচতে চাইল। তাদের এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন ধর্মযাজক অ্যালবি। তার নির্দেশেই মন্টেসেগার পর্বতমালা নগরীর সুরক্ষিত দেয়াল ভেঙে দেয়া হলো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, দিনে যে দেয়াল ভেঙে ফেলা হলো সেই দেয়াল অলৌকিকভাবে রাতেই আবার পুনঃ স্থাপিত হলো। অনেকেই বলতে থাকে, এই পর্বত দেবতার সৃষ্টি। এর পেছনে

নিশ্চয়ই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। সাদা রঙের পাহাড় চোখের নিমেষে ধূসর হয়ে গেল। পাঁচশর বেশি রাজ বিচারক এবং সশস্ত্রে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সব কিছু অবলোকন করলেন। মন্টেসেগার পর্বতমালার ওপর নির্মিত দুর্গ দশ মাস টিকে ছিল। এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষ দুর্গটি ধ্বংস করে দেয়। প্রকৃত অর্থে এরা ছিল জরাক্রস্টবাদে বিশ্বাসী ধর্মপ্রচারক। তারা পারস্য এবং মধ্য এশিয়ায় এক সৃষ্টিকর্তার তত্ত্ব প্রচার করতেন।

দুর্গ ধ্বংস হওয়ার পর মন্টেসেগার নগরীর রাজ্য শাসক এবং সেনাপতিগণ ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি করেন। তারা তাদের পূর্ববর্তী সব অপরাধের জন্য ক্ষমা চান। ধর্মীয় প্রচারকরা ক্ষমা করে দেন। যোদ্ধারা তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন। যাদের ক্ষমা করে দেয়া হয় তারা মুক্ত হয়ে অন্য স্থানে চলে যান। এত কিছুর পরও চারটি চুক্তির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল খুবই ভয়াবহ। চুক্তির প্রথম পনেরো দিনে শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। কোনো পক্ষই কারো প্রতি হামলা করেনি। কোনো অবস্থানগত পরিবর্তন হয়নি। অবকাশের সময় সবাই আনন্দ উৎসব করতে থাকে।

মন্টেসেগার নগরীর শরণার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের চেষ্টা করছিল। নিজেদের সব কিছুতেই সহনীয় পর্যায়ে রাখত। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাদের অসামান্য ক্ষমতা এবং নিজস্ব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাদের এক মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

বহু মত এবং পূজা অর্চনায় বিশ্বাসীরা এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে কেন মধ্যযুগে মানুষ পূজা অর্চনা এবং মতাদর্শে বিশ্বাসী হলো, তা পরিষ্কার নয়। কেউই এর ভালো দিক তুলে ধরতে পারেনি। সৃষ্টির মূল রহস্য থেকে সরে গিয়ে বহু ধারণায় নিজেকে সঁপে দিয়ে বস্তুত নিজের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি হলো। এ সময়ের শাসকগোষ্ঠী তাদের জোরপূর্বক ক্ষমতা প্রদর্শন করে মানুষকে পূজা অর্চনা করতে বাধ্য করে। বহু সমাজে দেখা যায় সূর্য, চন্দ্র এবং নদ-নদীকে উপাসনা করতে। এমনকি ইউরোপের বহু দেশে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ উপেক্ষা করে বরং তার সঙ্গে অংশীদারত্ব শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যার সমাধানের পথ কী ছিল? শয়তানের ক্ষমতা ধ্বংস করা এবং এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাস—এটাই ছিল একমাত্র মুক্তির পথ।

মানুষ বহু শক্তিকে আরাধনা করতে শুরু করেছিল কেন? এর কারণ তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, একেকটি জিনিস বা বস্তুর একেক রকম ক্ষমতা। অব্যাহত ভয় এবং পরিবেশগত সন্ত্রাস, তা থেকে অপমৃত্যু–এসব থেকে বাঁচার জন্যই মানুষ পূজা অর্চনা শুরু করে। মানুষের জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর সঙ্গে রয়েছে দারিদ্র্য, হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষমতার লোভ–এ সবই মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

এমনও দেখা গেছে, প্লেগ রোগ থেকে এবং শারীরিক দুর্বলতা থেকে বাঁচতে মানুষ পূজা অর্চনা করছে। সৃষ্টিকর্তাকে যেন সে ভুলে গেছে। অসুস্থ শিশু জন্মালে সে জন্য ভীতিকর অবস্থায় পড়তে হতো। এ যেন পাপের শাস্তি। প্রচণ্ড খরা হলে পুরো সমাজ এবং দেশবাসী পূজা অর্চনা করে ক্ষমা চাইত। কিন্তু একবারও সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চাইত না এই পাপের জন্য। তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা তার দয়া প্রদর্শন করেন। জমিতে ফসল উৎপাদন না হলে এবং দুর্ভিক্ষ হলে প্রার্থনা করত, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাই কান্নাকাটি করত। তারা যুদ্ধ নিয়েও ভয়ে থাকত।

খ্রিষ্ট সম্প্রদায় এবং গির্জার পুরোহিতগণ মানুষকে এবং রাজ্য শাসকদের ধর্মের মূল আদর্শ বোঝাতে ব্যর্থ হলেন। বিশেষ করে সম্পদের লোভ মানুষকে পাগল করে তুলল। সম্পদের লোভে শাসকগোষ্ঠী, প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষ যেন যুদ্ধ শুরু করল। এখানে ধর্ম, নিয়ম-নীতি নেই। সম্পদের জন্য সব পাপ যেন বৈধ। যেকোনো ধরনের যুদ্ধ নৈতিক–এই আখ্যা দেয়া হলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, কেউই কোনো ভালো কিছু আশা করতে পারে না। যেখানে চরম নীতিহীনতা, অধর্ম, হিংসা-বিদ্বেষ, অশ্লীলতা, পাপে পরিপূর্ণ সেখান থেকেই মুক্তির পথ রচিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, এক মনে সাধনা করা–তাহলেই মুক্তি সম্ভব। গির্জার প্রধানরা এটাই উপলব্ধি করলেন। তারা এটা বুঝতে পারলেন, শয়তানের যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, সর্বশক্তিমানের প্রতি একনিষ্ঠ থাকলে কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না। বরং মানব এবং সমাজের কল্যাণ বয়ে আসবে। জরাথ্রুস্ট দর্শনে সে কথাই বলা আছে।

প্রাক মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের মধ্যে যে আচরণ পরিলক্ষিত হয় তা কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য না। প্রতিটি স্তরে ছিল অজ্ঞতা, মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, চিন্তাশক্তির অভাব, নিষ্ঠুরতা, ধনী বা শাসকগোষ্ঠীর প্রশ্নাতীত ক্ষমতা। এর বিপরীতে দরিদ্র শ্রেণীকে দাস বা চাকর করে রাখাই ছিল একমাত্র কাজ। ধনিকশ্রেণী তাদের আরাম-আয়েসের জন্য রাজপ্রাসাদে বা দুর্গে বাস করত।

তাদের জানমাল রক্ষার জন্য থাকত নিরাপত্তারক্ষী। কিন্তু সাধারণ মানুষ কঠিন জীবনযাপন করত। তারা যেন শ্রমিক।

ধনী বা রাজা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ভীতি ছিল না। তারা নিজেরাই আইন তৈরি করত। নিজেদের মতো ধর্ম পালন করত এবং সেটা মানতে সবাইকে বাধ্য করত। প্রাক মধ্যযুগে ইউরোপ অন্ধকারে ছিল। অন্যায়-অবিচার ছিল সেখানকার নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা। এত পাপের মধ্যেই আসে পরিবর্তন। মানুষ নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করে। নতুন করে আশার আলো দেখাতে শুরু করেন রেমন্ত ডি আয়ার। তিনি একেশ্বরবাদীতে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষকে সকল জড়তা, বহু পূজা অর্চনা থেকে সরে এসে সৃষ্টিকর্তার কাছে নতিস্বীকার করতে উপদেশ দিলেন। মানুষ যেন নতুন করে মুক্তির পথ পেল। অনেকেই তাকে পাগল বলে সাজা দিতে চাইল। এটা ছিল সমাজের ক্ষমতাধারী ব্যক্তিদের নিজস্ব পরিকল্পনা। কিন্তু তাকে রক্ষা করেছিল সাধারণ মানুষ। প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষ ছিল লক্ষ্যমাত্র। ঈশ্বর তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন বলেই কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

মধ্যযুগে মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি। এর অন্যতম কারণ ধর্মীয়ভাবে মানুষকে শোষণ করাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র কাজ। এ অবস্থা চলতে থাকে হাজার বছর ধরে। রোমান যুগের সময়ও যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্রাটদের নির্দেশেই পালিত হতো। কেন এই পরিবর্তন? ইউরোপবাসী অনুধাবন করল, প্রকৃত সত্য কোথায় নিহিত আছে তা বের করতে হবে। সেই থেকেই পরিবর্তনের হাওয়া লাগল। নতুন যুগের যাত্রা শুরু হলো। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পাঁচশ বছর পরও মধ্যযুগের সংস্কৃতির ছাপ যেন ইউরোপজুড়ে বিস্তৃতি থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পাশ্চাত্যে শুধু ভূরাজনৈতিকগত পরিবর্তনই ঘটল না, এর পাশাপাশি নতুন করে সামাজিক উত্থান ঘটল। রাষ্ট্রীয় নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হলো। অতীতের সব ধরনের সামাজিক নিয়ম-কানুন, অশ্লীলতা এবং পঙ্কিলতা বাতিল করা হলো।

সামাজিক পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রেখেছেন রোমান সম্রাটরা। অতীতের সব কর্মকাণ্ড তারা বাতিল করে দেন। রোমান সম্রাটরা দেশের নাগরিক তথা দাস শ্রমিকদের মুক্তি দিতে শুরু করেন। এ কথা সত্য যে, রোমান যুগে দাসত্ব প্রবলভাবে রোম সাম্রাজ্যে বিস্তৃত ছিল। সম্রাট এবং

তাদের পরিষদবর্গ রোমের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত নিয়ম-কানুন প্রচলন করেন। তারা যেমন একদিকে ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড দখল করেন তেমনি যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। মানুষের মাঝে আদর্শ সৃষ্টি করেন। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক উত্থান ঘটতে থাকে। মানুষ সচেতন হতে থাকে। এই উত্থান পর্ব চলতে থাকে শত শত বছর ধরে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে নিয়ে যায় উন্নতির ধারা। সেইসঙ্গে ইউরোপের মানুষ এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হতে থাকে। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় অন্ধকার যুগে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা প্রবলবেগে ধাবিত হয়। প্রস্তর যুগ শুরু হওয়ার এক হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে কৃষিকাজের সূচনা হয়েছিল। মূলত এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চতুর্থ শতাব্দী থেকে। কেন এবং কী কারণে এই পরিবর্তন হতে থাকে এর কোনো সদুত্তর জানা ছিল না কারো। অনেকের ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। আবার অনেকে বিশ্বাস করে, বিশ্বজগতের কিছু অংশের উন্নতির কারণে এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণে এ ঘটনা ঘটছে। কারণ যা-ই থাক না কেন, এর ফলে নতুন করে মানবতার জন্ম হলো এবং মানুষ তার চিরাচরিত বাসস্থান ছেড়ে নতুন স্থানে গিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে। বসবাস শুরু করল।

প্রাক মধ্যযুগে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় জড়িত ছিল। এ কথা সত্য, রোমান সম্রাটগণ কখনো কখনো মানবতার দর্শন দেখিয়েছিলেন; কিন্তু সেটা যৎসামান্য। মানুষ যখন সচেতন হতে শুরু করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে, তখনই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। এক পর্যায়ে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ব্যক্তি তথা সামাজিক বিপদ দেখা দিলেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে মুক্তি পেতে চায়। ধর্মের স্থান সর্বাগ্রে দেয়া হলো। সাম্রাজ্যের পতন হলো ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি নতুন করে অসভ্য বর্বরতার জন্ম নিল। নগর জীবনে ধ্বংস হলো। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তার নিঃশেষ ঘটতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যের যেখানে পতন হয়েছিল সেখান থেকেই নতুন করে সভ্যতার জন্ম হলো। এ যেন ভঙ্গুর অবস্থা থেকে নতুন করে শুরু হলো পদযাত্রা। এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা সৃষ্টি হলো। যখনই কোনো নতুন শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করেন তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠীর সব কিছু বাতিল করে দেয়। এর ফলে উন্নতির গতিধারা স্থবির হয়ে পড়ে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে এ ঘটনা চলতে থাকে। অব্যাহত থাকে এক হাজার বছর। এর শেষ হয় জার্মানির জেনারেল

কর্তৃক। তিনি পাশ্চাত্যের সর্বশেষ সম্রাটকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে স্থবিরতা দূর করেন। এ সময় তুরস্কের নাগরিকরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হতে থাকে।

মধ্যযুগে এবং অন্ধকার যুগের থেকে মানুষের এই উত্তরণ ঘটে দুটি অংশ থেকে। ভাইকিং জাতি-গোষ্ঠী উত্তর দিক থেকে তাদের যাত্রা শুরু করে। এই অঞ্চল তারা একের পর জয় করে নিজেদের করে নেয়। আরবরা দক্ষিণ দিক থেকে উটে করে দিগ্বিজয় করতে থাকে। কিন্তু শঙ্কা ছিল পূর্ব দিক থেকে। বাস্তবিক অর্থে পূর্বের মানুষ সভ্যতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। এমনকি ইউরোপের পূর্বাংশ পশ্চিমের তুলনায় শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করে। আবার এই সাম্যবাদ সরকার হটিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পারস্যের জরাথ্রুস্টবাদের দর্শন তারা ভুলে গিয়েছিল। তারা যেন পুনরায় জরাথ্রুস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হলো। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপের পূর্বাংশে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক নীতি আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। এর কুফল ভোগ করে পূর্ব ইউরোপের দেশের জনগণ। আবার এ কথাও সত্য, পাশ্চাত্যবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীতে বিশ্বাসী হলো। বিপরীতে পূর্বের দেশগুলো, বিশেষ করে আরবরা ইসলামি চিন্তা-চেতনা ধারণ করন। স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'সভ্যতার সংকট' বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ধর্মীয় উত্থান মূলত ঘটেছে পূর্ব থেকেই। প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে এবং মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, সকল প্রকার সংঘাত দূর করতেই পারস্যের জরাথ্রুস্টবাদীরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যাশ্রয়ে ধর্মাবলম্বীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হতে থাকে।

পারস্য এবং মধ্য এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে সত্য, ন্যায় এবং জরাথ্রুস্টের মিশন। অন্যদিকে কাজরাজ সম্প্রদায় তাদের বিস্তৃতি ঘটায় পূর্ব ইউরোপে, বিশেষ করে বলকান এবং বাইজান্টিয়ামে। ইতিহাসবিদ ইউরি স্টোনোভাসের 'দ্য হাইডেন ট্রাডিশন ইন ইউরোপ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কাজরাজদের ধর্মগুরু নিসেটাস এসেছেন কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে। তিনি টৌলুসের সন্নিকটে সেন্ট ফেলিক্স ডি৪ কারামান সভাসদে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বলকান অঞ্চলে পাঁচটি গির্জা তৈরি করেন। এর এক শতাব্দী পরে আরেক ধর্মযাজক রেনার্স স্যাকোনি এই গির্জাগুলো সংস্কার করেন। তিনিও প্রচলিত

ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তার অন্য আরেকটি পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন মূলত ইতিহাসবিদ। সতেরো বছর ধরে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় বিচারকদের, বিশেষ করে বিশপদের নানা ভুলভ্রান্তি এবং অবিচারের কথা তুলে ধরেন।

এ কথা অনুধাবন করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার যে, কেন বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সংস্কৃতি জগতের মানুষ পারস্যের নবী বলে খ্যাত জরাথ্রুস্টের দর্শন এবং মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল? জরাথ্রুস্টের দর্শনে মূলত কী ছিল? প্রকৃত অর্থে যা জানা যায় তা হচ্ছে, এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস। এতে মানুষের মুক্তির পথ। সত্য ও ন্যায়ের পথে আসতে মানুষকে বহু বাধা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

অবরোধ হত্যা এবং বিশৃঙ্খলা

বিশ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপজুড়ে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে। এক সময়ের প্রবল ক্ষমতাধর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপের মানচিত্রে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে বহু রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মহীন সমাজব্যবস্থায় ফিরে আসে ধর্মীয় নৈতিকতা। সর্বত্র যে রক্তপাতহীন বিপ্লব হয়েছে তা নয়।

ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ বসনিয়া হার্জেগোভিনা। রাজধানী সারায়েভো। মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশটি বিশ বছর ধরে নানা নির্যাতনের শিকার। সংবাদপত্র এবং টিভি মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত তাদের দুর্দশার কথা বর্ণিত হচ্ছে। এখানে যেন নেই কোনো ধর্ম, নেই নৈতিকতা। আছে শুধু অন্যায় আর অবিচার। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে পুরো নগরীর সামনে যতটা দেখা যায় শুধু চোখে পড়বে ধ্বংসস্তূপ। একদিকে সৈনিকদের অবরোধ, প্রতিপক্ষের হত্যা এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। মুসলিম হওয়াটাই যেন সারায়েভোর অধিবাসীদের প্রধান অপরাধ। তাদের অনেক কিছুই হারাতে হয়েছে। এখানে না প্রতিষ্ঠিত হলো পারস্যের নবী জরাথ্রুস্টের দর্শন, না প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বশক্তিমানের শ্রেষ্ঠত্ব। অনেক কিছুই হারাতে থাকে তারা। এটা জানা সত্যি খুবই কষ্টকর ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সারায়েভো যে রকম বিধ্বস্ত হয়েছিল তার থেকেও ভয়াবহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো বিশ শতকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ছিল সে সময় আর্চ ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ডকে হত্যা করা হয়। এর ৭৫ বছর পর যে বিপর্যয় সংঘটিত হলো তা বিশ্বযুদ্ধকেও

হার মানায়। না ছিল নৈতিকতা, না ধর্ম। আধুনিক ইউরোপের একটি দেশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের শত্রুপক্ষ সার্বিয়া। সার্বীয় সৈন্যবাহিনী বোমার পর বোমা বর্ষণ করতে থাকে সারায়েভোতে। টানা ১৩৯৫ দিন বোমা বর্ষণ করতে থাকে। এ যেন আধুনিক যুগে মন্টেসেগার নগরীর মতো বসনিয়া অবরুদ্ধ। বসনিয়াবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও তারা আশায় বুক বাঁধল। পুরো নগরী যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত। কোথাও কোনো শান্তির চিহ্নমাত্র নেই। শুধু কান্না আর কান্না। এই নগরীতে বহুকাল পূর্বে জরাথ্রুস্টের দর্শন ও মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। সেসব আজ স্মৃতি।

এই মুসলিম অধ্যুষিত নগরীর বিপর্যয়, ধ্বংসস্তূপ দেখলে মনে হবে এখানে ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা সবই হারিয়ে গেছে। বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে এক মুসলিম ইমামের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায় কীভাবে শত্রুপক্ষ ধ্বংস করেছে সব কিছু। ইউসুফ ইসলাম এক সময় ছিলেন গায়ক। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করেন। তিনি নিজেও উপলব্ধি করেন সর্বশক্তিমানের মঙ্গল দিকগুলো। জানতে পারেন জরাথ্রুস্ট মতবাদের কথা। যখন সারায়েভো অবরোধ প্রত্যাখ্যান করা হলো তখন থেকে বিদেশি পর্যটকরা আসতে থাকে। অনেক সাহায্য সংস্থা এগিয়ে আসে। এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যান্ড সংগীতের দল এ দেশটি ভ্রমণ করে। এদের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের ইউ-২ ব্যান্ড সংগীত দল সারায়েভোর নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের জন্য কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করে। সেই অর্থে দরিদ্র শিশুদের জন্য খাবার কিনে দেয়া হয়। সারায়েভোতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশ্বাসী, বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ কথা সত্য, ধর্মীয় নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটেছে দেশটিতে। না আছে জরাথ্রুস্ট দর্শন, না আছে ইসলামের প্রচার। বসনিয়ার ইসলামিক সংস্কৃতি জোরালো করতে ইউসুফ প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি পুরো নগরী ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাধারণের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ উপলব্ধি তার হয়েছে যে, সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠতা ছাড়া কোনো পথ নেই। সারায়েভোতে মুসলমানরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এটা ঠিক, ২০ বছর ধরে তারাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার।

ইউসুফ ইসলাম মানুষের মধ্যে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য গান পরিবেশন করবে। ইউসুফ ইসলামিক ছন্দ তুলে ধরলেন। যে গান মানুষকে

আলোর পথ দেখায়, সত্য আকৃষ্ট করে তা-ই গাইলেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হলো। তাদের মধ্যে রহস্যের আবরণ খুলে গেল। অনেকে ভেবেছিল ইউসুফ রক অ্যান্ড রোলের খ্যাত সংগীত গাইবেন। সারায়েভোর মুসলিম সমাজ ইউসুফ ইসলামের গান শুনল। তারা যেন অনেক কিছু থেকে মুক্তি পেল। সার্বদের আক্রমণ এবং নির্যাতনের কথা মনে করে কাঁদল।

সারায়েভো নগরীর স্থাপত্যে বহু সংস্কৃতি এবং সাম্রাজ্যের মিলন ঘটেছে। এই নগরীতে অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে বিশ শতকের টিটোর কর্মকাণ্ড স্থাপত্যের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছে। মিলজাকা নদীর পাশে গড়ে উঠেছে সারায়েভো নগরী। নগরীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে সার্বদের আক্রমণে। আজ আর তাদের কোনো ধর্ম নেই। সারায়েভোবাসী নেই জরথুস্ট দর্শনে, নেই সর্বশক্তিমানের একত্ববাদী বিশ্বাসে। প্রতিনিয়ত তারা কাঁদছে। যত দূর দৃষ্টি যায় সর্বত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আর রয়েছে সার্ব বাহিনী। জরথুস্ট দর্শন বলি আর ইসলামের কথাই বলি, কোনো ধর্ম দর্শনে হত্যাকাণ্ড বা নিরীহ মানুষকে নির্যাতনের কথা বলা নেই। মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে, অন্যের মতকে মূল্য দেবে, পাশাপাশি নিজেরটাও তুলে ধরবে। সারায়েভোতে এত ধ্বংসযজ্ঞ, এ যেন একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়–মানুষ অতি লোভী হয়ে গেছে। ন্যায়-নীতি, ধর্ম, দর্শন সব ভুলে গেছে। কোথাও কোনো ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই। নগরীর ভূমিতে স্থলমাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। সর্বত্র লেখা : 'বিপজ্জনক।' বারুদের গন্ধ ছড়াচ্ছে। এর পাশাপাশি নিজেদের তৈরি করতে পুনরায় অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে।

এমনভাবে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, যেন ভিক্টোরিয়া যুগের 'ডলস হাউস'। একদিকে ধ্বংসযজ্ঞ আরেক দিকে পুনর্নির্মাণ। অবস্থা এমন যে, ঘর ভেঙেছে কিন্তু পাশের ঘর তৈরি হচ্ছে। এটাকে সারায়েভোবাসী কৌতুক করে বলে 'মোমো এবং ভজির'। এ তো শুধু নগরী ধ্বংসের কথা বলা হলো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ যে ধর্মহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা কে উপলব্ধি করে! শত্রুপক্ষ মানসিকভাবে বৈষম্য তৈরি করেছে। এখানে নেই কোনো জরথ্রুস্টবাদের দর্শন, নেই কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা।

প্রতিনিয়ত চলছে বিধ্বংসী অবস্থা। এত কিছুর মধ্যেও নগরীর বিনোদন এবং ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে যে বিনোদন বা খেলাধুলা হচ্ছে তা নয়। জাতিসংঘের শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা গানের স্কুল ভ্রমণে গেলাম। এক গানের শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করলাম

সারায়েভোর এই পরিণতির জন্য কে দায়ী? তিনি শুধু ম্লান হাসি দিয়ে বললেন, 'ভাগ্য। নৈতিকহীনতা। আর সর্বোপরি স্রষ্টার কাছে নতিস্বীকার না করা।' তার কথা শুনে জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথাই মনে পড়ল। এই শিক্ষিকা নিজ গৃহে অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন। এমনকি তার সন্তানরা কে কোথায় আছে বেশ কিছুদিন জানতে পারেননি। প্রতি মুহূর্ত তাকে চিন্তা করতে হয়েছে কখন শত্রুপক্ষের শেল তার বুকে বিঁধে যায়। শিক্ষিকা সর্বশেষ একটি কথাই বললেন, 'সার্বীয়রা সব সময় আমাদের ঘৃণা করেছে। আমরাও তাদের ঘৃণা করি। আমরা সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস করি। তাদের মতো গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করি না। সর্বশক্তিমানের সঙ্গে কোনো অংশীদারত্ব করি না।' এ যেন জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথাই বলছিলেন শিক্ষিকা। সারায়েভোর প্রতি একই ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল গ্রোভাকীয়রা। মূলত সারায়েভোর জনগণের নৈতিকতা, ধর্মের প্রতি আস্থার কারণেই তাদের ওপর নেমে আসে এ নির্মম নির্যাতন।

বসনিয়ায় বহু জাতি-গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মিলন ঘটেছে। স্লাভ, ক্রোয়েটরা অনেক আসার আগেই এখানে সারায়েভোর মুসলিম গোষ্ঠী এসেছে। স্লাভ এবং ক্রোয়েটরা এখানে আসার আগে ইলিয়ারানস, ডালমিটান, হান্স, আভারস এবং অ্যালান জাতি-গোষ্ঠী বসনিয়াতে এসেছে। একের পর এক আসতে শুরু করে স্লাভ, ক্রোয়েট বা সার্বরা এসেছে এদেরও পরে। তুরস্ক জাতি-গোষ্ঠীও এসেছে সারায়েভোতে। এত জাতি-গোষ্ঠীর মিলন সত্ত্বেও বসনিয়া তাদের সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় সবার কাছে তুলে ধরেছে। তারা যে অন্য জাতি-গোষ্ঠীর থেকে আলাদা, এর প্রমাণ দিয়েছে। বসনিয়া কখনো বিদেশি শক্তির কাছে মাথা নত করেনি। তাদের মধ্যে একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা সর্বশক্তিমানের আদর্শে বিশ্বাসী। বসনিয়ার জনগণ বিশ্বাস করত, ঈশ্বর এবং শয়তান একসঙ্গে চলতে পারে না। এর অর্থ একটাই—ভালো এবং মন্দ এক অবস্থানে থাকতে পারে না। একটা পরাস্ত হবে। একটা জিতবে। সত্য এবং ন্যায় পরাস্ত হলে সে জাতি-গোষ্ঠীর ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে। মধ্যযুগে সার্বীয়রা সম্রাট কনস্ট্যান্টিনোপলের পদানত স্বীকার করল, মাথা নত করে কুর্নিশ করল। তারা অর্থডক্স খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করল। ক্রোয়েটরা রোমের কাছে নতিস্বীকার করে হাঁটু গেড়ে সংবর্ধনা দিল। তারা হলো ক্যাথলিক। কিন্তু বসনিয়াবাসী নিজ ধর্ম মতে চলল। তারা এক গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করল। বোজোমিল গির্জায় প্রার্থনা করল। এ গির্জাকে নিয়ে তারা গর্ববোধ করে। বোজোমিল শব্দের অর্থ ঈশ্বরের ভালোবাসা।

এটা খ্রিষ্টানদের গির্জা ছিল? এ প্রশ্নে অনেকেই হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু ওই শিক্ষিকা জানিয়েছিলেন, এই গির্জায় সবাই প্রার্থনা করত। জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথা বলা হতো। জরাথ্রুস্ট মতবাদ প্রচার করা হতো। বোজোমিল শাসনামলে এই গির্জা নির্মিত হয়েছিল। ধূসর পাথর দিয়ে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে এই গির্জা তৈরি হয়েছিল। বসনিয়ার পর্বতমালায় এ রকম হাজারো গির্জা রয়েছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী সারায়েভোর চতুর্পাশে এসব গির্জা ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির এবং ধরনের উপসানালয় রয়েছে। অধিকাংশ গির্জায় কোনো সাজসজ্জা বা শৌখিনতা নেই। এমনও গির্জা আছে, যেখানে শুধু যিশুর কাঠের মূর্তি রয়েছে। এখানে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা এসে প্রার্থনা করে। তরুণ-তরুণীরা নাচ-গান করে।

পাহাড়ের নিচবর্তী এই বিশাল এলাকাজুড়ে সুন্দর বাগান রয়েছে। এর মধ্যে একটি বাগানের নাম হচ্ছে জেমলস্কি জাদুঘর বাগান। দেখতে অনেকটা ইরানের মতোই। ইরানেও এ ধরনের সুদৃশ্য বাগান রয়েছে। এই বাগানে শিকারিরা আসে। তারা পশু শিকার করে। আবার এখানে ফ্যাশন করতে অনেক তরুণী আসে। এখানকার ধূসর পাথরগুলো এমনভাবে রাখা আছে, তা দেখলে মনে হবে এগুলো সূর্য অথবা চাঁদের প্রতিনিধি। খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা এসব পাথর সম্পর্কে কিছুই জানে না, তা সে ক্যাথলিক অথবা অর্থডক্স যে-ই হোক না কেন? এ শুধু বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র।

বসিনয়ায় এ দৃশ্য দেখে একটু অবাক হতে হয়। বোজোমিল জাতি-গোষ্ঠী হিসেবে যারা নিজেদের গর্ব করত, তারা বর্তমান সময়ে গর্বিত হয় মুসলিম বলে। অটোম্যান সময়কাল থেকেই বসয়িনায় ইসলামি শাসন চালু হয়েছে। বিজয়ের বেশে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সমগ্র দেশে। এ নিয়ে অবশ্য অনেক মতামত রয়েছে। অনেকের মতে, অটোম্যান শাসকের জয়ের পরও ক্রোয়েট এবং সার্বীয় জাতি-গোষ্ঠী থেকেও বোজোমিলরা ছিল স্বতন্ত্র। তারাই ইসলামের পথ অনুসরণ করে। বোজোমিলরা সম্পূর্ণ একক সত্তায় বিশ্বাসী। পৃথিবীতে বসনিয়া ছাড়া আর কোথাও বোজোমিল জাতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। মুসলিম সমাজের সঙ্গে বোজোমিলদের মিল ছিল। এটা ছিল আরেকটি মহান সভ্যতার সঙ্গে মিলন মেলা। কিন্তু খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয়।

খ্রিষ্টান সভ্যতা? কথাটা বলেই হেসে উঠলেন শিক্ষিকা। তার মধ্যে অবজ্ঞার ছাপ দেখা গেল। ঘৃণা ফুটে উঠল। ক্রোয়েট এবং সার্বদের নির্যাতনে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ সারায়েভোবাসী। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রতি তাদের

আত্মার চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। জরাগ্রস্ট দর্শনে যেমন এক সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই পারস্য এবং মধ্য এশিয়ায় প্রথম নবী তিনি।

ইতিহাসের অনেক কিছুই স্মরণ করার মতো ঘটনা ঘটেছে সারায়েভোতে। বোজোমিল সাধু-সন্ন্যাসীরা এই সারায়েভোতে তাদের মিলন ঘটিয়েছিল। একই সঙ্গে জরাথ্রস্ট দর্শনে বিশ্বাসীরা ধর্ম প্রচার করেছিল এই সারায়েভোতে। সমগ্র ইউরোপ যখন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী হলো, তাদের এই দর্শনের সঙ্গে ব্যতিক্রম ছিল বসনিয়ার জনগণ। মূলত তাদের ওপর নানারকম অত্যাচার তখন থেকেই শুরু। শত শত বছর ধরে চলল ধর্মীয় নৈতিকহীনতা। হত্যা, যুদ্ধ, অবরোধ, আকস্মিক খুন, বর্বরতা আর এ সব কিছুই হতো শাসকগোষ্ঠীর প্রধানদের নির্দেশে। বসনিয়ার ওপর করা হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। ধর্মের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ইতিহাসের আলোকে দেখলে শত শত বছর ধরে চলে আসা অবরোধ, একে অপরকে হত্যা, বর্বরতা সারায়েভোকে পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে হানিশ এবং ইরানীয় পৌত্তলিক জনগোষ্ঠী, যাদের বালগার বলা হয়, তারা আসপ্রিয়া রাজার নেতৃত্বে বায়জেন্টিয়াম সীমান্তের দিকে রওনা হয়। রোমের চতুর্থ সম্রাট কনস্ট্যানটিয়ান তাদের পরাস্ত করেন। চতুর্থ সম্রাট কনস্ট্যানটিয়ান বায়জেন্টিয়ামের অধিকাংশ ভূমি দখল করে নেন। বলকানের উত্তর পর্বতমালা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এভাবেই শুরু হলো বুলগেরীয় প্রথম সাম্রাজ্যের যুগের। এটা ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল তিনশ বছর। ইতিহাসবিদ এবং গবেষকরা বহু গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন, বায়জেন্টিয়াম শাসকগোষ্ঠী ধর্মের নৈতিকতা কখনোই মেনে নেয়নি। এভাবেই চলতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে বিদ্রোহ করেছিলেন খান কুরুম। তার নেতৃত্বে দীর্ঘ এক বছরের প্রস্তুতি নিয়ে বায়জেন্টিয়ামের উত্তরে কনস্ট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাঁচ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত হয় যুদ্ধের জন্য। দুর্গ রক্ষার জন্য অভ্যন্তরে রক্ষী বাহিনী দেয়ালের চারপাশে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় তৈরি থাকে। অসংখ্য গির্জায় পুরোহিত এবং ধর্মযাজকরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। তারা সৈন্যদের জন্য ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করেন। পৌত্তলিক গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে তারা বিন্দুমাত্র

পিছপা ছিল না। খান কুরুমের সৈন্যবাহিনী বায়জেন্টিয়াম নগরী পুরোটাই দখলে নেয়ার চেষ্টা করে। এটা সত্যিই তাদের দুর্ভাগ্য যে, অস্ত্র আধুনিক ছিল না, কামানগুলো রসদ প্রয়োগ করতে পারেনি। গোলাবারুদের সংকট ছিল। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুরক্ষিত টানেলে সৈন্যদের স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা হলো। খান কুরুম রাজা তিনটি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। শেষ সম্রাটকে পরাস্ত করার পর আনন্দে মধ্য পান করেছিলেন খান কুরুম। এ কথা সর্বজন সত্য যে, বায়জেন্টিয়াম শাসকগোষ্ঠী রোমান সাম্রাজ্যের এবং কনস্ট্যান্টিপ্রেপেনের বিরুদ্ধে সফল হলে তিনিই হতেন বলকান অঞ্চলের সেরা শাসক। বিশ্ববাসীর কাছে তার ধর্ম এবং দর্শন মতামত নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এ কথা সত্য, খান কুরুম ও তার শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে দাস হিসেবে নির্যাতন করতেন। রাজনীতিবিদ, বিচারক, ইহুদি, জাতি-গোষ্ঠী সবাইকে, বিশেষ করে তার বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন করতে পিছপা হননি।

রাজা কুরুম খান সদর্পে এগিয়ে এলেন। তার নিরাপত্তা বাহিনী তার চারপাশে অবস্থান নিল। তার পাশেই ছিলেন ধর্মপ্রচারকবৃন্দ। তিনি তাদের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে একটি ভেড়া জবাই করতে বললেন। তার নির্দেশে তৎক্ষণাৎ তা করা হলো। কুরুম খান তার হেলমেট খুললেন। পাশে দাঁড়ানো ধর্মযাজকের হাতের ওপর মাথা স্পর্শ করলেন। কিছু সময়ের জন্য নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এরপর মাথা তুলে শূন্যে এমনভাবে দাঁড়ালেন, তার কাছে মনে হলো তিনি যেন ভাসছেন। নগরীর দুর্গে দাঁড়ানো রক্ষীবাহিনী এবং সাধারণ মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল। তারা দেখল রাজা কুরুম খান দুই হাত প্রসারিত করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। তার বিশাল তলোয়ার সূর্যের আলোয় যেন ঝলসে উঠেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। কোনো নড়াচড়া করছে না। শুধু জবাই করা ভেড়া শেষবারের মতো লাফালাফি করছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। রাজা কুরুম খান মাটিতে পড়ে গেলেন। আদর্শ এক শক্তি তাকে তাড়িত করল। কুরুম অনুভব করলেন স্বর্গীয় এবং ঐশ্বরিক শক্তি পৌত্তলিকদের হাত থেকে নগরীকে রক্ষা করল।

বাস্তবিক অর্থেই কি বালগাররা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর কখনো মেলেনি। এটা মেনে নেয়াও ছিল কষ্টকর। বরং তারাই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে জরাথ্রুস্টের দর্শন, মতবাদ এবং শিক্ষার প্রসার

ঘটিয়েছিল। তারা ছিল ধার্মিক জাতি। এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাস করত। বহু ধর্ম উপাসনালয় গড়ে তুলেছিল। তাদের শাসকগোষ্ঠী একটা কথাই শুধু বলত : ঈশ্বরের পছন্দে স্বর্গীয় শাসন চালু হয়েছে বালগারে।

রাজা খান একবার বলেছিলেন : বালগাররা খ্রিষ্টানদের বহুবার বহুভাবে সমর্থন জুগিয়েছে। তাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরা তা ভুলে গেছেন। ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং তিনি সবই দেখেন। বালগাররা ঈশ্বর বলতে কী বুঝিয়েছে তাও পরিষ্কার নয়। আরবি সাহিত্যিক এবং লেখকরা বালগারদের জাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

লেখক এবং ইতিহাসবিদ ইউরি স্টিয়ানভ বালগারদের মন্দির এবং পারস্যে জরাথ্রুস্ট মন্দিরের সমান্তরাল মিল খুঁজে পান। এমনকি এ কথাও জানা যায়, বালগাররা জরাথ্রুস্ট দর্শন শিক্ষা অনুসরণ করত। নবম শতাব্দীতে বালগারদের রাষ্ট্রীয় ধর্মে জরাথ্রুস্ট মতবাদের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এক সময় রোমান সাম্রাজ্য পরিবর্তিত রূপে খ্রিষ্টধর্মে আবর্তিত হলো, তারা যিশুখ্রিষ্টের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং এক পর্যায়ে রোমান একটি আদর্শ স্থাপন করল। এ কথা সত্য যে, বুলগেরীয় সাম্রাজ্য যদি বায়জেন্টিয়াম শাসকগোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করত তাহলে তারা ইউরোপীয় সভ্যতায় অনন্য অংশীদার হতো। বালগাররা এক পর্যায়ে তাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে এলো এবং রূপান্তরিত ধর্ম অবলম্বন করল। বাস্তবিক অর্থে খ্রিষ্টধর্মের কোন মত অনুসরণ করল বালগাররা? তারা কি রোমান অথবা অর্থডক্স হলো? যদিও ওই সময় গির্জার পুরোহিতদের মধ্যে দুই মতবাদে বিভক্ত হওয়ার প্রচলন হয়নি। আবার এটাও সত্য, পূর্ব ও পশ্চিমের বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সব কিছুই হয়েছিল ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ধর্মীয় চিন্তাবিদ, যাজক-প্রত্যেকের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল, বালগার রাজা কুরুম খান নবধর্মের কোন দিকটি অনুসরণ করবেন এবং কোন নির্দেশ মোতাবেক চলতে বলবেন? এসব ব্যাপারে রাজাকে বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন এবং সমঝোতার পথ দেখিয়েছিলেন খান বরিস। তিনি জার্মান দার্শনিক লুইসের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। লুইস ছিলেন শার্লেমেঞ্জের নাতি। পশ্চিমের বুলগেরীয় শাসকগোষ্ঠী ফ্রাঙ্কিশ শাসকের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে। কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট তৃতীয় মাইকেল ভীত হয়ে গেলেন। পূর্ব রোমের সৈন্যবাহিনী বালগারদের আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এটা ছিল তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ।

শাসক ফ্রাঙ্কিশের সঙ্গে চুক্তি করে রোমান সৈন্যরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলল। সংকট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এই সংকট উত্তরণে কিছু যে করা দরকার তা উভয় পক্ষই বুঝতে পারল। বিপদ বুঝতে পেরে তৃতীয় মাইকেল পূর্বের রোমান সৈন্যবাহিনীর আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের বুলগেরিয়ার উত্তর সীমান্তে যুদ্ধে বড় ধরনের হামলা করে। এই যুদ্ধের মাঝেও বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় এবং সারা দেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির এই ভয়াবহ বিপর্যয় এবং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় বালগারদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। এতে একটা লাভ হলো। রাজা বরিস খানের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হলো। ৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা বরিস খান তৃতীয় মাইকেলের অর্থডক্স ধর্ম মতের পরিবর্তে দেশে ব্যাপ্টিস্টবাদের প্রচলন ঘটান। লুইস ক্যাথলিক মিশনারির পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্ম উপাধি নিয়ে তিনি হন যুবরাজ মাইকেল। সেইসঙ্গে রাজা ফ্রাঙ্কিশের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বুলগেরিয়া তখন থেকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পূর্বের অর্থডক্সের সঙ্গে যুক্ত হলো। অর্থডক্সের সঙ্গে ধর্মীয় মিল হয়েই বুলগেরিয়ায় খুবই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়। কারণ যুবরাজ খান তার নিজের ঐতিহ্য প্রচলন করেন। ফলে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং ক্ষমতাশীলরাই নিজেদের মতো করে ধর্ম প্রচার করে। তারা বলতে থাকে, ঈশ্বরের নিয়ম-কানুন তারাই মানবে এবং তার ভালোবাসা এবং ক্ষমা তারাই পাবে। সাধারণের কোনো মুক্তি নেই। তারা দাস হিসেবেই থাকবে।

কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। এটা সত্যিকার অর্থে অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ল যে, বালগারদের মধ্যে জরাথ্রুস্ট দর্শনে বিশ্বাস কতটা দৃঢ় হয়েছিল। বালগারদের মধ্যে নতুন খ্রিষ্টধর্মের তত্ত্বের মূল পর্যায় এবং জরাথ্রুস্টবাদ-এ দুইয়ের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক পর্যায় চলে এসেছে। কনস্ট্যান্টিনোপল গোষ্ঠী হতাশ হলো এ ঘটনায়। বালগাররা কখনোই তাদের চিন্তা-চেতনা অন্যের কাছে সঁপে দেয়নি, ভুলে যায়নি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম বলকান রাজ্য গঠনের চিন্তা থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়ায়নি। নবম শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে বুলগেরিয়ার শাসক সিমিয়ন সার্বিয়া দখল করেন এবং নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। রোমান এবং বালগারের মধ্যে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ কর্তৃক নতুন এবং সংস্কারপন্থি উপাধি ঘোষিত হয়। ত্রিশ বছর একনাগাড়ে শাসন করেন সিমিয়ন। কনস্ট্যান্টিনোপল সম্রাটদের বিরুদ্ধে জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যান তিনি।

এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, বুলগেরিয়ায় খ্রিষ্ট সম্প্রদায় কখনোই অর্থডক্স ছিল না, বরং তারা দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পবিত্র ব্যাপ্টিস্টবাদ গ্রহণ করে তার প্রসার ঘটাতে থাকে। এক পর্যায়ে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট রোমেনাস লেকাপেনাস তার সেনাবাহিনীকে সিমিয়ন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। তার সেনাবাহিনী একটা বিষয় উপলব্ধি করল, বুলগেরীয় ধর্মতত্ত্বে কিছু একটা রহস্য রয়েছে। এর পরও যুদ্ধের জন্য সর্বোতভাবে তৈরি হয় রোমেনাস লেকাপেনাস বাহিনী।

যুদ্ধে রোমেনাস লেকাপেনাস জয়ী হন। বায়জান্টিয়ান শাসকগোষ্ঠীর মতে, রাজা সিমিয়নের দুটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি হয়। এর কারণ, সহজে যেন তাকে কেউ চিনতে না পারে। বিশেষ করে শত্রুপক্ষ তাকে সহজে চিনতে পারত না কোনটা আসল সিমিয়ন।

রোমানস লেকাপেনাস নির্দেশ দিলেন দুটি আবক্ষ মূর্তির মাথা কেটে ফেলতে। তাতেই কাজ হলো। সিমিয়নের মস্তক ছিন্ন করা হলো। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো তার। এত কিছুর পরও বলকান অঞ্চলে শান্তি ফিরে এসেছিল তা নয়। বলকান সাম্রাজ্যের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে শত বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছে। কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে শক্তিমত্তায় কে শ্রেষ্ঠ এবং কার দর্শন টিকে থাকবে সাধারণের কাছে তা প্রমাণের জন্য দুই রাজা এবং তার বাহিনীর লড়াই চলে।

পরিশেষে বালগারদের বিরুদ্ধে রোমান সৈন্যবাহিনীর জয় হয়। এগারো শতকে সম্রাট তৃতীয় বাসিল কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট হন। তিনি সকল প্রকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত, প্রতিপক্ষের সঙ্গে শত্রুতার অবসান ঘটান। শুধু তা-ই নয়, নিজের সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

বালথেসিয়া সীমান্তে বর্তমানের মেসিডোনিয়া এলাকা হিসেবে পরিচিত এই সীমান্ত জয় করেন। তিনি অত্যন্ত নাটকীয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে বুলগেরীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণে নেন। তিনি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন। বালগার সৈন্যবাহিনীকে গ্রেপ্তার করেন, সেইসঙ্গে নির্দেশ দেন ১৪ হাজার সৈন্যকে অন্ধ করে দিতে।

আরো একটি নির্দেশ প্রদান করেন, তা হলো এই ১৪ হাজার সৈন্যের প্রতি ১০০ জনের একজনকে অন্ধ করা হবে না।

কারণ ওই একজন যেন বাকি সৈন্যদের দেশে নিয়ে যেতে পারে। তার নির্দেশ পালন করা হলো। অন্ধ সৈন্যদের দেশে পাঠানো হলো।

জার স্যামুয়েল যখন তার সৈন্যদের এই দুর্গতি দেখলেন তাতে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। সব শক্তি হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হলেন। এমনকি শারীরিক শক্তিও হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন।

এর কিছুদিন পর তার মৃত্যু হয়। ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বুলগেরীয় সম্রাটের মৃত্যু হয়। এর ৩৩৮ বছর পর বায়জেন্টিয়ান সম্রাট পুনরায় পুরো বলকান এলাকা এবং বেসিল দখল করে নেন এবং এ স্থানের নাম দেন বালগার। শুরু হয় বুলগেরিয়াতে অর্থডক্স গির্জার প্রচলন। সমগ্র রাজ্যে অর্থডক্স ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে।

বুলগেরিয়াতে চলতে থাকে শত বছর ধরে অর্থডক্স শাসন ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক প্রেসবাইটার কসমস তার 'সারমন এগেইনস্ট দ্য পেরোটিকস' গ্রন্থে লেখেন, বুলগেরীয়রা দুটি ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাদের বোজোমিল বলা হতো, যার অর্থ ঈশ্বরের প্রেমিক।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আরো একটি বিপর্যয় ঘটল বুলগেরিয়াতে। এ সময় প্রথম সম্রাট অ্যালেক্সাস বালগারদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তারা যে ধর্মের অনুসারী ছিল এবং সর্প পূজা করত তিনি সেই সাপের মাথা কেটে ফেললেন। তার কন্যা আনা বাবার এই আকস্মিক কৃতকর্মে হতবাক হয়ে গেলেন। রহস্যময় কোনো বিষয় তিনি বিশ্বাস করতেন না।

সম্রাট অ্যালেক্সাস জানতে পেরেছিলেন প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সন্ন্যাসী ছিলেন বাসিল। তাকে বোজোমিলের বাসিল বলে সম্বোধন করা হতো। এ মানুষটি যখন মাথা নিচু করে বসতেন বা চুপ থাকতেন তখন ধরে নেয়া হতো প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের বিপদ আসছে। সম্রাট অ্যালেক্সাস আমন্ত্রণ জানালেন বাসিলকে কনস্ট্যান্টিনোপলের দায়িত্বভার নিতে। বোজোমিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বিশ্বাস এবং তার নিজের নির্দেশমতো চলার কথা বললেন। সম্রাট এবং তার ভাই সভাকক্ষ থেকে সবাইকে বের করে দিলেন এবং তারপর সন্ন্যাসীর কথা শুনতে লাগলেন। সন্ন্যাসী তার মতো করে ব্যাখ্যা দিলেন। কী তারা বিশ্বাস করেন এবং কী চান সেটা উভয় পক্ষের আলোচনা হলো। তাদের এই কথোপকথন এক পর্যায়ে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হলো।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাসিল চতুর্থ শতাব্দীতে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু নিয়ে রহস্য রয়েছে। আনা লিখেছেন :

> *'তার বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়। রাজা অ্যালেক্সাস তার ঘরে কুপির আগুন জ্বালিয়ে দেন। পুরো ঘরে আগুন ধরে গেলে তাতে তার মৃত্যু হয়।'*

সম্রাটের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়ে বটে; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সমগ্র ইউরোপে যেন আগুনের শিখা জ্বালিয়ে দিলেন। অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল গ্রিস, মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায়। এর সঙ্গে মধ্য যুগের ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসীরা এক প্রকার ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের লাখ লাখ সৈন্য, নিরীহ দেশবাসী অকাতরে জীবন দিল। এত কিছু সত্ত্বেও খ্রিষ্ট রাজা এবং সম্রাটগণ বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার পর্বতমালার মানুষের, বায়জেন্টিয়ান এবং পোপ প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা পৃথিবীটাকে স্বর্গে পরিণত করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করল।

তারা ঘোষণা করল, সমগ্র ইউরোপ প্রচলিত ধর্মবাদ বিরুদ্ধবাদীদের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই শান্তি উৎসর্গিত হবে।

শত শত বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, সংগঠক এবং আইন প্রণেতা তৈরি করল। তারা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী। জ্ঞান দিল সাধারণ মানুষকে।

পনেরো শতকের দ্বিতীয় দশকে পশ্চিম ইউরোপ তথা বলকান অঞ্চলে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এ সময় তুর্কিরা বোজোমিল এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এ কথা পরিষ্কারভাবে কখনো জানা যায়নি যে, তুর্কিরা প্রকৃত অর্থেই অধীকৃত এলাকায় কোন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। অটোম্যান সাম্রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেনি।

অটোম্যান শাসকগোষ্ঠী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তবে তারা সুখী ছিল এই জন্য যে, ক্যাথলিক, অর্থডক্স, ইহুদি জরাথুস্টবাদ, এমনকি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসীদের প্রত্যেকে তাদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেয়নি। ধর্মের ব্যাপারে কখনো কোনো কঠোর নীতি অবলম্বন করেনি।

প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তার ধর্ম পালন করেছে। সম্ভবত সারায়েভোর শিক্ষকবৃন্দ অন্যদের থেকে এ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ভালো দিতে পারতেন। বাস্তবিক অর্থেই স্বাভাবিকভাবে যা ভাবা হয় তার থেকে বেশি দিন ধরে বলকান এলাকায় প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল।

ইতিহাসবিদরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসবিদ ইউরি স্টোয়েলভ লিখেছেন, হার্জেগোভিনায় বোজোমিল সম্প্রদায় ১৮৬৭ সালে ইসলাম প্রচার করতে থাকে।

আর ওই সময় জার্মানিতে নেশজে তার বার্তা, বিশেষ করে জরাথুস্টের ধর্ম দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারের জন্য তৈরি হতে থাকেন। প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সব ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এশিয়ায় ধর্মযুদ্ধ শুরু

মধ্যযুগে বলকান এবং ফ্রান্সে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে জরাথ্রুস্ট দর্শনে রহস্যময়তার সৃষ্টি হয়। এ রহস্যের পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত প্রচলিত ধর্মবিরুদ্ধবাদীরা প্রকৃত অর্থেই কোনো ধর্ম দর্শনে বিশ্বাসী ছিল তা কারো কাছেই পরিষ্কার ছিল না।

কারাসোম নগরীতে হাঁটাচলা করলে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথা বললে এটা পরিষ্কার হয়ে যেত যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রত্যেকে যে যার মতো স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করত। বলকানের পুরনো নগরী কারাসোমে অডি নদীর পূর্ব পাড়ে মন্টেসেগার নগরীতে পৌত্তলিকতাবাদের অবসান ঘটিয়ে জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে।

ইউরোপের সর্বত্র প্রাক মধ্যযুগে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর প্রাক্কালে মন্টেসেগার নগরীতে রাজা ইউজিনের যে স্থাপত্য এবং শিল্প সংস্কৃতির কলাকৌশলের এবং স্থাপত্যের নমুনা পাওয়া যায়, যা আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তিত করে তোলে। বিভিন্ন দুর্গ ভ্রমণ করে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যা দেখলে একটার সঙ্গে অন্যটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পার্সীয়ার সাসনিয়া শাসকগোষ্ঠী পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাস্পিয়ান উপকূলে দেশ রক্ষার জন্য নগরীতে দুর্গ গড়ে তুলল। উত্তর প্রান্তে এই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। পার্সীয়ার অধিবাসীরা এটাকে বন্ধ দরজা নাম দিয়েছিল। একটা পর্যায়ে এসে এই দুর্গেরও পতন ঘটে।

পার্সীয়ার আরব যোদ্ধারা অষ্টম শতাব্দীতে এই নগরীর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আক্রমণ করে এবং নগরী দখল করে নেয়।

সাসনিয়া শাসকগোষ্ঠী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এবং এ সময় থেকেই এ অঞ্চলে ইসলামি পুনর্জাগরণ হতে থাকে। এই নগরী এখনো এমন পর্যায়ে রয়েছে যে, ১৫ শতাব্দী পরেও তা দেখলে অতীতের সেই স্মৃতির কথা মনে পড়ে। আধুনিক দালানকোঠা, মার্কেট সবই হয়েছে–এর পরও অতীত কোনো স্থাপত্য চোখে পড়লে বিস্মিত হতে হয়।

এটা এমনই যে, ফরাসি দেশের মধ্যযুগীয় কোনো নগরী। কারাসকোন এবং ডারব্যান্ট নগরীর ঐতিহ্য মানুষকে প্রলুব্ধ করে। আরো বিস্ময় যে, নগরী রক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনী এবং দুর্গ গড়ে তোলা হয়েছিল। সহজে কোনো শত্রুর পক্ষে কারাসকোন নগরী আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। পার্সিয়ান নগরীর এই একই অবস্থা ছিল।

হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাত হলে নগরী যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠত। বরফাচ্ছাদিত হয়ে যেত নগরীর দুর্গ। সেই দুর্গ দিয়েই হেঁটে চলেছি আমি। দুর্গের পাশে ছিল ক্যাফে হাউস। সেখানে বসে এক কাপ কফি পান করলাম। পকেট থেকে মন্টেসেগার নগরীর ধ্বংসস্তূপের মানচিত্র বের করলাম। আসলে সময় পার করার জন্যই বসে বসে মানচিত্র দেখছিলাম। সঙ্গে ছিল এই নগরীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কিত বই। এ বইয়ের এক স্থানে সুন্দর একটি বর্ণনা রয়েছে। নগরীর নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত পিয়েরে ডি রজার, তাকে পাঠানো হয়েছিল একটি নৈশভোজে। প্রকৃত অর্থে ওই নৈশভোজে তিনি অতিথিদের হত্যা করতে গিয়েছিলেন। তার দায়িত্ব ছিল অতিথিদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়া। পিয়েরে ডি রজারের লিখিত হলফনামায় পাওয়া যায় :

'ওয়েটার, আর্নল্ডের কাপ কোথায়?'

উত্তর দিল এক আগন্তুক : 'সেটা ভেঙে গেছে।'

প্রকৃত অর্থে সেটাই ছিল আর্নল্ডের ভাইয়ের মাথার খুলি।

পিয়েরে ডি রজার আবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন : ভেঙে যাওয়া কাপের টুকরা কেন নিয়ে এলে না? আমি সেই ভাঙা মাথার খুলিসংবলিত কাপ স্বর্ণ দিয়ে জোড়া লাগাতাম এবং সারা জীবন মদপান করতাম।

শত্রুর মাথার খুলি দিয়ে কাপ বানিয়ে তাতে সারা জীবন মদপান করেছেন পিয়েরে ডি রজার। এটা ছিল বালগার শাসক কুরুম খানের প্রতিচ্ছবি মাত্র। কুরুম খান বায়জান্টিয়ান শাসক নিসপোরাসকে হত্যা করে একই কাজ করেছিলেন। এই কাজ কোনো খ্রিষ্ট সম্প্রদায় করেনি। এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে বর্বর পৌত্তলিক গোষ্ঠী মানুষ হত্যা করে তাদের মাথার খুলি দিয়ে কাপ বানিয়ে পানি পান করত। এ শিক্ষায়ই নিয়েছিলেন কুরুম খান এবং পিয়েরে ডি রজার। কিন্তু এ কথা কি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য যে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের প্রচলিত ধর্মবাদীদের বিরুদ্ধবাদী এবং পৌত্তলিক, বর্বর, জরাগ্রস্ট দর্শনবাদী এবং পূর্বের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ কথা ঠিক, জার্মান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন ভিসিগোথস এবং তিনিই কারাসকোন নগরীতে দুর্গ গড়ে তোলেন। এ এক বিশাল কাহিনী।

নবম শতাব্দীতে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর যুবরাজ মিটারনিক বর্ন উল্লেখ করেছিলেন : এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ যাত্রা শুরু হয়েছে। এর প্রধান সড়ক ভিয়েনার পূর্ব দিক থেকে শুরু। ভিয়েনা থেকে দানিয়ুব উপত্যকা, উত্তরের বলকান এবং দক্ষিণের কারপেথিয়ান, পর্বতমালা বুখারেস্ট সব কিছু যেন এক অদৃশ্য মিলন মেলা। ভিয়েনা থেকে কারপেথিয়ান পর্বতমালায় দাঁড়িয়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার এই সংযোগ পথ দেখলে মনে হবে কোনো

সুদর্শনা নারীর রূপ দেখছি, আবার মনে হবে কোনো তরুণের দুরন্তপনা। এমনও মনে হতে পারে, কোনো একটা বিশাল পাত্র। কৃষক যেমন জমি চাষ করে সুন্দরভাবে বিছিয়ে রাখে সেভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিমের মুক্ত বাতাসে স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপ এবং এশিয়ার এই বিশাল জনগোষ্ঠী সুখেই বাস করছে। এই মিলন পথ মিশেছে চীনের সঙ্গে।

ইউরোপ এবং এশিয়াকে সংযোগ করেছে রাশিয়া। নাম হয়েছে ইউরেশিয়া। ইউরেশিয়ার এই দৈর্ঘ পথ ২ হাজার ৫০০ মাইল। হাঙ্গেরির পান্নাজা থেকে দানিয়ুবের লোহার গেট, সেখান থেকে রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া, সেটা অতিক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে এবং দক্ষিণের ইউক্রেন এবং রাশিয়া; সেখান থেকে ইউরাল পর্বতমালা এবং কাস্পিয়ান সাগর হয়ে পুনরায় মধ্য এশিয়ার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এটা আবার আলতাই পর্বতমালা পার হয়ে চীনের তুর্কেস্তানের দিকে ছুটে চলেছে। এশিয়া এবং ইউরোপ এভাবেই মিলিত হচ্ছে। ডাংগেরিয়ান পর্বতমালার বিচ্ছিন্নতার কারণে পূর্বের দিক উচ্চ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে হয়েছে শুষ্ক, ভূমি খুবই শীতল। আর এই ভূমি মাঞ্চুরিয়া পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যস্থলে ভূমধ্যসাগরের উপকূল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি হয়েছে। আর এ দুই উপকূলের মাঝখানে ২০০ থেকে ৬০০ মাইল বিস্তৃত এলাকাজুড়ে জমি চাষ করা হয়েছে। তবে ১৯৫০ সালে নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই বিশাল ভূমি দখল করে নেন। তিনি এই এলাকা দিয়ে তৈরি করেন ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল সড়ক। এই বিশাল ভূমি পাড়ি দিতে ট্রেন ভ্রমণ ছাড়া পথ নেই। আর জানালায় তাকিয়ে থেকে শুধু ঘাস দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। মাঝেমধ্যে ট্রেনের মধ্যে বসে গাছগাছালি, দূরবর্তী নদী দেখছি। এই বিশাল পথমালার মধ্যে কখনো কোনো স্থানে খাড়া আবার কোনো স্থানে খাল রয়েছে। এই বিশাল পথ পুরোটাই রহস্যে ঘেরা। কোনো কোনো সময় ট্রেন আসছে। কখনো কখনো ছোট নগরীর সন্ধান মেলে। এসব স্থানে ট্রেন তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট থামে। যাত্রীরা ওঠানামা করে।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল ভ্রমণে নিজস্ব একান্ত কম্পার্টমেন্টে বসে আছি। মাঝেমধ্যে শুয়ে পড়ছি। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। তিনি রাশিয়ার অধিবাসী। তবে ইংরেজি জানতেন। সেই স্কুলশিক্ষক কমিউনিস্ট পার্টির জ্যাকেট পরে আছেন। চুপচাপ বসে ছিলেন। তেমন কোনো কথা হচ্ছিল না আমাদের মধ্যে। আমরা কোনো রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করছিলাম না। এক পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের জীবনব্যবস্থার মধ্যে কোনটা পছন্দ করেন? তাকে

আরো বললাম, আপনি কি একটি গাড়ির মালিক হতে চান? আমার এ প্রশ্ন শুনে কিছুটা অস্বস্তি ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। তিনিই বরং আমার কাছে জানতে চাইলেন : গাড়ি দিয়ে কী হবে? আমি এই এর পরের নগরীতে নেমে যাব। এখান থেকে ৬০০ মাইল দূরে।

সাম্যবাদীদের জীবনব্যবস্থা ধ্বংসের কারণে এ উপলব্ধি হয়েছে তাদের মনে, চিন্তা-চেতনা পৃথিবীর অন্যদের থেকে পিছিয়ে আছে। বিশ শতকের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যে যেমন হাজার বছর ধরে ইউরেশিয়ার প্রান্তরে মানুষ বনে-জঙ্গলে, ভূমিতে বাস করত। তারা জমি চাষ করত। গরু, ঘোড়া, ষাঁড়, উট, ভেড়া নিয়ে একসঙ্গে পরিবারের সঙ্গে থাকত। তাদের মধ্যে সুখ-শান্তি ছিল। এই সব পরিবারের একমাত্র উপার্জন ছিল কৃষিকাজ। তারা গরুর দুধ, মাংস এবং চামড়া বিক্রি করত। ভেড়ার পশমের উল থেকে শীতকালে গরম পোশাক তৈরি করত। পান্তর জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি এবং অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করত। আরেকটি বিষয় ছিল, পান্তর জাতি-গোষ্ঠী কখনোই একসঙ্গে ভ্রমণে বের হতো না। তবে শীতের আগমনের আগেই পুরো জাতি-গোষ্ঠী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেত। নিজেদের রক্ষার জন্যই এ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতো তারা।

কারাসকোন নগরীর প্রশাসক উইলিয়াম ভ্যান রসিবেক। তিনি তার প্রতিনিধিদলকে তাতারে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল দেখতে পায় তাতার জাতি-গোষ্ঠী দুই ভাগে বিভক্ত। তারা স্কাইথিয়া জাতিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দানিয়ুব উপত্যকা থেকে ঢালু পাহাড়ে অবস্থান করছে। তারা কোনোভাবেই সূর্যের আলোর ছোঁয়া পায় না। বিভক্ত জাতি-গোষ্ঠী দুটির প্রধান শাসক রয়েছেন। প্রত্যেকেই তার দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পুরো সমাজগোষ্ঠীর মানুষ দুই বিভক্ত জাতি-গোষ্ঠীর নির্দেশমতো চলে। শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত তারা কৃষিকাজ, চাষাবাদ, গরু, গৃপালিত পশু পালন করে। তবে শীতকালে তারা দক্ষিণের ওয়ার্নার অঞ্চলে চলে আসে। আর গ্রীষ্মে সুস্থ এবং মলিন থাকার জন্য উত্তরে চলে যায়। তাতার নগরীতে প্রবেশ করলে একটা কথাই মনে হবে, যেন ভিন গ্রহে চলে এলাম।

মঙ্গলরা তেরো শতকের শেষ নাগাদ পাশ্চাত্যের বৃক্ষহীন, প্রস্তরহীন ভূমি এলাকা ছেড়ে পূর্বে দলবেঁধে চলে আসে। শুরু থেকেই এটা ছিল ইরানের অংশবিশেষ এলাকা। যাযাবর গোষ্ঠী ইরানি ভাষায় কথা বলত। ইরানি সংস্কৃতি এবং ইরানিদের ধর্মমত অনুসরণ করত। প্রাচীন যুগে ইরানের স্কাইথিয়াম জাতি-গোষ্ঠী, যারা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব এলাকা থেকে এসেছিল তারা মাঝেমধ্যে

এই বিশাল জনমানবহীন এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াত। তাদের বহুবার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি গ্রিক প্রতিবেশীরা এ অঞ্চলে এসে হামলা করত। বাস্তবিক অর্থে এই তাতার জাতি-গোষ্ঠীর শুরু কোথা থেকে তা আজও জানা যায়নি। গ্রিক প্রতিবেশীরা তাতার জাতি-গোষ্ঠীর বিশাল বনভূমিতে চাষাবাদ করত। তাদের পশু পালন করত। তারা গম চাষ করত। কিন্তু এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, প্রকৃত অর্থেই এই যাযাবর গোষ্ঠী কোথা থেকে আসত। বাস্তবিক অর্থে তা কেউ জানতে পারেনি। গ্রিক এবং স্কাইথিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে মিল যেমন ছিল তেমনি উভয়ের মধ্যে রক্তপাত কম হয়নি। দুটি অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য হতো হরহামেশা। স্কাইথিয়ানরা গম উৎপাদন করত আর এ রপ্তানি করত গ্রিসে। গ্রিকরা সেই গম কিনে নিত এবং বর্বরদের তা খাওয়াত।

গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডাটাস খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে স্কাইথিয়ানস নগরীর কথা বলে গেছেন। বহু বর্ণনা করে গেছেন তিনি। এমনও কথা শোনা যায়, কোনো মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমাগত মানুষেরা তার লাশ পুড়িয়ে ফেলত এবং আগুন ধরিয়ে দিত। হেরোডাটাস আরো লিখেছেন আমাজন সম্পর্কে। এই আমাজন ছিলেন মহিলা যোদ্ধা। তিনি নিজের একটি স্তন কেটে ফেলেছিলেন। গ্রিক ইতিহাসে বর্ণিত আছে, সমাজে নারীদের কোনো মূল্য ছিল না। তাদের পণ্য হিসেবে দেখা হতো। নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীদের সম্পর্কে বলা হতো তারা কখনো পুরুষের সমতুল্য নয়। সমান অধিকার পেতে পারে না। পুরুষ বীরের মতো লড়াই করে, তীর নিক্ষেপ করে, ঘোড়ায় চড়তে পারে, যুদ্ধ করে। অপরদিকে নারীরা ঘরের শোভা মাত্র। তারা শিকার করতে পারে না, যুদ্ধে যায় না। এটা খুবই অপমানজনক মনে হলো আমাজনের কাছে। তিনি তার স্তন কেটে ফেললেন। পুরুষদের মতো যোদ্ধা হলেন।

নারীরা যুদ্ধ করতে পারে না এ কথা সত্য নয়। বর্বর জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ শুরু হলো সে সময় বহু নারী গোপনে যুদ্ধে গেছে। তারা বীরের মতো লড়েছে। তাদের মৃত্যুর পর জানা গেছে যুদ্ধের কাহিনী।

স্কাইথিয়ান সম্পর্কে হেরোডাটাস আরো বর্ণনা করেছেন : এই জাতি-গোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী এতটাই সুশৃঙ্খল ছিল যে, তাদের শত্রুপক্ষ পালাতে পারত না। আর তাদের ধরার মতো বীর কোনো সৈন্য ছিল না; যদি না স্কাইথিয়ানরা স্বেচ্ছায় ধরা দিত। এই জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো নগরী ছিল না। তারা কোনো নির্দিষ্ট দুর্গে থাকত না। অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, তারা তাদের বাড়িঘর নিজেদের সঙ্গে বহন করত। ঘোড়ায় চড়ে তীর ছুড়ত তারা। বাস

করত খড়ের ছোট্ট ঘরে। বর্বর জাতি-গোষ্ঠী অন্যের সম্পদ দখল করত। স্কাইথিয়ানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করলেও তা পারেনি। অন্য যাযাবর জাতি তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করে ক্ষমতা দখল করে।

হেরোডোটাস নিজেও তার সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় স্কাইথিয়ানরা ইরানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ইরানি ভাষায় কথা বলা শুরু। মূলত এই ভূমি দখলের জন্যই তাদের এ প্রচেষ্টা ছিল। একই সঙ্গে যাযাবর গোষ্ঠী স্কাইথিয়ানদের হটিয়ে দেয়। এই যাযাবর উপজাতিদের নাম দেয়া হয় সারমাথিয়ানস।

সারমাথিয়ানস জাতি-গোষ্ঠী পুরুষ এবং মহিলারা একসঙ্গে বসবাস করত। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত ঘোড়ার পিঠে চড়ে। তাদের অস্ত্র ছিল সে সময়ের আধুনিক এবং সেরা। লোহার তৈরি ধারাল তলোয়ারগুলোর শেষ প্রান্ত স্বর্ণের পাত দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। যুদ্ধ করার সময় লোহার তৈরি বর্ম, হেলমেট পরিধান করত। বুক থেকে মাজা পর্যন্ত অস্ত্রের চেইনমেইল থাকত। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করত পাহাড়ি এলাকায়। এর অন্যতম কারণ, যুদ্ধের সময় কারো মৃত্যু হলে তার লাশ পাহাড় থেকে ফেলে দিত। শত্রুপক্ষের লাশের চিহ্ন পর্যন্ত রাখত না তারা। সারমাথিয়ানসরা সুঠামদেহী ঘোড়া পালত। সুঠামদেহী ঘোড়ার প্রজননের ব্যবস্থা করত। এই ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে ব্যাপক ওজনের মালপত্র বহন করত। কিন্তু স্কাইথিয়ানরা ছিল বিপরীত। তারা সৈন্যদের দিয়ে অস্ত্র এবং সরঞ্জাম টানাত। সংস্কৃতিগতভাবে স্কাইথিয়ানরা পারস্য জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিজেদের মতো আপন করে নিয়েছিল। স্কাইথিয়ানরা বৃহৎ নগরীর পূর্বসূরির কথা স্মরণ করত। বৃহৎ নগরীর শাসকগোষ্ঠী কীভাবে তাদের ধর্ম প্রচার করত সে নিয়ম পালন করত। পারস্যের লোকেরা ছিল অগ্নি উপাসক। সে মোতাবেক স্কাইথিয়ানরা অগ্নি উপাসনা করত। এ কথা কেউ বলতে পারেনি, জরাথ্রুস্টবাদ বা দর্শন এবং বিশ্বাস তাদের মধ্যে কীভাবে জাগ্রত হলো। কিন্তু এ কথা সত্য, পারস্যে জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। এই ধর্মীয় শিক্ষা মুখে মুখে আলোচনার মাধ্যমে প্রসারিত হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে ধর্মপ্রচারক মনি এই ধর্ম পারস্যসহ ওই অঞ্চলে প্রসার ঘটান। সারমাথিয়ানস জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যাপক জানার জন্য 'দ্য ব্ল্যাক সি' বইটি সবার জন্য, বিশেষ করে গবেষকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। সেখান থেকেই জানা গেছে ওসিটানিয়া এবং ওরিয়েন্টের মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল। ইতিহাসবিদ নিল অ্যাসারাসন পুরো বিষয়টি তার 'দ্য ব্ল্যাক সি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, মধ্যযুগে এবং সনাতনী সময়ে সারমাথিয়ানরা বিশাল পাথরের বস্তু দিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি

বানাত। নবম শতাব্দীতে এটাকে গথিক বলা হতো। এখানে ঘোড়া পালন করা হতো। ভূমি প্রদান করা হতো পশু পালনকারীদের। তাদের শিভালারস বলা হতো। এ কথা সবার জানা, সারমাথিয়ানদের নিজস্ব কোনো ভূমি ছিল না। এর অন্যতম কারণ, তারা এক স্থানে থাকতে পারত না। দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের নিজেদের গথস বলে সম্বোধন করত। তারা এসেছে উত্তর এলাকা থেকে এবং স্থান করে নেয় ঘাসাচ্ছাদিত সাগরে। তাদের প্রথম ভূমি ছিল বাল্টিক উপকূলে। এভাবে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের এলাকা প্রসারিত করতে থাকে। সারমাথিয়ানরা বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পুরো এলাকা সারমাথিয়ানদের দখলে চলে যায়।

সারমাথিয়ানরা নিজেরাই শত্রু বাড়িয়ে তুলল। গথ জাতি-গোষ্ঠী খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করল, তারা নিজেরাই অন্যের কৃপা এবং করুণা ছাড়া চলতে পারবে। বিশেষ করে সারমাথিয়ানদের কোনো সাহায্য দরকার নেই। বরং তাদের করুণার ফলে সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়েছে গথ জাতির। তারাও সারমাথিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর মতো জীবনযাত্রা–একেবারে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অতিবাহিত করতে শুরু করে। ভারী অস্ত্র বানাতে থাকে শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে, তারাও জ্ঞানবুদ্ধিতে কারো থেকে কোনো অংশে কম নয়। অস্ত্র বানানো এবং তৈরির ক্ষেত্রে গথ জাতি সারমাথিয়ানদের পদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বন করে। এমন একটা সময় আসে, দুটো জাতি-গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ একটি নামেই পরিচিত হতে থাকে। তারা নিজেদের গথ জাতি বলে সম্বোধন করতে থাকে।

একদিকে গথিকদের কৌশল এবং অন্যদিকে মধ্যযুগে সারমাথিয়ানদের ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করা যেন সাদৃশ্য ছিল। এই সাদৃশ্য দেখা যায় জার্মানির ক্ষমতার সঙ্গে ইরানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিল। পাশ্চাত্যের জাতি-গোষ্ঠীর রূপান্তরবাদ ঘটিয়ে গথ জাতির উত্থান ঘটেছিল। সেইসঙ্গে ইরানের সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বাতাবরণ তাদের মধ্যে দৃঢ় ছিল।

দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঝড় তুরস্কের হান্স জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই হান্স জাতি-গোষ্ঠী এসেছিল পূর্ব ইউরোপ থেকে। তারাও ছিল যাযাবর। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ করে হান্স গোষ্ঠী নিজেদের বসতবাড়ি গড়ে তুলত। এ জন্য শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করে ফেলত।

চতুর্থ শতাব্দীতে হান্স জাতি-গোষ্ঠী বিশাল মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে গথ এবং সারমাথিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হান্সরা ছিল খুবই শক্তিশালী।

তারা গথ এবং সারমাথিয়ানদের একেবারে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের রোমান অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। এই প্রথমবারের মতো জার্মান-ইরানীয়রা একযোগে রাইন নদীর পূর্ব পাড়ে রোমান সীমান্তে চলে যায়। এখানে তারা বেশি দিন থাকতে পারেনি। রোমান সাম্রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দিলে সম্রাট বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের ফলে গথ এবং সারমাথিয়ানরা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ধাবিত হয়। এটা ছিল পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের শুরু। সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইরানি এবং জার্মানির সাধারণ মানুষ দলে দলে এই প্রান্ত, বিশেষ করে রোমের পশ্চিম প্রান্তে ধাবিত হলো। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে জার্মান এবং ইরানের মিশ্র সংস্কৃতির ধারা চালু হতে থাকে।

ইতিহাসবিদ অ্যাসারসন তার 'দ্য ব্ল্যাক সি' বইয়ে লেখেন, সারমাথিয়ানদের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে বলা হয় অ্যালান। এরাই হচ্ছে আজকের অস্ট্রিয়া। এই অ্যালানরাই জার্মানির রাইনল্যান্ডে স্থাপনা গড়ে তোলে। সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। তাদের সুসম্পর্কের এতটাই বিস্তৃতি ঘটতে থাকে যে, এটা ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল এবং স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

সারমাথিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর দ্বিতীয় উপজাতি-গোষ্ঠী উত্তর ফ্রান্সের দিকে ধাবিত হয়। তারা কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থেই উত্তর ফ্রান্সে অ্যালান সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। অ্যালান সাম্রাজ্যের শাসকবৃন্দ ফ্রান্সের ৩০টির বেশি নগরীর নাম বদল করে নিজেদের মতো করে রাখে। বিশেষ করে একটি বৃহৎ নগরীর নামকরণ হয় অ্যালানকন। সারমাথিয়ানদের প্রভাব, ক্ষমতা এতটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, অনেকেই ভেবেছিল এর বুঝি কোনো শেষ নেই।

অরলিন্স সীমান্ত পর্যন্ত সারমাথিয়ানের অ্যালানরা দখল করে নেয়। প্রতিরোধ শক্তি কমে আসছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল রোমানদের ক্ষমতার কারণে সারা ইউরোপ তারা দখল করে নেয়।

বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইউরোপের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, বিশাল এলাকা জনবসতিহীন হয়ে পড়ে। প্রতি বর্গমাইলে ২০ জন লোক বাস করত। এ যেন আমাজন বৃষ্টিবিধৌত বনভূমির মতো অবস্থা দাঁড়াল। অধিকাংশ ভূমি ছিল বনাঞ্চলে ভরা। এদিকে জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করায় জাতির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হয়।

সারমাথিয়ানরা ভেন্ডাল জাতির সমন্বয়ে জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে। যাত্রাপথে তারা উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের রাজা ছিলেন

গেইসারিক। তিনি হিসাব করে দেখলেন, পুরো দেশে নারী, পুরুষ, শিশু এবং ক্রীতদাস মিলে মোট জনসংখ্যা ৮০ হাজার।

গথ জাতির মধ্যে দুটি ভাগ ছিল। পশ্চিম সীমান্তে বসবাসকারীদের বলা হতো ভিসিগথ এবং পূর্বের অংশ অসগথ নামে পরিচিত। এদিকে অ্যালানরা ইউরোপের বিশাল এলাকাজুড়ে তাদের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। তারা সামরিক প্রযুক্তির উন্নতি ঘটাতে থাকে। তারা এটা উপলব্ধি করে যে, কৃষিক্ষেত্র এবং পশু পালনের উন্নতির থেকে সামরিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন। বাস্তবিক অর্থে কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিক পাওয়া খুবই সহজ। তারা একসঙ্গে বাস করে। সহজে ভূমি ছেড়ে চলে যায় না। অ্যালানদের নতুন এই রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবিক অর্থে সামন্তবাদীদের জন্ম দিল। কৃষকরা শুধু জমি চাষ করত। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলো ভূস্বামী। সেই সব মুনাফা লুটে নিত। প্রকৃত অর্থে ভূস্বামীর মালিক ছিলেন রাজা বা সম্রাট নিজেই। ভিসিগথরা তাদের সীমানা পরিসর বৃদ্ধি করল। স্পেন পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। অসগথরা উত্তর ইতালি পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাল। অ্যালানরা এদের যেসব দ্বীপপুঞ্জ ছিল সেসব এলাকা শাসন করত।

পশ্চিম ইউরোপে গথ সভ্যতা, সামন্তবাদী রাজনীতি এবং ইরানি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটিয়েছিল। একইভাবে পূর্বে জরাথ্রুস্টবাদ দর্শনের বিস্তৃতি ঘটেছিল। এটা যে শুধু বালগার অঞ্চলে ঘটেছিল তা নয়, হান্স এবং সারমাথিয়ান জাতি-গোষ্ঠী এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর ক্রীতদাসদের মধ্যেও একই চিন্তা -চেতনা কাজ করেছিল।

পশ্চিম সীমান্তের বিশাল অঞ্চলকে সারমাথিয়ানরা যুদ্ধ করে জয় করে নিল এবং তারা এ অঞ্চলের নাম দিল সার্ব এবং ক্রোট।

এদিকে পোল্যান্ডের মহত্ত্ববাদীরা, যারা ছিল সারমাথিয়ানদের উত্তরাধিকারী তারা এই সামন্তবাদের বিরোধিতা করেছিল। তারা কৃষিব্যবস্থায় দাসত্ব মেনে নিতে পারেনি। পোলিশ সামন্তবাদীদের বলা হতো স্লাজাচা। এটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় ১৯২১ সালে এবং রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র রূপ ধারণ করে। তা সত্ত্বেও স্লাজাচারা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং আত্মপরিচয় নিয়ে চলত। নিজেদের ভূস্বামী হিসেবেই সবার কাছে পরিচয় দিত। ইতিহাসবিদ নরম্যান ডেভিস তার 'ইউরোপ : একটি ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৫০ সালের শেষদিকে সমাজবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন, মাজোভিয়ার সরকার তাদের কৃষকদের সব দিক থেকে সহযোগিতা বন্ধ করে দিল। তাদের বাধ্য হয়ে প্রতিবেশী দেশে ঠেলে দিল। কৃষকদের সহজে চেনার জন্য ভিন্ন পোশাক হলো। তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। তারা যেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে

মিশতে না পারে এবং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠে এ জন্য কঠোর আইন প্রয়োগ করা হতো।

এমনকি ১৯৯০ সালে পোল্যান্ডে যখন কমিউনিস্ট শাসনের পতন হলো তখনো এই সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর বর্তমান তরুণ প্রজন্ম তারা কোটেরিং আটকে রাখত। এ দ্বারা তারা বোঝাতে চাইত তাদের জাতিসত্তার পরিচয়। সমাজতন্ত্রবিরোধী নেতা লেসা ওয়ালেসার জনপ্রিয়তা তরুণ পোলিশদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণ একটাই–তিনি সমাজের শ্রেণীগোষ্ঠীর কার কী ভূমিকা এবং দায়িত্ব তা সঠিকভাবে তুলে ধরেন।

ফ্রান্স, স্পেন, পূর্ব ইউরোপ এবং বলকান এলাকায় পথিক জাতি-গোষ্ঠী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তবে তৈরি হয় সামাজিক বৈষম্য। শাসকগোষ্ঠী এবং তার নিয়ম-কানুন সাধারণ মানুষের মধ্যে অনৈক্য গড়ে তোলে। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই সব সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ছিলেন। তারা গান, কবিতা, শিল্পকলা, চারুকাজ করতেন। সমাজকে একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাধারণের অক্লান্ত পরিশ্রমের জুড়ি ছিল না। এমনকি নারীর ভূমিকাও কম ছিল না। দক্ষিণ ফ্রান্সের ইবেরিয়ায় দখলকৃত সর্বত্র এলাকায় নারীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ স্বামীর অধীনে ছিল না। এমনকি মহিলারা তাদের ডাকনাম বিয়ের পরও বজায় রাখত। তারা ছিল একচ্ছত্র অধিকারী।

বহু জাতি-গোষ্ঠী, বিশেষ করে দক্ষিণ স্লাভ, ক্রোয়েট এবং সার্বীয়রা ইরানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। তারা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। পূর্বের কোনো দেশ থেকে যদি সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে, সে ক্ষেত্রেও তা সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

এটা নতুনভাবে প্রমাণ করার কোনো যুক্তি নেই যে, সারমেথিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, ধর্ম, দর্শনতত্ত্ব এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিশ্বাস ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রবলভাবে বিস্তার ঘটিয়েছিল। পূর্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের এত বিরোধ, আদর্শগত অমিল, তা সত্ত্বেও একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল ছিল–স্লাভদের ভাষা, বিশেষ করে ধর্মীয় শব্দতত্ত্বগুলোর যেন অন্যদের সঙ্গে মিল ছিল।

তারা ঈশ্বরকে বলত বগ, আর স্বর্গকে বলা হতো রাজ। এই দুটি শব্দ এসেছে ইরান থেকে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসবিদ হেটমন্ড লেখেন, স্লাভস জাতি-গোষ্ঠী বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের ভালো-মন্দ রয়েছে। বাস্তবিক অর্থে জরাথ্রুস্ট দর্শনের যেন আরেকটি রূপান্তর। দক্ষিণ ফ্রান্সে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। এই অঞ্চলে

অস্ট্রাভিয়ান শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে এবং গথিক সভ্যতার মিলন দেখা যায়। এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, বলকান অঞ্চলে স্লাভিক জাতি-গোষ্ঠী এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকায় গথিকদের মিলন মেলা ঘটেছিল। তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এখানকার নারী, পুরুষ, প্রচারক এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়নি।

কাথারস পর্বতমালা থেকে যত দূর চোখ যায় তাতে দৃষ্টি দিলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, মন্টেসেগার থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভাবলে খুবই অবাক হতে হয় যে, মন্টেসেগার নগরীর আইন-কানুন ছিল খুবই সুষ্ঠু এবং নিয়মশৃঙ্খলা সবাই মেনে চলত। এ স্থানেই গড়ে তোলে দ্য ফ্রাঙ্ক জাতি-গোষ্ঠী। তারা মন্টেসেগার নগরীতে ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে তারা যেন কাথারসদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা দিল। ফলে পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মৃত্যু ঘটল। সৃষ্টি হলো ক্ষমতার রাজনীতি। ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্ত সব সময় ঐতিহ্যবাহী ছিল। সেইসঙ্গে ফ্রান্স ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

তাদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, আটলান্টিক এবং উত্তর সাগরের বিশাল এলাকায় যোগাযোগ এবং সম্পর্ক গড়ে উঠল। এত কিছুর পরও সম্ভবত আরো ১০০ বছর মন্টেসেগার নগরীর বাইরে গ্রামগঞ্জের মানুষ বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা সত্য ধর্ম পালন থেকে দূরে ছিল। তারা সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসীদের আশ্রয় দিত এবং লালন-পালন করত।

নিজেরাও অনুগত ছিল সনাতনী ধর্মের প্রতি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাথার জাতি-গোষ্ঠীর গ্রাম তারামনাস ১৩২১ সালে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

আকটান সংস্কৃতি একেবারে নিরাশ করেনি পৃথিবীর মানুষকে। প্রাচীন এই জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যে সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা বহু গভীরে ঠাঁই করে নেয়। ফ্রান্সের যে মন্টেসেগারে নতুন ফরাসি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তাতে এখানে আকটান সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। এটা ভাবলে অবাক হতে হয়, ফ্রান্সের সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং শিকড় জুড়ে রয়েছে ইরানের যাযাবর গোষ্ঠীর প্রভাব।

মধ্যযুগে ফ্রান্সের চলাফেরা, সামাজিক রীতি-নীতি, কবিতা, সাহিত্য, এমনকি নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই যেন ইরানের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু জরাথ্রুস্ট ধর্ম শিক্ষা ব্যাপারে কী বলা হয়েছে? প্রকৃত অর্থে এই দর্শন বা মতবাদ নিয়ে ফরাসিদের মধ্যে দ্বিধা ছিল।

কাথার জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে রহস্য ছিল। সেখানে জরাথ্রুস্ট দর্শন বিশ্বাস কীভাবে জন্ম নেবে। সংঘর্ষ বাধবেই। এক পর্যায়ে সেটাই ঘটল।

আর এই সুযোগ নিল খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ধর্মযাজকগণ। কাথার এবং বোজোমিল জাতি-গোষ্ঠী প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা মনিবাদে বিশ্বাস করত। আধুনিক যুগের দার্শনিক এবং চিন্তাবিদরা এটা বিশ্বাস করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে মনিবাদে বিশ্বাসীরা মোটের ওপর খ্রিষ্টান ছিল। দুটি ধর্মের বিশ্বাস দুই রকম। যদিও কাথার জাতি-গোষ্ঠী যিশুখ্রিষ্টের প্রার্থনা করত। আর মনিবাদীরা মনিকে অনুসরণ করত। মনিকে বলা হয় আলোর নবী।

৪.
ধর্মের আলো

নাকশ-ই-রুস্তম

ইরানের ইয়াজদের ওয়েসিম নগরী থেকে মরুভূমির বিশাল সড়কপথ বেশি দূরে নয়। ওয়েসিম নগরী দিয়ে সোজা চলে গেলে মরুভূমির পথ যেন মিশে গেছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এখানেই রয়েছে সিরাজের সুন্দর বাগান। এখানে বাস করতেন মধ্যযুগীয় কবি হাফিজ এবং সাদি। এ দুই কবির পঙক্তিমালা, ছন্দ মানবতার ঐক্যের জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক ইরানিরা এটাকে নাকশ-ই-রুস্তম বা রুস্তমের ছবি বলে অভিহিত করে। রুস্তম ছিলেন ইরানের বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তি, যার মধ্যে একমাত্র সর্বশক্তিমান ছাড়া অন্য কোনো ভয়ভীতি ছিল না। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল ভুল নাম। মহামতি আমনেশিয়া ইরান দখল করে নেন। আরব বিশ্বের সৈনিকদের সহায়তায় তিনি ইরান দখল করেন এবং ইরানে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। বাস্তবিক অর্থে এই স্থান ঐতিহ্যগতভাবে মানুষের আড়ালে লুকায়িত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ বছর থেকে প্রাচীন অবস্থায়, ভগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। এখানেই একটি নগরী গড়ে উঠেছিল–ইশতেখার। এখানে ইরানের রাজা আকামেডিয়ানস তার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ইশতেখার নগরীতে অ্যানাথিয়া দেবীর মূর্তি রয়েছে। তিনি পানির দেবতা। অ্যানাথিয়া দেবীর মূর্তিতে পারস্যের চার শাহের প্রতিকৃত রয়েছে। তারা হলেন দারুস, জেরেক্স, আরতারেক্স এবং দ্বিতীয় দারুস। আরো অবাক করা বিষয় হচ্ছে, পানির দেবী অ্যানাথিয়া মূর্তির পাশে এই চার প্রতিকৃত যেন প্রার্থনা করছে।

মূর্তির ঠিক সামনে রহস্যময় ছোট্ট একটি টাওয়ার রয়েছে। কালো পাথর দিয়ে নির্মিত, বর্গাকৃতি মেঝে, চারপাশের জানালা বন্ধ, বিধ্বস্ত দরগা এবং সর্বোপরি ভেতরটা সম্পূর্ণ শূন্য। এই ছোট্ট টাওয়ার নির্মাণে বহু বিতর্ক রয়েছে। কেন এটা তৈরি করা হয়েছিল সেটাই জানা যায়নি। অধিকাংশ জ্ঞানী

এবং চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন, রাজা আকামেডিয়ানসের জরাথ্রুস্টের মন্দির। একমাত্র মন্দির রক্ষায় এ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছিল। আধুনিক ইরানিরা এটাকে জরাথ্রুস্টের কাবা বলে অভিহিত করে। মক্কার কাবার পূর্বে এটাকে কাবার সঙ্গে তুলনা করা হতো। এই নাকশ-ই-রুস্তম মন্দিরে রাজাদের প্রতিকৃত ছিল। এখানে সুন্দরভাবে প্রতিকৃতগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাধারণত এই মন্দিরে কোনো উৎসবের সময় ব্যাপক লোকজন আসে। চলে নাচ-গান। শাহানশাহ তার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তার সব ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, মনপ্রাণ ঢেলে দেন আগুরা মাজদার প্রতি। এই আগুরা মাজদা হচ্ছে জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসীদের একমাত্র অদৃশ্য ঈশ্বর।

তৃতীয় শতাব্দীতে ইরান শাসন করতেন সাসনীয় রাজা। তিনি আকামেডিয়ানসের মন্দির দখল করে নেন। এখানে এসে অনেকেই ইরানের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনী দেখতে পায়। মন্দিরের সামনে খোলা স্থানে ছোট্ট শিশুরা খেলাধুলা করে। সাতশ বছর পরও পাথরের তৈরি বিলবোর্ডগুলো উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে। সাসনীয় শাহেনশাহের বিজয় যেন আজও সমুন্নত। তার বীরত্বের কাহিনী নিয়ে বহু অপপ্রচার রয়েছে।

জেরেক্স এবং মহান দারিউসের মূর্তির মাঝখানে প্রশস্ত পথ। খুবই সতর্কতার সঙ্গে চলতে হয়। পারস্যের ইতিহাসে এ দুটি মূর্তি দিয়ে নিজেদের শীর্ষ স্থান এবং ক্ষমতা বোঝাত। এ দুজন ছিলেন রোমান সম্রাট। দ্বিতীয় সাসনীয় শাহ, রাজা শাপুর এদের পরাস্ত করেন। শাপুরের মৃত্যু হয় ২৭২ খ্রিষ্টাব্দে। পারস্য সম্রাট শাপুর তার রাজকীয় ঘোড়ায় এমনভাবে বসে আছেন, যেন তিনি আজও তার সাম্রাজ্য শাসন করছেন। গ্রিকরা তাকে বলত কারমবস। যার অর্থ প্রভাববাদী। তার চালচলনে পুরো পারস্যে প্রভাব বজায় ছিল। রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন তিনি। আর মাথায় পরতেন হীরার তৈরি মুকুট। সেই মুকুট বেলুন আকৃতির, তার বাম হাতে থাকত স্বর্ণের তৈরি তলোয়ার। সব সময় খাপের মাঝে বুজে রাখতেন। নিরাপত্তারক্ষী থাকত দুজন। এদের মধ্যে একজন রোমান সামরিক বাহিনীর পোশাক পরে থাকত। সাসনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিকৃত সর্বভাবে ফুটে উঠত শাপুরের মাঝে। রোমানদের চরিত্র হননে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। সেইসঙ্গে মহামতি দ্বিতীয় দারুসকে তিনি যেভাবে পরাস্ত করেন এবং তার ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করেন। যেন রক্তের নেশায় মেতে উঠত তার তলোয়ার। রাজ্যের পর রাজ্য তিনি দখল করেছেন। এত কিছুর পরও সম্রাট শাহের মধ্যে শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি চরম আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে পারস্যের ভাষা ও সংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ।

তৃতীয় শতাব্দীতে শাপুরের বিজয়ের কাহিনী তার একেবারে নখদর্পণে ছিল। ২৬০ খ্রিষ্টাব্দে এডেসা যুদ্ধে রোমের ভ্যালেরিয়ান সম্রাটকে পরাস্ত করেন শাপুর। এডেসা হচ্ছে বর্তমানে তুরস্ক এবং সিরীয় সীমান্তবর্তী এলাকা। এই শাপুরের মৃত্যু হয়েছিল ইরানিদের হাতেই। এদিকে রোমান সম্রাট ফিলিপ তার রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন।

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি যে পাঁচ লাখ স্বর্ণমুদ্রা দখল করে নেন তার অর্ধেক দান করেন। এই বিশাল স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ঠিকমতোই করতে পেরেছিল ফিলিপ বাহিনী। এর অন্যতম কারণ কৌশলগত দিক থেকে ইরানিদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ছিল রোমানরা।

তারা ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ হিব্রু আদর্শ মোতাবেক চলত, কারণ ওদের দ্বারা তারা পরিচালিত হতো।

সম্রাট শাপুর তার রাজ্যের নাম রাখলেন বাইশাপুর। তৈরি করেন বিশাল বাঁধ। নাম দেন কাইজার বাঁধ।

শাপুরের এই আকস্মিক বিজয় তাকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। তবে এত কিছুর পরও তিনি যে শত্রু পক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন তা নয়। সম্রাট শাপুর খুব কম সময়ই সাধারণের সামনে আসতেন। তার অর্ধাংশ দেখতে পেত মানুষ। বাকি অর্ধাংশ সব সময় অগোচরে থাকত। সাধারণ মানুষ যা দেখতে পেত তা হচ্ছে একজন জরাথ্রুস্ট ধর্মপ্রচারক। তিনি মলিন বেশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। তার ডান আঙুলের ছাপ দেখতে পেত অনেকে। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রধান প্রচারক। আর এই প্রধান ধর্মপ্রচারক হলেন সাসনীয় তিন শাসগোষ্ঠীর একজন।

সাসনীয় শাহ গোষ্ঠী যার ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির সহায়তায় পারস্য সাম্রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে তিনি পারস্যেতে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলন করেন। শাপুর নিজেই দাবি করেন, পারস্য ধর্মের প্রাচীন মতবাদ তিনি পুনরায় চালু করেছেন।

ছয়শ বছর পর পারস্যের জনগণের মধ্যে ধর্মের প্রচলন ঘটান মেসিডোনিয়ার সম্রাট মহাপতি আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট। একই সঙ্গে পার্থিয়ার বর্বররাও তাদের অনুসরণ করে। কিন্তু সময় এবং রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িত মহামতি আলেক্সান্ডার জরাথ্রুস্ট দর্শন, ধর্ম এবং ঐতিহ্য অনেক কিছুই ধ্বংস করে দেন। তিনি বহু ধর্মপ্রচারককে হত্যা করেন, ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন। এত কিছুর পরও কয়েকজন ধর্মপ্রচারক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যান। তাদের মধ্যে তানসার অন্যতম। এই ধর্মপ্রচারক বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণ

করেন। ফলে জরাথ্রুস্ট ধর্মে পুনরায় বিশ্বাস ফিরে এলো। ইরানের প্রাণকেন্দ্রে জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচার হতে থাকে।

ধর্মপ্রচারক তানসার বহু গবেষণা করে জানতে পারেন, ২৭৬ কিংবা ২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের শেষ নবী মনির মৃত্যুর কাহিনী। মনি নবী ছিলেন কি না এ নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। মনিবাদের থেকেই জানা যায় জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথা। এই জরাথ্রুস্ট ধর্মেই রয়েছে সত্য ও বিশ্বাসের কথা।

শাপুরের রোম বিজয় সম্ভবত কার্টির দেখেননি। তবে এই সময় তার বিজয় কাছ থেকেই দেখেছেন। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে শাপুর মনির দর্শন মেনে চলতেন। যদিও মনিকে বাস্তবিক অর্থে কোনো দিন দেখেননি শাপুর। এমনকি কোনো ছবিও তার কাছে ছিল না। মনির গল্প শুরু হয়েছিল নাকশ-ই-রুস্তম প্যানেলের মাধ্যমে। এই সাম্রাজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শাপুর।

নাকশ-ই-রুস্তম ফ্রেমে শাপুর যেন দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য প্রান্তে আরেকটি ফ্রেমে রয়েছে বহরম। তার নিজের আত্মহত্যার কাহিনীর ছবি বাঁধা আছে। ধর্মপ্রচারক কার্টির সব কিছু বর্ণনা করেন।

ইরানের প্রচণ্ড খরতাপ এবং বালুময় সড়কের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের বরফাচ্ছিদত পর্বতমালার তুলনা করে যেমন কোনো লাভ নেই, তেমনি ইউরোপের কাথার শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য কোনো শাসন ব্যবস্থার তুলনা অর্বাচীন। কাথার শাসন ব্যবস্থায় ঐতিহ্যগতভাবে মনির ধর্ম অনুসারীরা দেশ পরিচালনা করত। মনিবাদে বিশ্বাসীদের আধিক্য ছিল প্রবল। এ ক্ষেত্রে জরাথ্রুস্ট দর্শনের কোনো বার্তা তাদের কাছে পৌঁছালে দুটি আদর্শে বিশ্বাসীরা বিভক্ত হয়ে যেত। অবস্থা ও ক্ষমতার দন্দ্ব চলত। সে ক্ষমতা যেন ভালো এবং মন্দের লড়াই। বাস্তবিক অর্থে দুটি দর্শনের এবং ধর্মমতের মধ্যে এই যে ব্যাপক সংঘাত এবং দ্বন্দ্ব, যার ফলে ইউরোপে এই দুটি ধর্মের আর প্রসার ঘটেনি। এ সম্পর্কে ১৯১৩ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় যে, দক্ষিণ ইউরোপে মনিবাদ যেন ধ্বংস হতে চলেছে। শুধু বুলগেরিয়াতে মনি আদর্শে বিশ্বাসী পোপগণ তাদের সেরা আবাস শীর্ষে রেখেছিলেন।

এ ব্যাপারে বিশ শতকে ঐতিহাসিক স্যার স্টিভেন রাঞ্চিমেন মত প্রকাশ করেন, মনির ধর্ম এবং ইউরোপীয় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদীদের আদর্শগত মিল আছে। শেষদিকে অবশ্য স্থবির হয়ে গেল। মনিবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হলো। এটা বিরুদ্ধবাদীদের জন্য একটা সতর্ক বটে।

অর্থডক্স খ্রিষ্টানরা যখন কোনো দ্বৈত সংকটে পড়ত তখন তারা মনিবাদের দর্শন মেনে নিত। ধর্মপ্রচারকরা খুব ভালো করেই জানতেন, প্রচলিত ধর্মে কী কথা লেখা আছে। ফলে প্রচলিত নিয়ম মানতে তারা বাধ্য ছিলেন না। এ জন্য রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তা অর্থাৎ সম্রাট মনিবাদের বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি দিতে দ্বিধা করত না।

মধ্যযুগে কাথার, আল বিজেনিয়াস এবং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী বিশ্বাস করত, প্রকৃত সত্য খ্রিষ্টধর্মে লুকায়িত আছে। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা মনিবাদ সম্পর্কে কিছু বলেনি বা লেখেনি। এমনকি তারা মনির আদর্শ সম্পর্কে কিছুই শোনেনি। আবার এ কথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্মের যে মত এবং মনির চিন্তা-চেতনা, যা জরাথ্রুস্টের বার্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে সে সম্পর্কে ধর্মপ্রচারকরা কিছু জানতেন না।

খ্রিষ্টধর্মের ধর্মপ্রচারক এবং গির্জার প্রধান বিশপ যারা যিশুর প্রতি ছিলেন একেবারে উৎসর্গ, তারা পর্যন্ত মনিবাদে এবং দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনি দর্শন অবহেলা করতে পারেননি। কিন্তু এ প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে বা কোন পক্রিয়ায় মনির ধর্ম এবং বিশ্বাস ইউরোপে পৌঁছেছিল? কবে থেকে এবং কীভাবেই বা এর রূপান্তর ঘটল? বহু ধর্ম এবং দর্শনতত্ত্ব গির্জার প্রধানগণ সংকলিত করে রাখতেন।

বলকান এবং পাশ্চাত্যের বহু দেশে মনির সময়কালে বা তার পরবর্তী সময়ে তার ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব নিয়ে ধর্মপ্রচার, বিশেষ করে ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্য এমনকি ইউরোপের ধর্মবাদীদের মধ্যে কোনো বিরোধ হয়নি। এ কথা সহজেই বলা যায়, বসনিয়ায় ইরানীয় প্রভাব এবং মধ্যযুগে ফরাসিদের দর্শনগত চিন্তা এবং সামাজিক আচরণ মনিবাদ বা জরাথ্রুস্ট দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল কি না তা অনুমান করা কঠিন।

মনির দর্শন সম্পর্কে লেবাননের ঔপন্যাসিক আমিন মোলুদ অসাধারণ একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'দ্য গার্ডেন অব লাইট' অর্থাৎ বাগানের আলোকরশ্মি। এখানে বাগান বলতে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে। পৃথিবী ছিল অন্ধকারে আবৃত। মনির দর্শন পৃথিবীতে আলোকিত হলো। মনির জীবন এবং দর্শন নিয়ে বহু বক্তব্য দেয়া হয়েছে এ বইয়ে। রয়েছে স্বপ্ন এবং রূপকথা। বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। তার জন্মকালীন সময় নিয়ে রয়েছে রহস্য। বাবেল জ্যোতির্বিদদের মতে, মনি জন্মগ্রহণ করেন ৫২৭ খ্রিষ্টপূর্বে। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মতে, তার জন্ম ২১৬ খ্রিষ্টপূর্বে। সে দিনটি ছিল ১৪ এপ্রিল, রবিবার। এই সময় পার্থীয়দের সাম্রাজ্যের ধ্বংস হতে থাকে।

আমিন মোলুদেফর উপন্যাসে আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে তৃতীয় শতাব্দীতে বিশ্বের উত্থান-পতন অবস্থার কথা। বিশেষ করে ধর্মীয় সংঘাত যেন চূড়ান্ত রূপ নেয়। পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে রোমের সনাতনী যুগের চিন্তা-চেতনা এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের দর্শনের মধ্যে বিস্তর দ্বন্দ্ব ঘটে। এদিকে প্রাচ্যে আলেকজান্ডারের উত্তরসূরি হেলেনীয়বাদ নতুন দর্শন শুরু করলেন। তিনি জরাথ্রুস্টবাদের নব সংস্কার ঘটালেন। এই সংস্কারের ফলে সমগ্র প্রাচ্যে সপ্তম শতাব্দীতে জরাথ্রুস্ট দর্শনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম শাসন এবং এই অঞ্চলে ইসলামের বিজয় হওয়ার আগ পর্যন্ত জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচার হতে থাকে।

আমিন মোলুদের বইটি পড়ে এ কথা জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল ভূমি শত শত বছর কারো অধীনে ছিল না। যখন যে জাতি-গোষ্ঠী পেরেছে জোরদখল করেছে।

ইরানের জার্গোম পর্বতমালা পাড়ি দিচ্ছিলাম। এই পর্বতমালায় উচ্চ চূড়ায় নাকশ-ই-রুস্তমের প্রতিকৃত রয়েছে। এর পাশে প্রচণ্ড গরম এবং ধূসর মেসোপটিয়াম সমতল ভূমি। আমরা ভ্রমণের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি।

এ কথা সবার জানা যে, ইরান তেলসমৃদ্ধ দেশ। হঠাৎ করে দেখা গেল তেলের পাইপ থেকে তীব্রবেগে তেল বের হচ্ছে। সেইসঙ্গে গ্যাসের লাইনে ফাটল ধরেছে। আকাশ লাল আকার ধারণ করল। চোখের নিমেষে সব কিছু ঘটে গেল। গাড়ির চালক হতবিহ্বল হয়ে পড়ল এবং কোন দিকে যাবে তা বুঝতে পারছিল না। এই সামান্য ঘটনা দিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ইরানে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অনেক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আর এর পেছনে প্রাকৃতিক সম্পদ বড় কারণ ছিল।

উপন্যাসিক আমিন মোলুদের 'দা গার্ডেন অব লাইট' উপন্যাস থেকে আরো জানা যায়, প্রাচীন পারস্যের মানুষ চিন্তা-চেতনায় কত উন্নত ছিল, কিন্তু ধর্মীয় সিদ্ধান্তহীনতায় তাদের কীভাবে পতন হলো।

এ যেন নিশ্চিত স্বর্গ থেকে নরকের পথে যাত্রা। ওই সময় ইরানের সংস্কৃতি এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া কোনো শত্রুর পক্ষে সহজ কাজ ছিল না।

প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত সত্য চেতনা–এ দুইয়ের মিলন ঘটেছিল। সমগ্র পারস্যে জ্ঞানের দরজা উন্মুখ হয়ে গিয়েছিল। পারস্যের জনগণের মধ্যে একটা বিশ্বাস কাজ করত। তারা বলত :

> *'আমরা শূন্য কিছু বিশ্বাস করি না। বরং যার মধ্যে অস্তিত্ব আছে তাতেই বিশ্বাসী।'*

মনির দর্শনে বলা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব চেতনা রয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্ম এবং নবীতে বিশ্বাস রয়েছে। প্রাচ্যের প্রত্যেক ধর্মীয় এবং আদর্শ চিন্তার মানুষ, বিশেষ করে ধর্মপ্রচারকরা মনিবাদ এবং জরাথ্রুস্ট দর্শনে এক হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিক্সিয়ার ধর্মযাজক ফিলাথিরাস তার 'হেরেসিস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন : চতুর্থ শতাব্দীতে আটাশজন ইহুদি এবং ১৮০ জন খ্রিষ্টধর্মের পুরোহিত ছিলেন, যারা ওই সময় খ্রিষ্টধর্ম এবং জরাথ্রুস্টবাদ প্রচার করেন। এই ধর্মপ্রচারকগণ আন্টাটিকস, বাসিলেডস, কেইন্টেস, ডোসেটিস, এবিনোটেস, মার্কিনোটিস, নাসানেস, পিরেটস এবং সেথিয়ানস অঞ্চলে থাকতেন। এগুলো সবই উপত্যকা অঞ্চলের কাছাকাছি। তারা সবাই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতেন। মানুষের মধ্যে জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছিলেন তারা। এ কারণেই তাদের নাম আজও স্মরণে রয়েছে মানুষের হৃদয়ে।

যারা এই ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মানুষকে সংগঠিত করেছেন তারা যে সামাজিক অবিচারের শিকার হননি, আঘাতপ্রাপ্ত হননি, এমন নয়। অর্থডক্স বিশ্বাসীরা তাদের ওপর হামলা করেছে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি–অর্থডক্সরাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে।

তৃতীয় শতাব্দী ছিল খুবই কঠিন সময়। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা নিজেদের অবস্থান বুঝতে গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে কিছু আশ্চর্য রকম বিষয় উপলব্ধি করে।

তাদের বাস্তব জগৎ পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মেসোপটেমিয়ারা দেখতে পেল, তাদের ধর্মবিশ্বাসের বাইরেও অন্য আরেকটি ধর্মের বিশ্বাস রয়েছে। সেটা তাদের ভূমি থেকে বহু দূরে–ভারতে। এখানে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শের মানুষ রয়েছে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, দুটি ধর্মের মানুষের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত রয়েছে। তাদের মত এবং পথ আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন পথে তারা পরিচালিত। যুক্তি, তর্ক, প্রমাণের অপেক্ষা না করে শুধু আবেগ দিয়েই তারা ধর্ম পালন করত। এ ক্ষেত্রে হিন্দুদের বেশি প্রভাব ছিল।

প্রকৃতির সত্য ঘটনা বোঝার বা জানার জন্য তারা দেব-দেবীর করুণা প্রত্যাশা করত। এটা যেন তাদের নিয়তি হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে বোঝার অবস্থা তাদের ছিল না।

স্বর্গীয় দেবতা জেনোসিস, যিনি জ্ঞানের দেবতা নামে পরিচিত পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করলেন। তিনি যেন সব বুদ্ধি এবং চিন্তা হারিয়ে ফেললেন। অস্থির হয়ে পড়লেন। এ সময় সব কিছু যেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল ধর্মীয় মুক্তির অবগাহন। আর তখন একটি কথাই সবার মনে হতো যে, আলিমেসের রানি

তার প্রাতঃরাশ সারার আগে ছয়টি অসম্ভব কাজ সমাধা করতেন। এটাও একধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস।

সাধু অগাস্টাস, যিনি তার শৈশবে মনিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। একটা পর্যায়ে উপলব্ধি করলেন, কার্যত এ সবই অযৌক্তিক, বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত নয়। তিনি তার জীবনের শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করে যান, 'বাস্তবিক অর্থে আমাদের জোর করে বিশ্বাস করতে হয়েছিল। এটা ছিল নির্দেশ। সমাজের শীর্ষ কর্ণধারগণ একবারও বুঝতে চাইলেন না ধর্মীয় বিশ্বাস জোরপূর্বক হয় না। গাণিতিক হিসাব দিয়েও ধর্ম পরিচালিত হয় না। বড় হলাম এবং ধীরে ধীরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে মনিবাদ দর্শন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম।'

জেনোসিসের জ্ঞান দর্শন পৃথিবীর মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করল। নিজেদের স্বার্থে জ্ঞান ব্যবহার করল। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো সমাজে। একটি গোষ্ঠী দ্রুত জ্ঞান আহরণ করে প্রসার ঘটিয়ে সমাজ তথা জাতিরাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে বসল। বিপরীতে অন্য একটি গোষ্ঠী যেন বিপদে পড়ল। তাদের অবস্থা দাঁড়াল ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার মতো।

সাধু অগাস্টাস তার নিজের দর্শন থেকে এই উপলব্ধি করলেন–'আমার কাছে সবার ঊর্ধ্বে চিন্তা এলো নাকশ-ই-রুস্তমের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের কথা। মুক্তির পথ যেন এই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে।

জরাথ্রুস্টের প্রধান ধর্মপ্রচারক কার্টির মহান হয়ে উঠেছেন। জরাথ্রুস্টের দর্শন তিনি এমনভাবে প্রচার করেছেন, যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী সব ধর্মমতাবলম্বী স্তম্ভিত হয়ে গেল। জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রকৃত সত্য যেন বুঝতে পারলাম। আমি উপলব্ধি করলাম প্রকৃত সত্য, বুঝতে পারলাম কোনো এক আদর্শ শক্তির যেন মনি দর্শনের সঙ্গে মিল রয়েছে।

তার চিন্তা-চেতনা, মিল এবং বিরোধ, মনি দর্শন নিয়ে চিরস্থায়ী বিরোধ যেন নিঃশেষ হলো। কার্টির সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তার অর্জন রাজার থেকেও সেরা হলো মানুষের কাছে। তিনি পরাস্ত করলেন আইরম্যানকে।

এই আইরম্যান হচ্ছে জরাথ্রুস্টের মতে অপশক্তি বা শয়তান। এই অপশক্তিকে ধ্বংস করে সত্য এবং ন্যায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইহুদি, খ্রিষ্টান, মনিবাদ, ম্যানডিন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগোষ্ঠী নিজেদের সংশোধনের সুযোগ পেল।'

কার্টির তার দর্শনগত চিন্তা-চেতনার প্রভাব অন্য ধর্মের প্রতি ছড়িয়ে দিতে পারলেন। সাসনীয় ইরানি জনগোষ্ঠী, আর্য সম্প্রদায় এবং খ্রিষ্ট সম্প্রদায়, ব্যাবিলনের তালমুদ, ইহুদি ধর্ম সম্প্রদায় কার্টিরের কথা শুনল।

সাসনীয় সময়কালে সব ধর্মের মৌলিক ধারণা এক হওয়ায় একটি মিলন রচনার চেষ্টা করা হলো। তবে এই সময়ও ইহুদি এবং পারস্যের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মগত যৎসামান্য দ্বন্দ্ব ছিল। ইতিহাসে তা-ই জানা যায়। আবার এই ধর্মের লোকেরা আগুনের পূজা করত। আগুনকে সর্বময় ক্ষমতা বলে মনে করল।

জরাথ্রুস্ট ধর্মবাদীরা আগুনকে স্বর্গীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করত। ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মোমবাতি প্রজ্বলন করত। পবিত্র দিন পালনের সময় ইহুদিরা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করত। চানুকা উৎসব ছিল মোমবাতি প্রজ্বালনের ধর্মীয় উৎসব। এই আগুন জ্বালানো উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল একটাই-তালমুদদের সঙ্গে ধর্মীয় বিরোধের সবটুকু মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা। মধ্যযুগে এক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, পারস্য শাসনামলে হাব্বারগণ ইহুদিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসত এবং একত্র করত তার পুরো পরিবারের সদস্যদের। তালমুদিক জাতির বিরুদ্ধে ঐক্য হতে আহ্বান করত। এদিকে ব্যাবিলনীয় রাব্বি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকত। আর হাব্বার তার প্রদীপ জ্বালিয়ে বলত :

> *'দয়াশীল ঈশ্বর। করুণা করো, এটাই কি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নয় যে কৃপায় বেঁচে আছি?'*

জরাথ্রুস্ট ধর্মবাদীরা আরো বেশি করে নিজেদের ধর্ম প্রচার এবং প্রসারে উদ্যোগী হলো। তারা তাদের বিশ্বাস শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, সমগ্র পারস্যে এবং মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে দিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিল। এই কাজ করতে গিয়ে কিছু ভুল করল তারা।

জরাথ্রুস্ট ধর্মে কোনো পৌত্তলিকতার স্থান নেই। এক ঈশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই পূজা-পার্বণে মেতে ওঠে তারা। কার্টির থেকে জানা যায়, তিনি তার জাতি-গোষ্ঠীকে ধর্মীয় অপপ্রচার থেকে সরে আসতে বলেন। তাদের সংশোধন হতে বলেন। নিজেদের ধর্মীয় এবং মানসিক উন্নতির কথা বলেন।

মনি তার দর্শন নিয়ে প্রচারণায় অন্ধকার থেকে আলোয় আনার চেষ্টা করছেন। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পেতে সবার ঐকান্তিক চেষ্টা চালাতে হয়। ইরানি জনগোষ্ঠী মনির দর্শন থেকে জরাথ্রুস্ট দর্শনকেই বেছে নিয়েছে।

ইরানের পর্বতমালায় ঘুরে বেড়ানোর সবচেয়ে সুন্দর সময় হচ্ছে ভোরের দিকে। এ সময় প্রচুর লোকজন ভোরের কুয়াশাভরা পাহাড়ে হেঁটে বেড়ায়। বাস থেকে নেমে অনেকেই হাঁটা-চলা করে। সকাল ১০টা বাজার আগেই

ইরানের পর্যটকরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে আসে পাহাড়ে। তাদের সঙ্গে শিশুরা থাকে। পরনে থাকে সাদা শার্ট, ধূসর ট্রাউজার। মহিলাদের গায়ে থাকে চাদর। তারা ছবি তোলে। অন্য কোনো দেশে ইরানের মতো এত স্থানীয় পর্যটক নিজেদের দেশে এভাবে পরিভ্রমণ করে কি না সন্দেহ আছে।

ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পূর্বে এবং প্রাচীন প্রাক ইসলামিক যুগে, যে সময়কে বলতে হতো জাহেলিয়া যুগ, সে সময় এ দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সাসনীয় শাসকগোষ্ঠী পর্বতমালায় তাদের শক্তি এবং ক্ষমতার প্রভাব বজায় রাখতে তারা পূজা অর্চনা করতে থাকে। কার্টির এ প্রসঙ্গে বলেন : বাস্তবিক অর্থে সাসনীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের এসব কাজ দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে তা পরিষ্কার নয়। আমি জানি তৃতীয় শতাব্দীতে যেসব মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে তা কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। ধর্ম পালনের জন্য পূজা অর্চনা করতে হয় না, এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হতে হয়।

তৃতীয় শতাব্দীতে রাজনীতি এবং ধর্মবিষয়ক এক আলোচনা হয় যৌথভাবে। এ সময় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, সম্রাট এবং রাজাগণ ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বসলেন। এটা এমন এক সময়, যখন ভারতের পশ্চিমে সব ঘটনা ঘটেছে। এখান থেকেই অর্থডক্সদের ক্ষমতায় শুরু। হাজার বছর ধরে যারা ধর্ম এবং এক ঈশ্বরবাদে অবিশ্বাস করে এবং ক্ষমতাসীনদের দাবি, প্রত্যাশা সব যেন এক কাতারে মিশেছে। তৃতীয় শতাব্দীতে এটা ছিল মহান চিন্তা। ঐতিহ্যবাহী পৌত্তলিকতাবাদ নিয়ে চিন্তা-চেতনার মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সনাতনী যুগের রোমান নাগরিকরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা নিয়ে কমই ভাবত। সম্রাটরাই সেরা। তাদের ক্ষমতা সব। তারা যা বলত সেটাই আইন। কিন্তু এই সময়ে নাগরিকরা কিছুটা হলেও নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ পেল। দীর্ঘদিন ধরে তারা যে নির্যাতনের শিকার হলো তার থেকে কিছুটা হলেও মুক্তির স্বাদ পেল। এক পর্যায়ে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি হলো। ইহুদি জাতি-গোষ্ঠীকে সঠিক পথে আনার জন্য পৃথিবীতে বহু নবী-রাসুলকে প্রেরণ করা হলো। কিন্তু ইহুদিরা ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। তারা ঈশ্বরের কোনো নির্দেশ মানত না। ইহুদিরা শুধু বলত, তাদের রক্ষার জন্য ঈশ্বর এমন এক নবী পাঠাবেন, তিনিই তাদের মুক্তির পথ দেখাবেন। তিনি হচ্ছেন মুসা। বিচার করার মতো শক্তি যেন সবাই হারিয়ে ফেলেছিল। মুসায়ি ধর্মের আদর্শবাদীরা নিজেদের ব্যাপারে সচেতন ছিল না। তারা এটা বুঝতে পারত না যে, সাধারণ মানুষ কী চিন্তা-ভাবনা করছে। এটা তাদের বড় ব্যর্থতা। অন্যদিকে ইহুদি অর্থডক্স অনুসারীরা দাবি করত, নৈতিক আচরণ করো। সঠিক চিন্তা-ভাবনার

থেকে নৈতিক আচরণ বড় বিষয় ছিল তাদের কাছে। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে সব কিছুর যেন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল। পরিবর্তন পূর্ব এবং পশ্চিমে সর্বত্রই দোলা দিল। পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষ হঠাৎ করে ভাবতে শুরু করল, শুধু আচরণগত পরিবর্তন নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন জরুরি। ইরানে সাসনীয় অধ্যুষিত এলাকায় জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রধান প্রচারক এবং পুরোহিত কার্টির এবং পারস্যের খ্রিষ্টধর্মের ম্যাজাইগণ এ পরিবর্তনে উভয়েই লাভবান হয়েছিলেন। মনি এবং তার ধর্ম ও আলোর দর্শন প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মপ্রচারক মনি সে সময় কী ভাবছিলেন? তার কাছে এটাকে জাদুকরী কোনো বিষয় মনে হচ্ছিল? বাস্তবিক অর্থে মনিধর্ম অনুসারীরা কী ভাবছিল সে সময়-এর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। এসব দিক ভেবে মনিবাদী দার্শনিকরা এবং এ ধর্মের অনুসারীরা ইরান থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের উদ্দেশে রওনা হলো। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তারা কোথায় চলে গেল তা কারো জানা ছিল না। কার্যত ১৪০০ বছর পর্যন্ত এ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। ফলে যা ঘটল তা হলো, মনির বার্তা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নয় মানুষ।

একটি বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রাচীন খ্রিষ্টধর্মের গ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টের মারফুক এবং আশুর জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে। কিন্তু ইউরোপের যেকোনো লাইব্রেরিতে এখনো মনির জীবনবৃত্তান্ত এবং মনিবাদ দর্শনের বই পাওয়া যায়। মনির শিক্ষা খুব ভালোমতো গ্রহণ করেছিল তার অনুসারীরা। এমনকি তার শত্রুপক্ষও তার শিক্ষা এবং নৈতিক দর্শন অস্বীকার করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে আরব ঐতিহাসিকগণও মনির ধর্মমত এবং দর্শন ভুল বলেননি। মনির দর্শন এবং ধর্মের আলোর গ্রন্থ বহু ভাষায় যেমন মিসরীয়, আর্মেনীয়, পার্সিয়ান এবং মধ্য পারস্যের সম্রাটগণ নিজেদের মতো করে রচনা করেছেন। তুরস্কের পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে চীনের মধ্য প্রদেশ এবং এসব অঞ্চলের রাজা-বাদশা বা শাসকগণ বইয়ের অনুলিপি করে নিয়েছে। এমনকি মনির নিজ হাতে লেখা কিছু নিয়ম-নীতি-আদর্শের কথা চিহ্নিত করা গেছে তার গ্রন্থে। কিছু দলিলপত্রের মধ্যে মনির লেখা চিঠি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মনির এসব ধর্মগ্রন্থের সব কিছু হারিয়ে যায়। আর কখনোই তা পাওয়া যায়নি। জার্মানির ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ, গবেষকগণ যারা মনির ধর্ম ও দর্শন নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন তারা বহু চেষ্টা করেছেন সেসব সংগ্রহের। বার্লিনের প্রধান শাসকগোষ্ঠী মনির শিল্পকলা এবং সাহিত্যের বিশাল সংগ্রহ করেছে। তাদের বিশ্বাস, মনির জীবন কাহিনী এবং তার শিক্ষা ও দর্শন প্রচার করা সম্ভব।

সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব গোষ্ঠী

'যখন আমার বয়স ২৪ বছর তখন আকস্মিক সব ঘটনা ঘটল। পারস্যের রাজা আরদাশির হার্থা নগরীর দখল নিতে উদ্যোগী হলেন। আর এ সময় শাপুর তার সন্তানকে রাজমুকুট পরিয়ে শাসনক্ষমতা অর্পণ করলেন। তিনি চাইলেন সাসনীয়াতে শক্তিধর শাসকে পরিণত হোক তার সন্তান। এ সময় পেলাম প্রচুর আশীর্বাদ। আমাকে তার কৃপা পেতে যেন আহ্বান করা হলো। আমার সামনে স্বর্গের সব পথ যেন খুলে গেল।' এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন নেশাজে। তিনি আরো বলেন, 'একটি আদর্শ দুটি ভাগে বিভক্ত হলো। আর আমার কাছে মনে হলো জরাথ্রুস্ট যেন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।' বস্তুবিক অর্থে এ কথাগুলো যেন মনি বলেছেন। মনিবাদের ইতিহাসে সেটাই পাওয়া যায়।

এমনও হতে পারে, এগুলো মনির একান্ত কথা। আবার এমনও হতে পারে, মনির আদর্শে বিশ্বাসীরা তার কথা, আদর্শ, মতামত সাধারণের কাছে প্রচার করেছে। এ বিষয়ে প্রকৃত অর্থে কোনো সঠিক ধারণা নেই। আরেকটি গ্রন্থে তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তার জন্ম হয়েছিল এক পা ছোট অবস্থায়। শারীরিক এই বিকলঙ্গতা তাকে মানসিক কষ্ট দিয়েছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই অনুভব করতেন সে কোথায় এসেছেন। আরেকটি বিষয় তার মনে হতো, তিনি যেন ভেতর থেকে কার শব্দ শুনতে পান। বারো বছর বয়সে মনি উপলব্ধি করলেন, তিনি আর দশজনের থেকে আলাদা। এক সময় স্বর্গীয় বার্তাবাহক তার কাছে এলো এবং তাকে বলল, 'তৈরি হও। পৃথিবীর মানুষকে নতুন তথ্য দেয়ার জন্য, নতুন বার্তা প্রদানের জন্য তোমাকেই প্রয়োজন। তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তুমিই পারবে পৃথিবীর মানুষকে নতুন পথ দেখাতে।' সে সময় মনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাস করতেন। তার বাবা তাকে এই সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার এই নতুন দর্শন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাদের চিন্তা-চেতনায় এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই দর্শন জানা এবং মনি ও তার আদর্শবাদী কে বা কারা তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে মনির দর্শন সমাজে, বিশেষ করে ইরানি এবং পারস্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিশ শতকের শেষ পর্যায় এক আরব বই বিক্রেতা আবুল ফরজ মোহাম্মাদ বিন ইসহাক আল বারাক জ্ঞান এবং দর্শনের ক্যাটালগ উপস্থাপন করেন। তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যের এবং ধর্মের ইতিহাসসংবলিত বই তুলে ধরেন। তার এই

অসাধারণ কর্মের মধ্যে ছিল প্রত্যেক লেখকের জীবনী এবং তাদের প্রধান কর্মময় জীবনের কথা। নবম বইটিতে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, মনির জীবন কাহিনী। বইটিতে মনির জীবন, মনিবাদে বিশ্বাসীদের ইতিহাস, দর্শন সব কিছুই লেখা রয়েছে। মনির বাবা তাকে চার বছর বয়সে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুগতাসিলাহ সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যান। সেখানেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। মুগতাসিলাহ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যাপ্টিস্ট বা ধর্মপ্রচারক। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল যে, মনি যেন ধর্মের জ্ঞান লাভ করলেন এবং নবরূপে শুরু করলেন।

জ্ঞানের দর্শন এবং এই সম্প্রদায় নিজেদের দর্শন প্রতিষ্ঠায় নতুন করে জ্ঞানের শুরু করে। নবরূপ লাভ করে তারা। এই সম্প্রদায়কে আর্মেনীয়রা ম্যানডেনস বলত। যার অর্থ নিজেকে জানা ইহুদি এবং খ্রিষ্ট সম্প্রদায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নতুন রূপে ধর্মের জ্ঞানার্জন শুরু করে। এটা ভাবলে অবাক হতে হয়, তাদের ধর্ম প্রসারিত হতে থাকে ইরাকের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতা গ্রহণের আগ পর্যন্ত। সাদ্দাম হোসেন ইরাকের খ্রিষ্টধর্ম এবং অনুসারীদের ধ্বংস করে দেন। এই মনি আদর্শবাদীরা ইরানের দিকে ধাবিত হয়। সেখানেই তারা বাস করে। এখানে জ্ঞান ব্যাপ্টিস্টের আদর্শ প্রসারিত হতে থাকে।

বহুকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করত, ম্যানডেনস জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে মনির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাদের বিশ্বাস বাড়তে থাকে। এদিকে জার্মানির কোলনে ৭০-এর দশকে মনির আদর্শবাদীদের সন্ধান মেলে। তবে তারা ম্যানডেনস জাতি-গোষ্ঠী ছিল না। এ দুই ধর্মের আদর্শের মৌলিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার উভয় ধর্মের মধ্যে রহস্যও কম ছিল না। ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের লুকায়িত শক্তি দেবী এলকাসি তাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তা বলে সবার ধারণা ছিল। শত বছর ধরে চালু ছিল এ ধারণা। দুটি দেবী দ্বারা পরিচালিত ইহুদি এবং খ্রিষ্ট সম্প্রদায়। একটি ছিল ঈশ্বরের পুত্র, অন্যটি নারী–পবিত্র ধর্মীয় শক্তি।

এলকাসি শিক্ষা ইহুদিরা আগুন ব্যবহার করত কোনো ভুলের থেকে শিক্ষা নিতে এবং নিজেকে উৎসর্গ করতে। বিপরীতে জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসীরা বলত আগুন হচ্ছে স্বর্গীয় প্রতীক। বাস্তবিক অর্থে আগুনের ধ্বংসযজ্ঞ ভালো অর্থে ব্যবহার হতো না। জরাথ্রুস্টের মতে, আগুনকে ঈশ্বর ঘৃণা করতেন। বরং তিনি পানিকে সেরা হিসেবে অনুমতি দেন। ফলে এলকাসি দেবীর দিক্ষায় অনুপ্রাণিতরা কোনো মাংস ভক্ষণ করত না। আগুনে পুড়িয়ে কোনো পশুর মাংস ভোগ করা ঘৃণা করত। তারা আমিষ জাতীয় শাকসবজি খেত। সব

ধরনের আনন্দ, গান, চিত্রকর্ম এবং শিল্পকর্ম থেকে দূরে থাকত। ধর্মের একেবারে পরিশুদ্ধতা তৈরির জন্য যেখানে অনিয়ম, অনৈতিকতা তারা ঘৃণা করত। সেগুলো পরিহার করত তারা এবং কঠোরভাবে ইহুদি আইন মেনে চলত। আবার একই সঙ্গে যিশুখ্রিষ্টকে ভালো বাসত। ধর্মপ্রচারক পলের কথা শুনত। তারা এভাবে পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে শুরু করে আল বাসরাহ পর্যন্ত দখলে নেয়। এ কথা সর্বজনবিদিত, যেকোনো ব্যক্তি কল্পনা করতে পারে এবং শঙ্কা করতে পারে মনি কীভাবে তার চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটাল তা নিয়ে। সমালোচনা শুরু হলো তার আদর্শের মানুষের চলা-ফেরায়। শুধু তা-ই নয়, বিশেষভাবে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে অনেকের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু হলো। কোলন কডেক্স গল্পে জানা যায়, এই নিষ্ঠুরতার কথা প্রথম জানা যায় যখন মনি আদর্শবাদীরা মাঠ থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করতে যায়। একদিন এক বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল। মনি আদর্শবাদী এক ধর্মপ্রচারক তার এক ছোট শিশুর ব্যথার উপশমের জন্য গাছের পাতা ছিঁড়লে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তর্ক করে। শিশুটির কেটে যাওয়া স্থানে গাছের রস দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে এ কাজ না করলে শিশুটি রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যেত। এ ঘটনায় অন্যান্য সবজির মালিক প্রতিবাদ করল। মুহূর্তেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত হলো।

মনি এ ঘটনায় খুব দুঃখ পেলেন। আহত হলেন। মানুষের এই নিষ্ঠুরতায় তিনি কাঁদলেন। কিন্তু চুপ করে রইলেন। তিনি যেন একটি নীরব পাখি। তার ভাষা নেই। দুটি পাখি যখন পাশাপাশি বসে থাকে, তারা যেমন একে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে না, তেমনি মনি একই সমাজে বসবাসরত আরেকটি শ্রেণীর কথা বুঝতে পারেন না। তাদের ভাষাও যেন ভিন্ন। কিন্তু যখন এলকাসি দেবীর সহযোগে দুটি জাতি-গোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ যোগাযোগ সম্পন্ন হলো, তখন সত্যের দরজা যেন খুলে গেল। তিনি সব কিছু খুলে বললেন। সত্যের আলোর রহস্য এবং অন্ধকারের রহস্য, ধ্বংসের রহস্য—সব কিছু মনির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথম মানব আদমের সৃষ্টির রহস্যের কথা জানালেন তিনি। জানালেন জ্ঞানবৃক্ষের রহস্যের কথাও। এই বৃক্ষের ফলই আদম ভোগ করেন। এই বৃক্ষের ফল খেতে তাকে বারণ করা হয়েছিল। এভাবেই তার চোখ খুলে যায়। যারা বিশ্বাস করে মনি সত্যিকার অর্থেই স্বর্গীয় দেবতা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে স্বর্গ-নরকের কথা বলতেন, তারা এটাও মানেন, ধর্মের গোপন রহস্যের সব কথা তার জানা ছিল।

মনি কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন না, বরং তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। তার কাজ ছিল একটাই, ধর্মের উপাসনা করা এবং এক ঈশ্বরবাদীর

কথা জানানো। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একেবারে শিশুকাল থেকেই তার মায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে জীবনযাপন করেন। নিজেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করতেন। তার অনুসারীদের সঙ্গেও যে সুসম্পর্ক ছিল তা নয়। শারীরিকভাবেও তিনি ছিলেন বেশ অসুস্থ। খ্রিষ্টধর্মের প্রচারকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তর্কে লিপ্ত হন। জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা করেন তিনি। সমর্থকদের যে কেউ একজন তার খাবার পরিশুদ্ধ করে দিলে তিনি আহার করতেন। এমনকি এ কথাও প্রচলিত ছিল, ধর্মীয়ভাবে তার খাবার পরিশোধন করা হতো। খাবার গ্রহণের পর সমস্ত শরীরে রক্ত যেন সুন্দরমতো প্রবাহিত হতো। বাতাস বয়ে যেত।

মনি একটি বিষয় খুবই ভয় পেতেন। মানুষের শরীরের এবং ধর্মগত যে শয়তানের অস্তিত্ব তা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। একবার তিনি তার অনুসারী একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কেন প্রতিদিন ধর্মগতভাবে শরীর ধোয়া-মোছা করো? এর উত্তর তিনিই দিয়েছিলেন : প্রতিদিন শরীর ধৌত করার উদ্দেশ্য এটাই, নিজেকে পবিত্র রাখা। এর মাধ্যমে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে, শরীর থেকেই সব অপকর্মের সৃষ্টি। ফলে শরীরকে পাক-পবিত্র রাখো এবং যতটা সম্ভব ঢেকে রাখো।

মনির এসব ধর্মীয় এবং দর্শনগত কথা অন্য ধর্মের অনুসারীরা যখন শুনতে পেল তখন তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। একদিন পুকুরে গোসল করতে যাওয়ার সময় তিনি তাদের একজনকে বললেন : সর্বশক্তিমান এই পানির মধ্যেই আপনার বিরোধিতা করবে। পানিও চায় না আপনি এখানে গোসল করুন। এই বলেই তিনি নেমে পড়লেন পানিতে। যখন তিনি মাঠ থেকে কিছু ঘাস তুলে আনলেন, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে অলৌকিক বার্তা এলো। আবার তার আদর্শের কোনো ব্যক্তি রুটি ভাজছিল তার খাবার তৈরির জন্য। সে সময় রুটি যেন নিজেই বলে উঠল, কেন আমাকে রান্না করছ। মনি বললেন : এ ঘটনা যারা দেখেছে তারা যেন অন্যদেরকেও শিক্ষা দেয়। আমি সব কিছু শিখেছি প্রকৃতি থেকে। মনি এক ঈশ্বরবাদের বিশ্বাসী হলেও চিত্রকর্মের কাজ করতেন। তার বাড়িতে এবং গ্রামের বহু স্থানে মাটির তৈরি মূর্তি তৈরি করতেন। এর উদ্দেশ্য একটাই–এসব মাটির মূর্তি পূজার জন্য নয় বরং জনগণ যেন ঘৃণা করে। পৌত্তলিকরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে। তাকে প্রহার করল। তাকে হত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। মনির বাবা তাকে না ঠেকালে তিনি মারাই যেতেন। মনি উপলব্ধি করলেন, এই পাহাড় সন্নিবেশিত বিধর্ম-গোষ্ঠীর সঙ্গে তার থাকা ঠিক নয়। নিজের ভবিষ্যৎ এদের দ্বারা ধ্বংস হতে দিতে

পারেন না। নীরবে-নিভৃতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন : হে মানুষ। আমি গ্রাম ছাড়ছি এবং ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক চলব। তার আদেশ-নির্দেশ আমার সঙ্গে রয়েছে। তিনি তার দৃষ্টি, চিন্তা-চেতনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিলেন। তার কাছে ঐশ্বরিক নির্দেশ এলো : হে মনি, শুধু সন্ন্যাসী জাতি সম্প্রদায়ের নিয়ম-নীতি মানার জন্য তোমাকে পৃথিবীতে পাঠান হয়নি। তোমাকে এই পৃথিবীর মানুষের জন্য, তাদের সেবা করার জন্য, তাদের জ্ঞান উপদেশ এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি নগরী এবং অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা দান করো। এখান থেকে চলে যাও এবং বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করো। আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি এবং তোমাকে সাহায্য করব। তোমাকে প্রতিটি স্থানে রক্ষা করব। যেখানে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সমস্যা হবে, তোমাকে রক্ষা করা হবে। তাই হতাশ হয়ো না।

মনি আর চিন্তা-ভাবনা না করে দেবী এলকাসির গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তরের দিকে ধাবিত হলেন। টাইগ্রিস নদীর উত্তরে সেসিদোন নগরীতে চলে গেলেন। এটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। এখানে তিনি দুজন খ্রিষ্টধর্মপ্রচারকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করলেন। তার সঙ্গে তার বাবাও ছিলেন। মনির বাবা উপলব্ধি করলেন, তার সন্তানের বিপদ আসন্ন। এ সময় তার অনুসারী একজন বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। তিনি তাকে বললেন, এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে।

তারা চারজন বিশাল পথ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ব্যাবিলন, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত এমনকি চায়না পাড়ি দিয়ে আরো পুর্বের দিকে চলে গেলেন তারা। দিনের পর দিন, পথের পর পথ পাড়ি দিলেও তাদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি ছিল না। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন, নিজেকে চিনতে পারলেন। প্রচার করলেন খ্রিষ্টধর্ম। মনি বুঝতে পারলেন, ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের মৌলিকত্ব এবং এ দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধটাও জানালেন। তার বাবা, যিনি বর্তমান ইরানের একবাতান (আজকের হামাদান) নগরী থেকে এসেছেন, তিনি জরাথ্রুস্ট দর্শনে দ্বৈততা ঠিকমতো শিখেছেন। তারা চারজন পূর্ব দিকে ভ্রমণের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং ইহুদি-খ্রিষ্ট এবং জরাথ্রুস্ট দর্শন পরিহার করে নতুন একক ধর্ম মতের দিকে ছুটে চললেন। সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো বৌদ্ধ ধর্মের থেকেও ভিন্ন জগতে যেন তারা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে অন্য ঘটনা ঘটল। আফগানিস্তান সংযুক্ত হলো পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে। মধ্য এশিয়ার কুশান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শত বছরের ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্ত হলো

আফগানিস্তান। সম্ভবত এই নতুন সাম্রাজ্যের সঙ্গে আফগানিস্তানের মিলিত হওয়া অনুপ্রাণিত করল মনি এবং তার সহযাত্রীদের। তারা উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থান নিলেন। এ কথা সত্য, তারা কোথায় ভ্রমণ করেছিলেন এবং কোন পথ ধরে এগিয়েছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু যদি হাল আমলের মানচিত্র দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, তারা খোরাসান সড়ক দিয়ে পথ পাড়ি দিয়েছিলেন এবং ইরান অতিক্রম করেছিলেন। এটা ছিল আফগানিস্তানের প্রধান সড়কপথ।

১৯৬০ সালে যখন আমি (লেখক) এই পথ অতিক্রম করি তখন পথটি ছিল খুবই দুর্গম। শুষ্ক সড়ক এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালা পাড়ি দেয়া সহজসাধ্য ছিল না। এ পথ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলা সম্ভব। পথে লাল সুড়কি বালি, এমনও অনেক স্থানে সাপ দেখা যায়। আর এই পর্বতমালা খুবই উঁচু। মাইলের পর মাইল জুড়ে পর্বত। মাঝেমধ্যে দুই পর্বতের সন্ধিস্থলে কাঠের সেতু নির্মিত রয়েছে। কে কবে কখন তৈরি করেছে তা কেউ জানে না। এই পর্বতমালা এতই সরু, যেন চুলের মতো। আবার এতটাই ধারাল, যেন একটা তলোয়ার। এই পথ দিয়ে জরাথ্রুস্টবাদী এবং মুসলিমরা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। এই পথ যেন মৃত্যুর ঠিকানা। এই পথ যেন স্বর্গের ঠিকানা দিতে পারে–এমনটিই ভাবত জরাথ্রুস্টবাদী, মুসলিমরা, এমনকি মনির অনুসারীরাও। কেউ যদি এই কাঠের সেতু পাড়ি দেয়ার সময় নিচের দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পাবে নিচু উর্বর জমিতে গম, জব এবং ধানের চাষ হয়েছে। এমনকি কিছু জলাভূমি রয়েছে, যেখানে প্রচুর মাছ রয়েছে। অবাক করা বিষয় এই যে, পাহাড়ের ওপরেই কিছু দূরে বেশ কিছু বসতবাড়ি রয়েছে। বসতবাড়িগুলোর উঁচু দেয়াল রয়েছে এবং বেশ কিছু মসজিদ রয়েছে। এটা হচ্ছে বামিয়ান উপত্যকা। বামিয়ান উপত্যকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। এই ধর্মের আদর্শ এবং অনুসারীরা নানা রঙের চিত্রকর্ম এঁকে রাখত গৃহে। এখানে আট হাজারের বেশি বৌদ্ধ ধর্মের মঠ ছিল। বৌদ্ধের মূর্তি যত্রতত্র তৈরি হতো। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল কুশান সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ নগরীর প্রদর্শিত স্থান। একই সঙ্গে শক্তিধর সম্রাট কনিষ্কের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক হচ্ছেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধের প্রতিলিপি তৈরির এক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। বুদ্ধের দুটি অতিকায় বিশাল মূর্তি, যা একশ ফুট উঁচু এবং তৈরি হয়েছিল বিশুদ্ধ পাথর দিয়ে। তবে বামিয়ান মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল পৌত্তলিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদের দ্বারা।

বামিয়ান উপত্যকায় আমার প্রথম ভ্রমণ ছিল স্মরণীয়। উপত্যকার নিচের দিকে হেঁটে চলেছি। মসজিদের কাছে হাজির হলাম। সেখানে ইমামের সঙ্গে

কথা বললাম। ইমাম সাহেব খুব বেশি লম্বা নন এবং বয়স ৫০ হবে। কালো পোশাক পরিহিত। তার হাত দুটো যেন পাখির পালকের মতো নরম। দাড়ি পেকে গেছে। তাকে বৌদ্ধ ধর্মের কথা জিজ্ঞেস করলাম, বামিয়ান মূর্তির কথা জানতে চাইলাম। এই পাথরের মূর্তি কে ভেঙেছে জানতে চাইলাম। ইমাম সাহেব ইতস্তত বোধ করছিলেন। তিনি বললেন, এসব ঘটনা বহু বছর আগের ঘটনা। ভারত থেকে পৌত্তলিকরা এখানে এসেছিল। তিনি অবশ্য জানতেন না কেন তারা এই উপত্যকা বেছে নিয়েছিল।

এটা কি বলা যায়, হাজার হাজার বছর পূর্বে আফগান জনগোষ্ঠী পৌত্তলিক ছিল। এ কথা বলাতেই ইমাম উত্তেজিত হলেন। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বললেন : 'প্রশ্নই ওঠে না।' তিনি বললেন : 'আমরা একটা জিনিস বিশ্বাস করি, ঈশ্বর এবং শয়তান?' ইমাম এ কথা আরবিতে বললেন : 'আল্লাহ এবং শয়তান। এমনকি নবী যখন এই পৃথিবীতে আসেননি এবং তার শিক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পেয়েছি, তখনো আল্লাহকে আমরা বিশ্বাস করতাম।'

তাহলে কি কোনো মুসলিম শাসকগোষ্ঠী বৌদ্ধের মূর্তি ভেঙেছে? এ কথারও প্রতিবাদ করলেন ইমাম সাহেব। কোনো মুসলমান নয়, মঙ্গল অথবা তুরস্কের পৌত্তলিকরা এ কাজ করতে পারে। কথাটি খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, মুসলমান কখনো এসব কাজ করে না।

কিছুটা অবাক হলাম। মুসলমানরা এসব কাজ করে না। কিন্তু তার এ কথা মানতে পারলাম না। আমার সন্দেহ আরো নিশ্চিত হলো সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলিতে। ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ আফগান তালেবানরা বৌদ্ধের রাশিয়ান মূর্তি ভেঙেছে। এটা কি ইমাম অস্বীকার করতে পারেন।

ইমাম সাহেব বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, বহু পৌত্তলিক জাতি-গোষ্ঠী এই উপত্যকা অতিক্রম করেছে। তারা বহু মানুষ হত্যা করেছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের সুন্দর এই পথ। এটা অন্তত সত্য বলেছেন ইমাম। ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন সারা উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে। বামিয়ান মূর্তির ধ্বংসযজ্ঞ এখনো যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বামিয়ান উপত্যকায় ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ১২২০ অথবা ১২২১ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সকালে গ্রামের লোকজন ঘুম থেকে উঠল এবং তারা ভয় পেল। উপত্যকাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। শত্রুরা চারদিক থেকে তীর নিক্ষেপ করছিল। অস্ত্রের ঝনঝনানির শব্দ হচ্ছিল, ঘোড়ার পায়ের শব্দ এবং তা দিয়ে মানুষকে পিষিয়ে মারা হচ্ছিল। চেঙ্গিস খানের বাহিনী পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। তারা

হত্যা, খুন, আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং উপত্যকায় যা কিছু ছিল ধ্বংস করে দিল। পুরো উপত্যকা যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চিরকালের জন্য বরফাচ্ছাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

ইরানের জনগণ বহুবার বিদেশি শক্তির দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, ইসলামি সৈন্যরা, তৈমুর এবং বাবর ইরান আক্রমণ করেছেন। একজনের পর একজন ইরানে এসেছেন। তারা দেখেছেন, জয় করেছেন এবং সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করেছেন। সারা দেশের প্রতিটি স্থানে এক শাসকগোষ্ঠী পূর্ববর্তীদের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে এবং নিজেদের সৃষ্টির উল্লাস রচনা করেছে। প্রতিটি রাজা বা সম্রাটের দুর্গ ধ্বংস করা হয়েছে। নগরীর পর নগরী পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। দুর্গগুলো যেন বালুর মতো পড়ে আছে। এ কথাও সত্য, প্রতিটি ধ্বংসের পর ইরানি সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ যেন ফিনিক্স পাখির মতো। অথবা বলা যায়, পুরনো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক পরিধান করেছে ইরান। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার এ দেশটির উন্নতি যেন স্থবির হয়ে পড়ল। হাজার বছর ধরে সংগ্রাম এবং রক্তপাতের ফলে তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সব প্রচেষ্টা ছেড়ে দিল। এ সময় তারা পেছনে যেন ফিরে গেল। অজ্ঞতা, অলসতা এবং অনুন্নয়নের চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু মনির যুগে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল। সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। কুশান শাসকগোষ্ঠী এবং কনিস্ক, যিনি এই ইরানের পূর্বাঞ্চল মরু এলাকা থেকে ভারতের যমুনা নদীর পাড় পর্যন্ত দখল করে নেন। এর মাঝে আফগানিস্তান বিশ্বধর্মের সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এখানেই বামিয়ান বৌদ্ধের মন্দিরে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা পূজা অর্চনা করত। আবার এই মন্দিরের ভগ্নদশা অবস্থায় জরাথ্রুস্ট আদর্শে বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মপ্রচারক জুল কি কুমারী এক পাশে আগুন জ্বালিয়ে প্রার্থনা করত। কনিস্কের মন্দিরে আস্তরা মাজাদাহর প্রশংসায় গান করে প্রার্থনা করত। এদিকে হেরাথে মাইমানা এবং গজনির সনাতনী ইহুদিরা সকালে এক স্থানে মিলিত হয়ে স্রষ্টার কাছে নিজেদের নিবেদন করত আবার তারাই সন্ধ্যায় আরেক স্থানে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করত।

প্রজ্ঞা এবং যৌথ সভা হতো প্রতি মুহূর্তে। এখানে ঈশ্বরের বার্তাবাহকরা মানুষের কল্যাণ এবং ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ও সততার কথা বলতেন। মনি উল্লেখ করেছেন : একদল বার্তাবাহক এলো, তারা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তারা এসেছিল ভারত থেকে। জরাথ্রুস্টবাদী বার্তাবাহকরা এলো পারস্য থেকে। যিশুখ্রিষ্টবাদীরা এবং তার বার্তাবাহক এলো পাশ্চাত্য থেকে। আর এসব

ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এবং ঐহির কথা মনি বলেছিলেন। ব্যাবিলনে যেন ঈশ্বর সব কিছু, নিজস্ব বার্তাবাহক প্রস্তুত রেখেছিলেন।

দৈব ঘটনা বা সত্যের প্রকাশ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? মনিবাদে বলা হচ্ছে : প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ অবশ্যম্ভাবীভাবে জানত ধর্মের আলো এবং অন্ধকার দিকটি। এটা জানা প্রত্যেকের একান্ত অধিকার। এরপর যে বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় তা হচ্ছে তিনটি সময় বা মুহূর্তকে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে সেটা জানাই মানুষের একান্ত ইচ্ছা।

'অতীত সময়ে কোনো স্বর্গ ছিল না, পৃথিবীও সৃষ্টি হয়নি, আলো এবং অন্ধকার–এই ছিল সৃষ্টির রহস্য। আলোর প্রকৃতি দিয়ে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বোঝায়। আর অন্ধকার দিয়ে পুরো অজ্ঞতাকে বোঝায়। বর্তমান সময় হচ্ছে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো। অন্ধকার দূর করা, সর্বত্র ন্যায়-নীতি এবং আদর্শ প্রচার করা, আলো এবং সত্য যদি সঠিক পথে চলতে না পারে তাহলে অজ্ঞতা এবং অন্ধকার চারদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বসে। এ কথা বলা যায় প্রকৃতি যেন সত্যের পথে ফিরে আসে। ভবিষ্যৎ সব সময় অজানা, বহু দূরে আলো দেখা যায়। মানুষ সেদিকে ছোটে। দূরের আলো অর্থাৎ সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ ছুটতে থাকে। অন্ধকার অন্ধকারের জন্ম দেয়।' এ সবই উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ড. লিউ। তিনি মনির দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের ওপর ব্যাপক গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন। মানুষ যখন এই পৃথিবীতে আসে তখন স্বর্গীয় আলো যেন তার সমস্ত শরীর থেকে পরিস্ফুটিত হয়। শরীর যখন বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় তখন যেন শয়তানের চিহ্ন এসে পড়ে।

মনির বিশ্বে ভালো এবং মন্দ, ঈশ্বর এবং শয়তান, আলো এবং অন্ধকার, শরীর এবং আত্মা দ্বৈতের মিশ্রণ রয়েছে। এর থেকেই ভালো এবং স্রষ্টার রহস্য বের করতে হবে।

মনির ধর্ম প্রসারের আগে জরাথ্রুস্ট বা অন্য দর্শনবাদীরা পৃথিবী সৃষ্টির একেবারে প্রথম সহস্রাব্দে প্রত্যেকে পবিত্র নগরীতে বাস করতেন। তখন এই পৃথিবীতে আলো আর অন্ধকারের সমন্বয় ছিল; কিন্তু পাপাচার ছিল না। জরাথ্রুস্ট ধর্মের ঈশ্বর এবং শয়তানের শক্তির মিলন ছিল। এই ভালো-মন্দ যারা বুঝতে পারত তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু মনির দর্শন যেন আরো পরিষ্কার হয়ে উঠল। তার ধর্ম দর্শন শুধু সাদৃশ্য বোধ নয়, সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষ যেন লিখিত এবং বস্তুগতভাবে বুঝতে এবং অনুধাবন করতে পারে সেভাবেই প্রচার করলেন। মনির ধর্ম এবং দর্শনতত্ত্ব শারীরিকভাবে বুঝতে অনুপ্রাণিত করেছিল সাধারণ মানুষকে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দার্শনিকগণ

মনির দর্শন এবং সাহিত্য সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বহু সমালোচনা করেছেন। এমনকি তার যে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ব্যাখ্যা ছিল সেটাও ছিল বিতর্কের।

এই দার্শনিকরা তাদের মতামত ব্যাখ্যা করলেন : যখন শয়তান নিজের কাজ একেবারে মনোনিবেশ করল তখনই সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবেশ করল। তাদের চলাফেরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। কিন্তু শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বাস্তবিক অর্থে এই অন্ধকার শয়তানের অবস্থান নির্দেশ করল। এ সবই উপাখ্যান মাত্র। তবে তারা কল্পকাহিনী এবং উপাখ্যানের গল্প বিশ্বাস করত না এবং প্রচার করত না। তারা ভাবত, ধর্মপ্রচারকরা যা বলে গেছেন তা সবই সত্য।

মনির কাহিনী ছিল সবই সত্য। আলো এবং অন্ধকার যেটা হচ্ছে, বিশ্ব নৈতিকতার একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ফলে সত্য এবং ন্যায়-নীতিবাদীদের এক হতে সহায়তা করেছিল। মনির ধর্ম, আদর্শ এবং নৈতিকতা কতটা আফগানিস্তানে উত্থান ঘটিয়েছিল সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। এ উপত্যকার অবকাঠামো বেশ জটিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চতায় আফগানিস্তান। এই নগরীতে গ্রীষ্ম এবং শীতকালে যে ধরনের বাতাস প্রবাহিত হয় তা যেন নবীর চিন্তা-চেতনার অবদান।

মধ্য আফগানিস্তানে বুদ্ধের মূর্তি এবং শিল্পকলাগুলো বাস্তবিক অর্থে বামিয়ান এলাকার অবস্থা তুলে ধরার প্রতিচ্ছবি। এ বিষয়টি জানা যায় ইরানে মনি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে মনি তৃতীয় শতাব্দীতে ধর্মের প্রসারের জন্য মাটির ছবি তৈরি করে রাখতেন। ফলে এ উপলব্ধি হতেই পারে, মনি শুধু ধর্ম প্রচারেই আসেননি, তিনি একজন চিত্রশিল্পও ছিলেন। মনিবাদে বা মনি ধর্মে আলো এবং অন্ধকারের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তার চিত্রকর্ম এঁকেছেন তিনি। ঔপন্যাসিক কারাভাগিও জানিয়েছেন চিত্রকর্মই হচ্ছে আলো। উজ্জ্বলতা এবং ছায়া মানুষকে পথ দেখায়। জার্মানির বিখ্যাত কবি গ্যাটে তার তরুণ বয়সে চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তিনি নিউটনের আলোক বলবিদ্যা সূত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। এ ব্যাপারে গ্যাটের নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। তিনি আলোর প্রতি গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। তার মতে, আলো হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি। এর কোনো ক্ষয় নেই। মনিবাদে যেন সে কথাই বলা হয়েছে। আলো হচ্ছে সত্য। একক সত্তা।

এ কথা জানা যায় না, মনি কত দিন বা বছর আফগানিস্তানে ছিলেন। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মনি ভারত এবং চীনেও ভ্রমণ করেছেন। তিনি তার অনুসারীদের নিয়েই ভ্রমণ করেছেন। ওই সব দেশে তার মতের এবং অনুসারীদের দেখা পেয়েছেন। মধ্য এশিয়ার তূরানে তিনি সরাসরি

রাজার সঙ্গে ধর্ম তর্কে লিপ্ত হন। সেখানে তিনি শীর্ষ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও তর্ক করেন। তার কথা ও চালচলনে এবং ধর্মীয় ক্ষমতায় রাজা মুগ্ধ হন। তিনি তার বিরোধী পক্ষকে অসম্মান করেননি বরং তার বক্তব্যে তারা সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজসভাসদ এবং মনির বিতর্কে রাজা খুবই গর্বিত হলেন। একটি ধারণা করা যায়, মনির নৈতিক কৌশল এবং ধর্মীয় শিক্ষা ছিল খুবই পরিশীলিত। এ ক্ষেত্রে যিশুখ্রিষ্ট সাধারণত তার বক্তব্য দিতেন দরিদ্র এবং ক্ষমতাহীন লোকদের মাঝে। কিন্তু মনি সব সময় তার বক্তব্য শাসকশ্রেণীর কাছে পেশ করতেন। তার বক্তব্য শুরু হতো স্থানীয় শাহ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। মনি বিশ্বাস করতেন, শাসকগোষ্ঠী তার বক্তব্য না শুনলে সমাজে ঠিকমতো ধর্ম প্রচার হবে না। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল শুরুতেই যেকোনো অঞ্চলের এবং বংশদের প্রধান শাসকগোষ্ঠীকে ধর্ম সম্পর্কে জানানো এবং বোঝানো। ইরান এবং অইরানীয় শাহেনশাহ প্রথম শাপুর যখন সম্রাট হন তখন মনির বয়স ২৮ বছর। তিনি স্থির করলেন সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। এ সময় মেসেনের শাসক মেহের শাহ। তিনি টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস অববাহিকায় তার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মেহের শাহ ছিলেন শাপুরের ভাই। মনি এ সময় মেহের শাহের রাজবাগানে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি এমনভাবে বসে ছিলেন, যেন কোনো এক শরণার্থী। নিজেকে সেটাই ভাবতেন। শান্তির অন্বেষণে দৌড়ে বেরিয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মেসোপটেমিয়ার প্রখর সূর্যতাপের থেকে রক্ষা পেতে সবুজ ঘেরা ছায়া সুশীতল মেহের শাহের বাগানে আশ্রয় নিয়ে যেন শান্তি পেলেন মনি। পাখির কলতান এবং পানির ঝরনার মাঝে যেন ছন্দ বয়ে যাচ্ছে। সুন্দর এবং সাজানো বাগানকে পারস্যরা স্বর্গ বলে অভিহিত করে। ঈশ্বরের বার্তাবাহক এবং নবী হিসেব আখ্যায়িত মনি যখন বাগান থেকে বের হচ্ছেন এ সময় মেহের শাহ তাকে প্রশ্ন করেন : বাগানের কোনো অংশ আপনার ভালো লেগেছে? পৃথিবীতে এ রকম বাগান আর কোথাও আছে কি, যা আমি বানিয়েছি? মনি লক্ষ করলেন, মেসেনের শাসক মেহের শাহ এ বক্তব্য দিয়েছেন তার স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার কথা প্রচারের জন্য। মনি উত্তর দিলেন : ঈশ্বর তার ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে আলোর স্বর্গ তৈরি করেছেন এবং মানুষকে অমরত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীতে বহু ধরনের বাগান তৈরি করেছেন এবং শোভাবর্ধন করেছেন। মেহের শাহের জয় নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

ইরানের উত্তর-পূর্বে খোরাসানে শাপুরের বড় ভাই ফিরোজ শাহ ছিলেন গভর্নর। মনি এক পর্যায়ে খোরাসানে চলে যান। মেহের শাহের সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন এবং তাতে

সফল হন মনি। খোরাসানে চলে যাওয়ার পর মেহের শাহের সঙ্গে ধর্মের সত্যতা এবং আলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর ফিরোজ শাহ সম্মত হন তার ভাই শাপুরের সঙ্গে মনির সাক্ষাৎ করে দেবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই দ্বান্দ্বিক এবং উভয় পক্ষের তর্ক, যা দুজনের সাক্ষাতে হয়েছিল, তা মনিবাদের কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে লেখা নেই। সংগৃহীত কিছু অংশ রয়েছে মাত্র :

মনি : হে রাজা, আমি আপনার আগে এই পৃথিবীতে এসেছি। যাই হোক, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে খুশি এবং গর্বিত। আপনার ওপর ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক।

রাজা বললেন : আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

মনি : আমি একজন চিকিৎসক। এসেছি ব্যাবিলন থেকে।

শাহেনশাহ তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন। তার দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন শাপুর। তিনি দেখলেন মনির দুই কাঁধের দুই পাশ দিয়ে যেন আলো ছড়াচ্ছে। যেন দুটো মোমবাতি জ্বলছে। ঈশ্বর কর্তৃক মহামানবের সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলেন শাহেনশাহ।

শাপুর জিজ্ঞেস করলেন : হে নবী, আপনি কী চান?

মনি বললেন : আমি এবং আমার অনুসারীরা আপনার এই প্রিয় ভূমিতে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে চাই এবং সুন্দরমতো ধর্ম প্রচার করতে চাই।

শাপুর মনির এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং এ-সংক্রান্ত লিখিত চিঠি দিলেন। মনি তার ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

শাপুর এবং মনি যেভাবে পারস্যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা ছিল যেমন মর্মার্থপূর্ণ, তেমনি যুক্তিযুক্ত। তারা সত্য প্রচার করেছিলেন। জীবন অন্তত সেই পরামর্শ এবং শিক্ষা দেয়। মনি রাজসভাসদে রাজার পরিষদ এবং তার মন্ত্রী পর্ষদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করলেন। তার বিরুদ্ধে আদালত সমন জারি করল। সেখানেও তিনি মুক্ত মনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেন। গ্রিক তার্কিক আলেক্সান্ডার লিকোপোলিটেনাস রোমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় শাপুরের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতেন। সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের বিশাল ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি। ফলে শাপুর তার অবস্থানগত পরিবর্তন না করার ব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোনো পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত নেননি। তার এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা এবং নাকশ-ই-রুস্তমের নিশ্চয়তা, সেইসঙ্গে জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাস এক অনন্য শক্তিতে পরিণত করে। শাপুর কিছু নিয়ম মেনে চলেন। বিশেষ করে কার্টিরকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধারণা করেন, শাহেনশাহ মনির বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি বা জোর দিতেন—ইহুদি, খ্রিষ্টান, জরাথ্রুস্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মমতের মধ্যে এবং তার চেষ্টা

করতেন। এর অন্যতম কারণ তার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাতে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এটাই সত্য, সাসনীয় সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটেছে জরাথ্রুস্ট ধর্মের কারণে, মনির জন্য নয়। এটা ভাবতে অবাক লাগত যে, শাপুর খুব বেশি মাত্রায় আকর্ষণ বোধ করতেন যিশুর ধর্মের প্রতি। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করত। তবে এত কিছুর পরও সর্বোপরি মনির দর্শন তত্ত্ব, ধর্ম প্রচার, কথাবার্তা ছিল খুবই প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্যারিশম্যাটিক। তিনি কোনো জটিল কথা বলতেন না। তার উত্তরসূরিরা বলত মনি খুব সহজেই সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। তিনি যেন পবিত্র মানুষ। আকাশে উঠে যেতে পারতেন। স্বর্গের দুয়ার খুলে যেত আর তার কাঁধের দুই পাশে যেন মোমবাতি জ্বলত এবং অন্ধকার দূর হয়ে যেত। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। চলার পথে যা কিছু দেখতেন তা-ই তিনি এঁকে নিতেন। এই আঁকার অর্থ শুধু রংতুলি বলা হচ্ছে না, এখানে মনের মাঝে এঁকে নিতেন তাই ধারণা করা হচ্ছে। তারপর নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতেন সব কিছু। আর তিনি যখন তা করতেন অন্যের কিছু করার কী আছে?

পরবর্তী সময়ে তিনি ঈশ্বরের গুণাবলি তুলে ধরলেন। তিনি ইরান এবং অইরানীয় জনগোষ্ঠীকে জ্ঞান দান করেন। ধর্মীয় শিক্ষা দেন সবাইকে। বহু গ্রন্থ লেখেন। এগুলোর মধ্যে দ্য লিভিং গসপেল, দ্য ট্রেজার অব লাইফ, দ্য প্রাগমেটিয়া, দ্য বুক অব মিস্টিরিয়াস, দ্য বুক অব জায়ন্টিস, দি এপিসেল এবং বুক অব প্র্যানস অ্যান্ড প্রেয়ারস। শাপুরের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে তিনি 'শাপুরাগান' নামে একটি বই লেখেন। তিন তার জীবনাদর্শ এবং শিক্ষা নিয়ে গ্রন্থ লেখেন। এ-সংক্রান্ত চিত্র এঁকেছেন তিনি। আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যে যুদ্ধ, সেইসঙ্গে জরাথ্রুস্টবাদের নৈতিকতা ব্যাপক এবং মৌলিক তত্ত্ব তুলে ধরেন মনি। একই সঙ্গে গ্রিক উপাখ্যানের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধবাদ চলে এসেছে। ক্ষমতার প্রধান উৎস যেন বৌদ্ধবাদ থেকেই এসেছে। সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি আলো আর এর সহকর্মী অন্ধকার। এ কথা সত্য, সংখ্যাতত্ত্বের তুলনায় বহুগুণ পার্থক্য বিদ্যমান। ইহুদি-খ্রিষ্টান এবং গ্রিক দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ মহান ধারণায় বিশ্বাস করত যে, মহান নুহ শুধু মানুষকে এক সারিতে আবদ্ধ করতে পেরেছেন। নুহ, ইব্রাহিম থেকে বুদ্ধ, জরাথ্রুস্ট, যিশু এবং মসীহ—এরা প্রত্যেকে মানবিক জ্ঞানদানের চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সত্য এবং জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে। মনিবাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছিল এই আলোকে আরো প্রসারিত করা। ধর্মের অজ্ঞতা দূর করা, জীব হত্যা না করা, মাংস ভক্ষণ না করা, মদপান থেকে বিরত থাকা, গাছ থেকে ফল পেড়ে আনা, জমি কর্ষণ

করা, গোসল এবং অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু মানুষকে পরিশ্রম করতে হবে তার বেঁচে থাকার জন্য।

কঠোরভাবে মনির এসব নিয়ম মানতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত ফল ঘটল। ব্যাপক খাদ্য সংকট হলো এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ মৃত্যুবরণ করল। ফলে কাথার এবং খোজোমিল শাসকগোষ্ঠী এবং এই সম্প্রদায় বহু চিন্তা-ভাবনা করে দুই ভাগ হলো। ক্ষুদ্র অংশ দায়িত্ব পালন করবে চাষাবাদের। আর বৃহদাংশ হেরোস গোষ্ঠী, তারা চাষাবাদে সাহায্য করবে। ধার্মিকরা ধর্ম পালন করবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। আর তাদের অন্নের ব্যবস্থা করবে সাধারণ মানুষ। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

রাজসভাসদের ধ্বংস হলে বা নির্বাচিত প্রতিনিধির ক্ষমতা শেষ হলে তাদের ক্ষমতা পুরোপুরি সাম্রাজ্যের হাতে নিবেশিত হয়। এখানেও সত্য এবং মিথ্যা, আলো ও অন্ধকারের প্রবল চিহ্ন দেখা যায়।

নৈতিকতা এবং রহস্য, কল্পকাহিনী চলতে থাকে শত বছর ধরে। মনির কাহিনীতে উঠে এসেছে সত্য এবং ন্যায়ের কথা। নবী নিজেও যেন বিশ্বাস করেন তার নিজেরও মুক্তি ঘটতে পারে স্বর্গীয় আহ্বানে। মনি একই সঙ্গে সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠায় লড়ছেন আবার তার চিন্তা-চেতনা শিল্পের রঙে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। 'বুকস অব ড্রইংস' বইয়ে মনি স্বর্গ সম্পর্কে তার চিন্তা-চেতনার স্থায়ী রূপ দেন। চতুর্থ শতাব্দীর মনিবাদবিরোধী দার্শনিক একরাম উল্লেখ করেন, মনি তুলা রং দিয়ে এমন এক ছবি আঁকেন, যেটা বলা যায় অন্ধকারের সন্ধান এবং এর পাশাপাশি সুন্দরকে তিনি নাম দেন আলোর সন্ধান। মনির উক্তি থেকেই একরাম জানিয়েছেন, মনি বই লিখেছেন এবং রঙিন ছবি এঁকেছেন। মনির চিন্তা-চেতনা তার নিজস্ব গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। মনির উক্তি থেকে জানা যায়–'আমি বইয়ে সত্য এবং আলোর কথা লিখেছি। সেগুলো রঙিন চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছি।' যারা তার কথা শুনেছে এবং যারা তাকে দেখেছে তারাই ভাগ্যবান। যারা এই লিখিত গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা যেন ছবি দেখে কিছু হলেও শিখতে এবং বুঝতে পারে–এই ছিল মনির দর্শন। তার এ সূত্র ধরেই প্রতিনিধিদলকে পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রতিনিধিদলে শিক্ষকও ছিলেন। একজন শিক্ষক মনির শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি অনুলিপি করেন। কয়েকশ বছর পর মনির এই শিল্পকর্ম নিয়ে উৎসব পালন করা হয়। মনির নামে একটি চেয়ার রাখা হয় এবং তা রাখা হয় খালি।

উৎসব আয়োজকদের পরামর্শ দেয়া হয়, মনির চিত্রকর্মের বই চেয়ারে রাখা হোক। তারা সেটাই করল। ধারণা করা হয়, এ বইয়ের একটি কপি

একদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। অন্তত এই কপি পাওয়া যেতে পারে মিসরের ধূসর মরুভূমিতে অথবা মঙ্গোলিয়ায় অথবা আফগানিস্তানের বিধ্বস্ত কোনো এক বাড়িতে। মনির এই চিত্রকর্ম শেষ পর্যন্ত একাদশ শতাব্দীতে চীনে পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায়নি।

বাস্তবিক অর্থে সব ভালোর শেষ আছে। এমনকি সত্যের আলো পরিস্ফুটিত নবীর কর্মময় জীবনেরও ইতি ঘটেছে। ২৭২ খ্রিষ্টাব্দে শাপুরের মৃত্যুতে ইরান এবং সাসনীয় সম্প্রদায়ের শাসক হলেন তার সন্তান হরমিজদ। এতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন মনি। যেহেতু তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শাপুর পরলোকে চলে গেলেন, ফলে তিনি এবং তার অনুসারীরা ইরান ত্যাগ করার চিন্তা করলেন। রাজসভাসদের সমর্থন না পেলে ধর্ম প্রচার করা সম্ভব নয়, সেটা ভালোই বুঝতে পারলেন তিনি। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন, নতুন রাজা এবং শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি জানতে চাইবেন তার প্রিয় নবীর জন্য কী করতে পারবেন। লিখিত তথ্যে জানা যায়, মনিকে নতুন শাসক উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করেন। শাহেনশাহ তাকে ধর্ম প্রচারের সব ধরনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু নবীর জানা উচিত ছিল, ভবিষ্যৎ কখনো নিশ্চিত নয়। আর মনি যদি এ ভাবনায় নিশ্চিন্ত থাকতেন সেটা হতো বড় রকমের ভুল।

এক বছর পর পারস্যের শাসক হরমিজদ মৃত্যুবরণ করেন। প্রচলিত আছে যে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। সম্ভবত বিষপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। হরমিজদের ভাই রক্ষণশীল এবং ওহি প্রচারক ছিলেন। তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে এমনটি ধারণা করা হয়। তার ভাই বহরম সাসনীয় শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন। চারিত্রিক দিক থেকে বহরম ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার বাবা শাপুর জ্ঞানী শাসক ছিলেন। একই সঙ্গে একজন দক্ষ সামরিক সেনা, চিন্তা-চেতনায় অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, জারাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী হলেও অন্য ধর্মের বিশ্বাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। অন্য ধর্মের নিয়ম-নীতি সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল। বিপরীতে বহরম ছিলেন ক্ষুদ্র এবং হীন মানসিকতাসম্পন্ন শাসক। বিরুদ্ধবাদী কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। নিজের বক্তব্যই তুলে ধরতেন। আরবের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক তার সম্পর্কে বলেছেন, খুব তুচ্ছ এবং সাধারণ বিষয়ে দাসদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। তাদের প্রহার করতেন। রাজ্য শাসনের চাইতে নাচ, গান নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। বহরম এমনভাবে জীবন কাটাতে চাইতেন, যেন কোথাও কোনো সমস্যা না থাকে। সহজ জীবন প্রণালি তার পছন্দ ছিল। প্রধান

ধর্মপ্রচারক কার্টিরের দ্বারা তিনি পরিচালিত হতেন। আর কার্টির জানতেন তার প্রভুর দুর্বলতা কোথায়। সেভাবে তিনি সুযোগ নিতেন, সেভাবে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন সেই ধর্মপ্রচারক। এরই ধারাবাহিকতায় কার্টির প্রথম পদক্ষেপ নিলেন দেশ থেকে মনির ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে। ফল ঘটতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু পরিস্থিতি খুবই বাজে দিকে ধাবিত হলো।

মনি বিষয়টি জানতেন। সে কারণে তিনি প্রথমেই চিন্তা করলেন এই বিপদ থেকে সাহায্য পেতে পারেন মেসেনে শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে। তাদের সাহায্য তার প্রয়োজন ছিল। সে জন্য প্রথমেই মেসেনে শাসকগোষ্ঠীর কাছে সহযোগিতা খুঁজলেন। মনি যখন মেসেন শাসকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছালেন তখন তিনি হতাশ হলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। বিখ্যাত এবং সুশীতল বাগিচা বনভূমিতে পরিণত হয়েছে। মেহের শাহ এবং তার পরিবারের লোকজন কোথায় তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারা যেন হারিয়ে গেছেন।

এ ঘটনায় মনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। আহত হলেন তিনি। কুশান এবং আফগানিস্তানে যাত্রা করতে চাইলেন। এখানে তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা রয়েছে। তিনি তাদের সমর্থন পাবেন—এই আশা ছিল। কিন্তু নতুন শাহেনশাহ তাকে মেসেনে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং ইরান ত্যাগে কোনো প্রকার সাহায্য করেননি। মনি বুঝতে পারলেন তার দিন ঘনিয়ে আসছে। তার ধর্মানুসারীদের নিয়ে প্রচণ্ড খরতাপ এবং বালুময় ব্যাবিলন পাড়ি দিলেন। তিনি তার অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে তাকে ছাড়াই চলতে হবে। যে আদর্শ রেখে যাচ্ছেন তা পালন করলে চলতে পারবে।

মনি অমর

নবনির্মিত বিশাল সড়কে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। পশ্চিম ইরানের কুজেস্তান নগরী। এই নগরী পুরোটাই তেলসমৃদ্ধ।

প্রদেশের রাজধানী আওয়াজ। মালুদের আলোর বাগান খুঁজছিলাম। এখানেই প্রাচীন আরামিক জাতি-গোষ্ঠী থাকত। এখানে একটি গ্রামের নাম বাথ লাপট। মনির গ্রাম। এখানেই তিনি বাস করতেন। এর আশপাশে ঐতিহ্যবাহী নগরী গুন্দাশাপুর। মহান রাজার নামে এই নগরী গড়ে উঠেছে এবং তার ঐতিহ্য ধরে রেখেই তার নামানুসারে এই নগরীর নামকরণ করা হয়।

গুন্দাশাপুর নগরী সমতল। ঝরনা এবং নদীর স্রোত বয়ে চলেছে নগরীর দুই পাশ দিয়ে। এক সময়ের প্রচণ্ড গরম এবং তাপদাহের এই নগরীতে বর্তমানে প্রচুর সবুজ বাগান রয়েছে। যেন সবুজের সমারোহ। তৃতীয় শতাব্দীর গুন্দাশাপুর নগরীকে হাল আমলে চেনার কোনো উপায় নেই। ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এক সময়কার গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে শিল্পায়ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। এর পরও এ নগরীতে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তা বলা যায় না। কারুণ নদী নগরীর দুই প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে। কালের সাক্ষী হিসেবে যেন বয়ে চলেছে স্রোত। অনেকেই এই নদীতে নৌকায় ভ্রমণ করে। গোসল করে বহু মানুষ। কিন্তু নদীটিতে দিনকে দিন তেল মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। পানিতে যেন তেল ভাসছে। বিশ শতকের ইরানের প্রাণকেন্দ্র গুন্দাশাপুর নগরী। আমরা আরেকটি গিরিপথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। সেই গিরিপথের একপাশে ইসলামিক বিপ্লবের এক পথিকৃৎ এবং দার্শনিকের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। একপাশে তাকালাম এবং একটি চিহ্ন দেখতে পেলাম। চিহ্নটি নির্দেশিকা বোঝাচ্ছে। গাড়ি থামাতে বললাম।

আমার ইরানি বন্ধু জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? তুমি কি কোনো কিছু দেখতে পেয়েছ? তোমার মনে কি কোনো প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে?

তাকে বললাম : দেখো, আমি একটি নির্দেশনা দেখতে পাচ্ছি। এই দিকে জোন্দা শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এক সময় গুন্দাশাপুর ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষাদীক্ষার তীর্থস্থান। এটা ছিল ভারতের পশ্চিমে। গ্রিক শাসকদের অধঃপতনের পর এথেন্সের এই শিক্ষানগরী খ্রিষ্ট শাসক জাস্টিনিয়ান ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ করে দেন এবং শিক্ষকদের অপসারণ করেন। আরবের মহাজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে গুন্দাশাপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সহকর্মী আমার এসব কথা শুনে হাসল। এটা আওয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়। তোমার চিন্তার সঙ্গে মিল নেই। তাকে আমি বললাম : অন্তত আমি জানি যে আমি সঠিক পথেই রয়েছি।

বন্ধু বলল : না, তুমি সঠিক পথে নেই। গুন্দাশাপুর এখান থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে। গুন্দাশাপুরকে এখন শটওয়াড বলে।

মনি যখন গুন্দাশাপুরে তার অনুসারীদের নিয়ে এসেছিলেন তখন তার বয়স প্রায় ৬০ বছর। পরনে ছিল নিল গাউন এবং বহু রঙের ট্রাউজার। তার হাতে ছিল লাঠি, বাম হাতে ছিল বই। ব্যাবিলন সম্পর্কে লেখা বই। তার মুখমণ্ডল এমন ছিল তা দেখলে মনে হবে কোনো মহান চিত্রশিল্পী অথবা যেন কোনো মহান নির্দেশক বা পথপ্রদর্শক। অন্তত তার জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে সেটাই মনে হবে। মনি সম্পর্কে বেশ কিছু গোপন তথ্য জানা যায়।

পারস্যের শাহেনশাহর সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল তা আরামিক এবং পারস্য ভাষায় লেখা রয়েছে। সে রকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

পারস্যের রাজা নৈশভোজে বসেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী রানি সাকাম। রানি তার থেকে ৪০ বছরের ছোট ছিলেন। নৈশভোজে আরো যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন আরাদাভানের ছেলে কারদার। তিনি শীর্ষ ধর্মীয় কর্মকর্তা। সম্ভবত কার্টির উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নিরাপত্তাকারীদের একজন নৈশভোজের প্রধান দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল এবং তার পায়ে প্রণাম করল। রাজা কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। হঠাৎ করে মুখের ভেতর মাংস যেন আটকে গেল। তিনি নিশ্চুপ থাকলেন এবং নিরাপত্তা প্রহরীর দিকে তাকালেন।

নিরাপত্তাকর্মী বলল, 'হে মহামান্য রাজা, মনি এসেছেন এবং তিনি দরজার বাইরে আছেন।'

'তাকে অপেক্ষা করতে বলো। আমি তখনই তার সঙ্গে দেখা করব, যখন মন-মেজাজ ভালো থাকবে।' রাজা এ কথা বলে নির্দেশ দিলেন।

মনি রাজার নৈশভোজের ঠিক বাইরে দরজার কাছে মাটিতে বসে ছিলেন। তার পাশেই ছিল নিরাপত্তাকর্মী এবং অপেক্ষা করছিলেন কখন রাজার খাবার শেষ হয় এবং তার ডাক আসে।

তাৎক্ষণিকভাবে রাজা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তার এক বাহু রানির কাঁধের ওপর রাখলেন, অন্য বাহু রাখলেন আরদাভানের ছেলে কারদারের কাঁধে। দুই হাত দুই কাঁধে রেখে রাজা হেঁটে দরজার কাছে এলেন, প্রহরী ফটক খুলে দিল। মনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মেঝে স্পর্শ করে রাজাকে কুর্নিশ করলেন। বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিলেন।

রাজা তাকে দেখেই রাগতস্বরে বললেন : আপনাকে এই রাজ্যে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল। আপনার প্রবেশের অধিকার নেই।

মনি নিজেই যেন ভুল পথে পরিচালিত হলেন? ভুলক্রমে রাজাকে প্রশ্ন করলেন : কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? আমার ভুল কোথায়?

রাজা বললেন : এ আমার নির্দেশ। আপনাকে এই ভূমিতে যেন প্রবেশ করতে না দেখি। এ রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি নেই আপনার।

রাজা যেন কিছুটা বিচলিত ছিলেন? তার রাগ হচ্ছিল। ছোট্ট শিশুর মতো এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করছিলেন। রাগ প্রশমিত করে মনিকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কোন কাজ পারেন? আপনাকে দিয়ে দেশের কী ভালো হতে পারে? আপনি না পারেন যুদ্ধ করতে, না পারেন শিকার করতে। আপনার কি ধারণা, আপনার দর্শন আমার এ রাজ্যের জনগণের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে? আপনার কোন দর্শন আমাদের কোন উপকারে আসবে?

মনি বললেন : 'আমি কখনোই আপনার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি।' প্রতিবাদ করে এ কথা বললেন মনি। 'আমি চেষ্টা করেছি আপনার এবং আপনার পরিবারের কল্যাণ করতে। আমি আপনার বহু ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছি। আমি মানুষের রোগমুক্তি এনে দিয়েছি। এমন অনেকে ছিল, যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, আমি তাদের পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দিয়েছি। সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এটা করতে পেরেছি।

রাজা বহরমের মুখে কোনো জবাব ছিল না। কিন্তু তিনি যেন প্রধান ধর্মপ্রচারক কার্টিরের বাণীই আওড়ালেন। নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি। রাজা বললেন : 'আপনি কি এই ধর্ম রাজা বাতকে শিক্ষা দিয়েছেন? আমি জানতে পেরেছি, তিনি আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনার ধর্ম ও আদর্শ অনুসরণ করছেন। আপনি এ ধরনের দর্শন কোথা থেকে পেয়েছেন?' রাজা বাত ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর শাসক ছিলেন। তিনি গুন্দাশাপুরে এসেছিলেন মনির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। মনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলে ধরেন।

মনি বলেন : একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আমার কোনো শিক্ষক নেই। আমি যদি কোনো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ করি তা ঈশ্বরের করুণায় পেয়েছি। সৃষ্টিকর্তার বার্তাবাহক আমাকে সত্য এবং ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন।

রাজা বহরম বললেন : তাহলে সেই সত্যটা কী?

মনি বললেন : এই পৃথিবী একদিন মিথ্যার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। ছাইয়ে পরিণত হবে। আমার ধর্ম প্রচারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে রক্ষা করা।

বহরম ধারণা করলেন, নবী মনি তার কথোপকথনে কোনো কিছু গোপন করছেন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না সেটা কী?

রাজা বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন : আপনি কী করে বুঝলেন আপনার কথাই সব সত্য আর বাকিদের সব কিছু মিথ্যা?

মনি বললেন : আমার শিক্ষায় নতুন কিছু নেই। আমি যেভাবে প্রার্থনা করি, পূর্ববর্তী ধর্মপ্রচারকরাও সেভাবেই করেছেন। পূর্ববর্তী বংশধরদের নিয়মমাফিক আমি ধর্ম প্রচার করি। তবে এটা ঠিক যে, সত্য পথ কখনো লুকানো থাকে না। সময় এলেই তা অবমুক্ত হয়ে মানুষ এবং সমাজে উপস্থাপিত হয়।

রাজা এবার উপলব্ধি করলেন এবং মনিকে হেয় করার জন্য বললেন : ঈশ্বর কেন আপনাকে বেছে নিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য? আমাকে নয় কেন? আমি এই রাজ্যের প্রভু।

মনি ধার্মিক মতানুসারে উত্তর দিলেন : 'একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষমতা রয়েছে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার।' কিন্তু তার জানা ছিল বহরম কী শুনতে এবং

জানতে চান আর এ ব্যাপারে তার মতই প্রাধান্য পায়। 'আপনার বাবা স্বর্গীয় শাপুর এবং আপনার ভাই হরমিজদ–তারা আমার শিক্ষা নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েননি। তারা আমার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের রাজ্যে ধর্ম প্রচারে অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি তারা আমাকে লিখিত প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।' রাজা বহরমের কাছে লিখিত প্রশংসাপত্র তুলে ধরেন তিনি। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রশংসাপত্র পেশ করেন। এরপর বলেন : 'আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমার ওপর যা কিছু করতে পারেন।'

মনির দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে রইলেন রাজা বহরম। তিনি তার পাশে দাঁড়ানো নিরাপত্তারক্ষীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আরেক পাশে মনি দাঁড়িয়ে। রাজা তার নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন একে গ্রেপ্তার করো এবং শেকল পরিয়ে রাখো। নিরাপত্তাকর্মীরা বিশাল ভারী শেকল নিয়ে এলো এবং মনির কাঁধ, পিঠ এবং বুকে আটকে দিল। তিনটি শেকল তার দুই হাতে আটকাল। শিকল দিয়ে বাঁধল। এটাই যথেষ্ট ছিল। রাজা বহরম বলেন : 'রাজার রাজ্য পর্যন্ত আপনাকে ক্ষমা করবে না।' তবে তাকে খাবার এবং পানি পরিবেশন করা হলো। তাকে কারাবন্দি করা হলো। সেইসঙ্গে তার অনুসারীদের তার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হলো। নির্দেশনামতো চলতে বললেন। অবাক ব্যাপার এই যে, তাকে যে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল ২৬ দিনের মধ্যে তা অলৌকিকভাবে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে আগত এবং আলোর পথ দর্শনকারী যেন যুদ্ধের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আলোর জাহাজে উঠলেন। তার মধ্যে অনাবিল শান্তি প্রবাহিত হচ্ছে। তার ডান এবং বাম পাশে ঈশ্বরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তার অনুসারীরা যেন গান পরিবেশন করছে। সুখের বাতাস বইছে। তিনি ঈশ্বরের সর্ব চূড়ায় সভাসদে পৌঁছে গেলেন। এখানেই মালুদের সংকলন শেষ। জ্যোতির্বিদ বাবেলের মতে, ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের আজর মাসের চতুর্থ দিনে এবং ২৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে খ্রিষ্ট যুগের নব সূচনা শুরু হলো।

বহরম মরিয়া হয়ে দেখতে চাইলেন নিজের ক্ষমতা। কিন্তু তিনি যা দেখলেন তাতে নিজেই চিন্তায় পড়ে গেলেন। মনিকে বেঁধে রাখা শেকল পড়ে আছে। পাশে খড়কুটো আর তা মাথার খুলি অবিকৃত রয়েছে। এভাবেই রাজা বহরম নগরীতে দরজা তৈরি করলেন।

শত বছর পরে আরবে মুসলিম ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, এই দরজা এখনো মনি নামে পরিচিত।

মনি ধর্মে বিশ্বাসী এবং অনুসারীরা বিশ্বাস করে না যে তাদের ধর্মগুরু এবং পথপ্রদর্শক মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা যদি বিশ্বাসও করে; কিন্তু এটা মানতে নারাজ যে, তার অবর্তমানে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইরান এবং ইরানের বাইরের জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করে, মনি অমর। তিনি বেঁচে আছেন। আবার ফিরে আসবেন তিনি। ফলে তার প্রতি যারা একেবারে উৎসর্গ তারা প্রাণ ফিরে পেল যেন। এভাবে অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

নাকশ-ই-রুস্তম পাহাড় মধ্যাহ্নের সূর্য যেন সমগ্র ইরানকে আলোকিত করেছে। মনি দীর্ঘ ৩৫ বছরের ভ্রমণ শেষে জেনিথে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার স্মৃতিসৌধ সেখানেই রয়েছে। এর কিছু পাশেই রয়েছে বহরমের স্মৃতিসৌধ। শাপুর যেন উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। বহরম তার ছায়ামূর্তি। প্রধান ধর্মপ্রচারক যেন দুজনের মাঝে প্রজ্বলিত হয়ে আছে। অন্য জ্যোতির্ষীরা তাকিয়ে আছেন রাজার দিকে। রাজার লক্ষ্য স্থির হয়ে আছে ধর্মপ্রচারকের দিকে।

একটা বিষয় ভাবলে অবাক লাগে যে, ধর্মীয় যে উপাখ্যান ঘটেছে তা আজ পাথরের মতো স্তব্ধ। স্থির হয়ে গেছে সব কিছু। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আজ শুধুই অতীত ইতিহাস, স্থানীয় পর্যটকরা মাঝেমধ্যে এসব স্মৃতিসৌধ ভ্রমণ করতে আসে। অতীতের এই স্মৃতি কি শুধু স্তব্ধ হয়ে আছে? উত্তর সম্ভবত না। বহু ভ্রমণকারী এই বিচ্ছিন্ন ফার্সি ভাষাগুলো চর্চা করে। তারা এসব কাহিনী মানুষের কাছে বর্ণনা করে। তারা অতীতের দিকে ফিরে তাকায়। অনেকেই আবার লিখিত ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু তারা এখানে কোনো প্রধান ধর্মপ্রচারকের কোনো কবরস্থান খুঁজে পায় না। আমিও (লেখক) কোনো মৌলিক ধর্মীয় নেতা বা ধর্মের অনুসন্ধান পাইনি।

ইতিহাস এই সাক্ষী দেয় যে, দীর্ঘজীবী ধর্মপ্রচারক কার্টির তার লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন। মাঝখানে দুই বছর বহরম প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন মনিকে। কার্টির যেন সেরা হয়ে বেঁচে ছিলেন উপাধি পাওয়ার জন্য। বিশেষভাবে ধর্মপ্রচারক এবং শাহেনশাহের আত্মার আত্মা এই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্যের জন্য কার্টির বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। কখনো তা ছিল আক্রমণাত্মক, কখনো রক্ষণাত্মক। তার চিন্তা ছিল একটাই, ইরানের এই ভূমিতে তার চিন্তা ও আদর্শ শত শত বছর ধরে উজ্জীবিত থাকে।

মনির শিক্ষা সাসনীয় ইরানে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। মনির উত্তরসূরি পরবর্তী খ্রিষ্টধর্মের নেতা হন এবং তাকে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যায়নি; বরং মানুষের মধ্যে

নতুন আবেদন সৃষ্টি করেছিল। খ্রিষ্টধর্ম প্রসারে শত বছরের বাধা সত্ত্বেও, তার সমগ্র জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ইরান ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং জরাথুস্ট্রবাদের বিরোধিতায় কোনো কাজ হয়নি। অন্যদিকে মনিবাদের ধর্ম প্রচারে যারা ছিল তাদের ওপর চাপ স্থির হয়ে গেল। দশম শতাব্দীতে ব্যাবিলনিয়ার বহু মনিবাদীর ফাঁসি দেয়া হয়। অনেককে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। লাতিন এবং বায়জান্টিয়ান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় মনিবাদের বা মনি ধর্মের প্রচারে বাধা আসে। সেটা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনির ধর্ম বাস্তবিক অর্থে ইরান, বায়জান্টিয়ান এবং পশ্চিমে প্রচারের কোনো আশাই থাকল না। বিকল্প পথ হিসেবে খোলা থাকল উত্তর-পূর্বাংশ। এর অন্যতম কারণ, পৃথিবীর এই অংশে কোনো এক একক ধর্মপ্রচারক এবং কোনো একটি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বড় হয়নি। এই অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করেছে।

এ রকম সুসম্পর্ক ছিল বোজোমিল এবং আলবিজেনিসিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে। এই দুই জাতি-গোষ্ঠীর সুসম্পর্কের কারণে ইউরোপীয় খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য হাজার বছরের সময় হুমকির কারণে পরিণত হয়। মনির আমল এবং শত বছর পরেও মারসাথিয়ানসরা এক এবং স্থির হয়েছিল। মনি ধর্মের অনুসারীরা কি জরাথুস্ট্র দর্শনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল–এমন কোনো প্রমাণ কি পাওয়া যায়? তারা পশ্চিমে যাওয়ার আগে জরাথুস্ট্রবাদে বিশ্বাসী হচ্ছিল কি? মধ্যযুগে সভ্যতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক গথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের মিলন ঘটে। কিন্তু এটাও প্রমাণ করে না যে, পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে মনি ধর্মবাদীরা জরাথুস্ট্র ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই, ইরানি যাযাবর এবং মনিবাদী শরণার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক রচিত হয়েছিল। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে মনির বার্তা এই প্রান্তর, বিশেষ করে সারমাথিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রভাব বিস্তার করতই যদি, তাহলে তার বার্তা অস্বীকার করার কোনো পথ তাদের জানা ছিল না।

সারমাথিয়ানরা তুরস্কের তৃণমূল জাতি-গোষ্ঠীর একটি অংশ এবং পশ্চিমের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। মনির বার্তা এই জনগোষ্ঠীকে প্ররোচিত করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তুরস্কের প্রান্তরবিশেষ জনগোষ্ঠী এই বার্তা পালন করে এবং মনিবাদকে ঐতিহাসিক বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। অষ্টম শতাব্দীতে তুরস্কের উইগার শাসক রাজা খাগান মনি ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম এবং শেষ শাসক, যিনি এই পৃথিবীতে সরকারিভাবে মনি ধর্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে এবং

পরবর্তী সময়ে মঙ্গলরা মনির ধর্ম এবং শিক্ষা চীনে প্রচার করে, যেখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে প্রেরিত ধর্মপ্রচারক এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছে একই সঙ্গে। এ সময় তাওইবাদ প্রতিষ্ঠা করেন লাওত্সু। মার্কো পোখো মনি আদর্শবাদীদের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ চীনে। এমনকি বাস্তবিক অর্থে সে সময় চীনের শাসকদের পক্ষে ১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলদের বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল। সে সময় শাসক ছিলেন মিং। মিং তার নাম ধারণ করেন আলোর ধর্মের উৎসদাতার কাছ থেকে। মিং অর্থ আলো। সতেরো শতক পর্যন্ত মনিবাদ চীনের জনগণের কাছ থেকে মুছে যায়নি। তবে একটা পর্যায়ে সব নষ্ট হয়ে গেল। হারিয়ে গেল।

চৌদ্দ শতকে মনির মন্দির দক্ষিণ-পূর্বে চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের দ্বিতীয় পিয়াও পর্বতমালায় অরক্ষিত ছিল। এই ধ্বংসস্তূপ মন্দির ১৯২২ সালে পুনরায় উদ্ধার করা হয়। এই মন্দির একজন বৌদ্ধবাদীর পবিত্র স্থানের সঙ্গে সংযোগ হলো। সে সময় ভারত এবং চীনের বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষকদের যোগসূত্র ছিল। ১৯৫০ সালে চীনে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায় মনির মন্দির পুনঃ স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং পবিত্র স্থান হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

মনিবাদ নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। কেন এমন হয়েছে? এটা ভাবলে অবাক লাগে–কেন এমন হয়েছে। বহু ধর্ম, মত পৃথিবীতে এসেছে এবং সময়ের পরিক্রমায় তা ধ্বংস হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে অন্ধকারে অতল গহ্বরে। কিন্তু মনির এই সত্য এবং আলোর ধর্মের বিস্তার ঘটেছে, বহু সময় টিকে ছিল। মানুষের মধ্যে ধর্মের বিশ্বাস এবং তা আঁকড়ে ধরে থাকা সত্যিই অন্যদের থেকে বিরল। আবার এর চূড়ান্ত পতনই বা কেন হলো? একই সময়ে কেন এই মনিবাদ অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো? এ প্রসঙ্গে কাইজার ধর্মযাজক বলেন, মনিবাদ শেষ পর্যন্ত শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়। সম্ভবত এটা খুবই সাধারণ স্বীকৃতি, যেমনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিখুঁত এবং নেতৃত্বদানকারী নবী, দক্ষ চিত্রকর এবং লেখক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জরাথ্রুস্টের দর্শন, চিন্তা মানুষের এবং পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছেন। জরাথ্রুস্টের মতবাদ শুধু পারস্য বা আরামিক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নয়, ইরানের বাইরে যারা বাস করত তাদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল।

'ঈশ্বর কর্তৃক শান্তি বর্ষিত হোক এবং সত্যের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক
আমাদের পবিত্রতার সঙ্গে এক হও এবং প্রিয় ভাই হও
যে এই স্বর্গ বিশ্বাস করে এবং মনে তা সংরক্ষণ করে
ডান হাতের আলো তোমাকে রক্ষা করবে এব পথ প্রদর্শন করবে

শয়তানের অপকর্ম থেকে মুক্তি এবং পৃথিবীর সকল অমঙ্গল
থেকে মুক্তি দেবে তোমাকে
পবিত্র ধর্মের উৎস এবং শক্তি তোমার হৃদয় খুলে দেবে
সেখানে তুমি দেখবে তোমার আত্মার শান্তি।'

(পার্সীয় সংস্কৃতি ও লোকগাথা এগস্টল থেকে সংগৃহীত। যুগে যুগে ঐ অঞ্চলের মানুষ এই কবিতা পাঠ করত)

কি অসাধারণ চিন্তা। আলো এবং অন্ধকার, সত্য এবং মিথ্যার সম্পর্কে মনির চিন্তা এবং পৃথিবী সম্পর্কে তার ধারণা ফুটে উঠেছে। এর থেকে বোঝা যায়, মনিবাদ শুধু একটি ধর্ম নয়, একই সঙ্গে বিজ্ঞান। আরো অনুভব করা যায়, আমাদের চারপাশে শারীরিক বাস্তবতা এবং এর আনুপাতিক ব্যাখ্যা কেমন হতে পারে সেটাই জানা যায়। একটা পর্যায়ে গ্রিক দার্শনিকদের নিজস্ব মতামতের সঙ্গে বিরোধ ঘটে মনির দর্শন তত্ত্বের। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বাধে। তবে গ্রিক দার্শনিক হোক আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হোক, এ কথা মানতে কারো কোনো দ্বিধা ছিল না যে, মনির দর্শন একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের আলো প্রচারে তিনি যেমন পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তেমনি তার অনুসারীরাও অগ্রগণ্য ছিল। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যে জ্ঞান এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পৃথিবীকে দাসত্ব থেকে অবমুক্ত করেছে, তা সম্ভব হয়েছে মনির জোর শক্তির কল্যাণে।

ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন একবার বিজ্ঞানী লাপ্লেসকে বলেছিলেন মনির ধর্ম এবং আলো নিয়ে কল্পনা করতে। বিজ্ঞানী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শুধু বলেছিলেন : হে ঈশ্বর, কী অসাধারণ এই বার্তাবাহকের কল্পনা।

সম্ভবত আরো একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ইউরোপেই মনিবাদ তত্ত্ব অপব্যাখ্যা হয়েছিল এবং দর্শনের অনেক কিছুই মনগড়াভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ইরানীয় ধর্ম প্রচার করেছিল নতুন মনিবাদের নতুন দর্শনে আর এই কাজে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিল রোমান সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী। প্রথম শতাব্দীতে ইউরোপে যেভাবে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ঘটেছিল এবং সেইসঙ্গে নিবেদিতপ্রাণ ইহুদিরা তাদের ধর্ম পালনে মনোনিবেশ করেছিল এবং যিশুখ্রিষ্টের আদর্শ হতে বিপথে চলে গিয়েছিল; তারা যেমন পরবর্তী সময়ে এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল, মনিবাদে সে রকমই ঘটনা ঘটেছে। মনির ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই ধর্ম সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মানুষ খুবই কম জেনেছে। যদিও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনিবাদে বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃত অর্থে এটা পুরোপুরি রহস্য।

PERSONAL COLLECTION OF ISCKRA

৫.
মিথরাস রহস্য

পোপের তন্দ্রাচ্ছন্ন হুকুমনামা

১৯৪১ সালের ১০ মে হিটলারের নির্দেশে লন্ডনে বিমান হামলা করা হলো। লন্ডনের কাউন্টি প্রদেশের সভাসদবৃন্দের দলিলপত্র থেকে জানা যায়, ওই হামলায় প্রায় এক হাজার ৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মারাত্মক আহত হয় এক হাজার ৮০০-এর বেশি মানুষ এবং আট হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। লন্ডনের ফায়ার ব্রিগেড দুই হাজারের বেশি অগ্নিনির্বাপকের গাড়ি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এর মধ্যে ৯টি অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ছিল সে সময়কার অত্যাধুনিক।

লন্ডনে আগুনের শিখা জ্বলছে। রাত পার হয়ে ভোরের সূর্য উঠল। একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা, অন্যদিকে ভোরের অগ্নিসূর্য যেন একাকার হয়ে উঠেছে। কালো ধোঁয়ায় সমগ্র লন্ডন পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। বাতাসে ছাই আর কার্বনের পোড়া গন্ধ। অবস্থা এমন, যেন পুরো নগরীতে মাংস পুড়ছে। লন্ডনের দশটি নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এর মাঝে সাধু পলের গির্জা এবং উপাসনালয় রক্ষিত রয়েছে। কোনো ক্ষতি হয়নি। উপাসনালয়ের দক্ষিণ পাশে বয়ে চলেছে টেমস নদী। এর পাশেই রয়েছে গির্জার প্রধান দরজা। এটা উত্তরের দিকে। এই গির্জার এখন আর কোনো চিহ্ন নেই। এই পুরো ত্রিভুজাকৃতি এলাকা উনিশ শতকে রানি ভিক্টোরিয়া সড়ক নামে পরিচিত ছিল। এখানে রাজসভাসদের বা রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই এলাকা নিরাপদ রাখতে সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছিল সে সময়কার ব্রিটিশ সরকার। দালানের বেইজমেন্ট এমনভাবে তৈরি হয়েছিল, যাতে শত্রুপক্ষের গোলাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিশাল এলাকা বিমান হামলা থেকে রক্ষার জন্য রানি ভিক্টোরিয়া সড়কে পানিবাহিত ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

অনেকে ভাবতে পারে, কাজটা করতে বেশ দেরি করেছে ব্রিটিশ সরকার। লন্ডনে যখন বিমান হামলা হলো সে রাতে আমি (লেখক) সেখানে ছিলাম। সে

সময় আমার বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। ভয়ার্ত রাত কাটিয়েছি। সেখান থেকে আমরা চলে যাই লন্ডনের জাদুঘরে। সেখানকার পরিচালক জন শেফার্ড পূর্ণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন। যাই হোক, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিপূর্ণ ঠিক হতে এবং সুন্দর করতে ১১ বছর সময় লাগে। ১৯৫২ সালে সেটা ঠিক হয়। এই কাজ করে নগরীর উন্নয়ন সংস্থার একটি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি। রোমান এবং মধ্যযুগের সভা পর্ষদের সদস্যরা এই ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির স্থাপত্যবাদীদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। স্থাপত্যবিদরা রোমান নগরী যেমন ধ্বংস করেন তেমনি লন্ডনের ওয়ালব্রুক বা ঝরনার পথ চিরতরে নিঃশেষ করে দেন। এটা ঘটেছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন অধিবাসীদের কারণে। টেমস নদীর খরস্রোতা, চ্যানেল আটকে দেয়া, সেতু তৈরি এবং চূড়ান্তভাবে লন্ডনের দুই হাজার বছরের ঐতিহ্য তুলে ধরার কথা বলা হলো এই সেতুর মাধ্যমে। সভাসদ এবং পর্ষদের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এবং ইতিহাসবিদগণ জানালেন, সেতুর অভ্যন্তরে ১৪টি ব্লক থাকবে। এতেই বিপত্তি বাধে এবং এক পর্যায়ে সব দলিলপত্র এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

সেতু নির্মাণের আগে ওয়ালব্রুক বা ওয়েলসের ঝরনার খননকাজে দুই বছর বেশি সময় লেগেছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ পানির প্রবাহ কখনো ঠিকমতো প্রবাহিত হচ্ছিল না। যাই হোক, এই ওয়ালব্রুক ঝরনা পুনরায় নির্মাণ করা হলো। লন্ডন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঝরনা খননের পর যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং পাম্প সরবরাহ করে, যাতে সহজেই ড্রেন দিয়ে পানি চলাচল করতে পারে। এর নির্মাণকাজের জন্য সরকারের তরফ থেকে সামান্যই অর্থ সাহায্য দেয়া হয়। কংক্রিট বেইজমেন্ট তৈরি হয়। উপরন্তু দুই হাজার বছর পূর্বে রোমান স্থাপত্যবিদরা যেভাবে ঝরনার নকশা করেছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও যেন নতুন কিছু সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে ওঠে। কেউই হতবাক হয়নি যে, খননকাজ উন্মুক্ত করা হয়েছিল যেখানে বোমার আঘাতে দালানকোঠা ধ্বংস হয়েছিল। তবে এ সময় অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে। ১৯৫৪ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে, খনন করার সময় তারা একটি মন্দিরের কয়েকটি টুকরো পেয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না, এটা কোনো ধর্ম অনুসারীদের মন্দির। ঈশ্বর কাদের মন্দির বা গির্জা রেখেছিলেন তা কেউ জানে না। তবে এ ব্যাপারে সাধারণের কোনো আগ্রহ ছিল না। খননকাজ শেষ হয়েছিল ১৯৫৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। এর কিছুদিন পূর্বে খননকারীরা তাদের সরঞ্জাম শেষ মুহূর্তের জন্য সরিয়ে নেয়। তারা চূড়ান্তভাবে খুঁজে পায় সুন্দর একটি মাথার খুলি। প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত হন

যে, এটা মিথরাসের মূর্তি। মিথরাস ছিলেন পারস্যে জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসীদের এবং অনুসারীদের একজন। এই খননকাজের সময় রোমান ধর্মের প্রতিকৃত সব সময় পাওয়া যায়। খননকাজে প্রধান সমন্বয়ক ডব্লিউ এফ গ্রিমস তার কাজে সন্তুষ্ট হন এবং এ সময় তিনি যেসব প্রাচীন ঐতিহ্য পেয়েছেন তা সংরক্ষণ করেন এবং সেগুলো সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন। শ্রমিকরা চলে যায়। খননকৃত এলাকা ডেভেলপারদের হাতে হস্তান্তর করা হলো। তখন ঘটে আরেক আশ্চর্য ঘটনা। অধ্যাপক ডব্লিউ এফ গ্রিমস চলে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর খননের পাম্পগুলো ভেঙে যায়। এটা ছিল রবিবারের ঘটনা। এই অলৌকিক ঘটনা সবাইকে হতবাক করে তোলে। সে সময় সানডে টাইমস মিথরাসের মাথার ছবি ছাপায়। তারা চিহ্নিত করে খননকৃত স্থানে মিথরাসের মন্দির ছিল। লন্ডন এলাকায় একমাত্র মিথরাসের মন্দির এবং জাদুঘর ছিল। এলাকা চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পর্যটক এবং দর্শনার্থীরা এলাকা দেখতে আসে এবং প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে কোনো বিপদ হয়নি। পরের দিন সোমবার লন্ডন টাইমসে সম্পাদকীয় লেখা হয়। যার শিরোনাম ছিল : 'আশ্চর্যজনক'। তারা এভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করে : 'এই অজানা মন্দির সম্পর্কে লেখার এক ঘণ্টা পরে অলৌকিক নির্দেশ এলো। লুকায়িত মূর্তি থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো। তাদের বলা হলো নতুন মূর্তি এবং মন্দির তৈরি করতে। এটা ঠিক, স্থাপত্যবিদদের পরিকল্পনায় বড় ধরনের কোনো ভুল ছিল। যে কারণে কোনো পুরনো ঐতিহ্য ভেঙে যেতে পারত বা ধ্বংসে হতো, যদি না তারা এগুলো ঠিকমতো দেখতে পেতেন। অন্য সভ্য জাতি-গোষ্ঠী কী ভাবতে পারে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবার আগেই খননকারী এবং বিশ্বার্সরা নিজেদের মতো করে নতুন করে সাজাতে লাগল।'

নতুন করে এর পরিচিতি পেল। নাম দেয়া হলো মিথরাস মন্দির। সেই দিন থেকে পত্রিকায় প্রতিনিধির সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা হতে থাকে। দ্বন্দ্ব এবং তুমুল লড়াই যেন নতুন করে শুরু হলো। একদিকে মিথরাস, আরেক দিকে ম্যামন। একদিকে সংরক্ষণবাদী, বিপরীতে ডেভেলপারস। একদিকে অতীত চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকরা, অন্যদিকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসরমান গোষ্ঠী। এমন এক মানসিক যুদ্ধ, যাতে জড়িয়ে পড়লেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, অন্যদিকে দার্শনিকগণ। এসব দার্শনিক এবং পণ্ডিত উইনস্টন চার্চিলের মন্ত্রিসভায় নিজেদের তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। এই সভায় যে বিষয়টি আলোচিত হলো তা হচ্ছে–রাষ্ট্রের আত্মসম্মানের প্রশ্ন। এই প্রশ্নে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রত্যাহার করে ফ্রান্স। এই প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় চার্টারের আঙ্গিকে। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়।

মন্ত্রিপরিষদের ওই বৈঠকে রাজনীতিবিদগণ এই উপসংহারে আসেন, খনন উন্নয়নমূলক কাজে দেরি হওয়া এবং ডেভেলপারদের তাদের পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিবর্তনে বাধ্য করার কারণে সরকারের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইসঙ্গে কোম্পানিকে প্রচুর ভর্তুকি প্রদান করতে হচ্ছে। এদিকে ব্রিটিশ জাতি এখন পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের কারণে যে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই এ ধরনের প্রকল্পে অর্থ খরচ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বিধ্বস্ত দালানকোঠা, যার অধিকাংশই রোমানদের যুগে তৈরি এবং যে মন্দিরের কথা বলা হচ্ছে তাও অস্পষ্ট। তাই এটা পুনর্নির্মাণের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যাই হোক, বহু তর্ক-বিতর্কের পর ঝরনা তৈরি হলো। কিন্তু এক দশক পর এই ঝরনা নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টর এবং খনন স্থাপনকারী বিডারসদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তারা জানায়, আজও মিথরাসের মন্দির থেকে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। যাই হোক, হুকুমনামা যেন ভাসা ভাসা। প্রতি পনেরো দিন পর দূর থেকে কে যেন নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবারও গবেষণা করলেন, কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা। এ প্রসঙ্গে কবি রবার্ট সারে লেখেন :

'এখানে ঘুমিয়ে আছে কোনো এক মহান বার্তাবাহক এবং নির্জীব
চারিদিকে আত্মা পাহারা দিচ্ছে
স্বর্গের স্বপ্ন দেখছে সবাই, সব যেন গোলাপ ফুল ফুটেছে
যারা চিন্তা করেছিল এখানে ব্যবসা করবে, সব ধ্বংস হয়ে গেল।
মিথরাসের যেন এ পরিকল্পনা ছিল।
তন্দ্রাচ্ছন্ন হুকুম দিয়েছেন তিনি।'

প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদগণের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের তর্ক বাধে একটি কারণে। মিথরাস মূর্তি এবং মন্দির পূর্ণ আবিষ্কারে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক তর্ক হয়েছিল।

মিথরাস মন্দির এবং জাদুঘর নির্মাণের উন্নয়নকাজে দেরি হওয়ায় বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে এই বিরোধের মধ্যে শিক্ষকরা ক্লাসে ছাত্রদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন তা দেখে আসার জন্য। লাতিন মাস্টারের সহায়তা ঘুরে দেখেছিল ছাত্ররা। ক্ষুদ্র শিক্ষকরা প্রাক যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন শিক্ষকের ভীষণ রাগ দেখে ছাত্ররা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন নয় যে তিনি ছাত্রদের প্রহার করেছেন, তার ব্যক্তিত্ব এবং স্বভাবসুলভ নৈতিক আচরণে সবাই মুগ্ধ। ফলে তার রাগ বা ক্ষোভে সবাই বিচলিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'মিথরাস হচ্ছে পারস্য জরথুস্ট ধর্মের রোমানীয় রূপান্তর। এটা প্রকৃত অর্থে কী ছিল?'

ছাত্ররা উত্তর দিল : 'পারস্যে জরাগ্রস্ট ধর্মের রোমানীয় রূপান্তর।' ছাত্ররা মিথরাস মন্দির দেখার জন্য লন্ডন শহরের ভূগর্ভস্থ মাটির তলে চলে গেল। স্মরণযোগ্য যে, সে সময় ছিল বসন্তকাল। পুরো এলাকায় হিমেল বাতাস। ওয়ালব্রুক ঝরনা পর্যন্ত পুরোটাই যেন অন্ধকার। হাতে রয়েছে প্রদীপ। সামান্য আলোতে কিছু দেখা যায়। এই ভূগর্ভস্থ ওয়ালব্রুক ঝরনা থেরাডিডল সড়ক পর্যন্ত চলে গেছে। এখানেই ব্যাংক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত। এক ঘণ্টা পার হলো। ছাত্রদের সঙ্গে ছিল ১৬ বছরের এক যুবক। ছাত্রদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হলো। সে এসে সবাইকে শান্ত করল। হট্টগোলের কারণ হচ্ছে ছাত্ররা যতক্ষণ পর্যন্ত সুড়ঙ্গের শেষ পথের ঠিকানা না পাচ্ছিল, ততক্ষণ ভয়ে ছিল। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল প্রচণ্ড ভয়ের ব্যাপার। ভূগর্ভের তলদেশে মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বোঝার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষক প্রয়োজন। পাথর নির্মিত মূর্তিগুলো শুয়ে আছে। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সময় একমত হতে পারেননি, মিথরাস প্রকৃত অর্থে দেখতে কেমন ছিলেন।

জন শেফার্ডের জাদুঘর থেকে বর্ণিত আছে যে, মিথরাসের মন্দির বেশ দীর্ঘ। তবে উচ্চতায় বেশি নয়। ৬০ ফুট হতে পারে। গোলাকার আবৃত এবং দুই দরজাবিশিষ্ট। মেঝে ছিল ভূমি থেকেও নিচে। প্রবেশের পথে দুই ধাপ নিচে নামতে হয়। আর ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে এক বা একাধিক পাথর স্থির আছে। পাথর দিয়ে রাখা হয়েছে যেন ঘরে আলো প্রবেশ করতে না পারে। মিথরাস সূর্যকে জয় করতে পারেননি। বরং তিনি সূর্যের আলো থেকে দুই ধাপ দূরে থাকতেন। মূর্তির মূল অংশ স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। মিথরাসকে রক্ষার জন্য ঈশ্বর তাকে একটি ষাঁড় প্রদান করেছিলেন। এটা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতীক বোঝানো হয়েছে। মিথরাসের মূর্তির পাশে আরো দুটি মূর্তির হাতের আলো যেন ঈশ্বরের আলোর নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। একজন আলো ধরে আছে ওপরের দিকে, অন্যজন নিচে।

মিথরাসের মন্দিরটি তিন স্তরে বিভক্ত। দুটি স্তর হচ্ছে পিলার দিয়ে বাঁধা। তৃতীয় স্তরটি অন্য দুটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এই তৃতীয় স্তর রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হতো। আর পুরো মন্দিরটি বিশাল আকৃতির ছাদ দিয়ে অন্ধকার করে তৈরি হয়েছিল। সেখানে কখনোই সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না। প্রদীপ জ্বালানো হতো দিনের বেলায়ও।

বাস্তবিক অর্থে ভূগর্ভস্থ প্রবেশকারী এবং মিথরাস মন্দির প্রদর্শনকারী কেউই খাল খননকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাই তারা কারো কোনো শব্দ শুনতে পায়নি।

এমন নয় যে, মিথরাসবাদ ছাত্রদের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল। ছাত্রদের অধিকাংশেরই এ ধারণা ছিল পারস্যের জরাথ্রুস্ট ধর্মের রোমানীয় রূপান্তরবাদের। ছাত্ররা রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের 'পাক অব পুক হিলস : এ সেঞ্চুরি অব দ্য থার্টিস' গ্রন্থটি পড়েছিল। সে সময়ের তরুণরা বইটি এক নিমেষেই পড়ে ফেলত। সে সময় এমন ছিল যে, কেউ যদি সম্রাট বা রাজাদের বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে চাইত, তার আগে এ বই পড়লে তার মধ্যে যেন মনে হতো অনেক কিছুই দেখা হয়ে গেছে।

রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের মতে, মিথরাসবাদ এমন এক ধর্ম, যা মন থেকে লালন করা যায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা আসে, সাহস, আত্মবিশ্বাস, অবিচল আস্থা, আত্মত্যাগ শেখায়। এ যেন রোমান শতাব্দীতে উইগট-জন্মগ্রহণকারী পারেনসিস। তিনি ছিলেন যেমন দৃঢ়চেতা, তেমনি অবিচল। তার সততা, নৈতিকতা জাতি-গোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছিল। জার্মানীয় উইং হ্যাট আক্রমণ থেকে নিজের দেশ এবং জাতি-গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য পারেনসিস নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জার্মানিরা সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রাইটনে এসেছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এর নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ম্যাগনাস ম্যাক্সিমাস। তিনি তার বিশাল সাম্রাজ্য মুক্তির জন্য এবং সাম্রাজ্য এ রাজমুকুট লাভের জন্য ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি মহান থিওডাসের কাছে হেরে যান এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের দিকে চলে যান।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বীরত্বের কারণে পারেনসিস তার জেনারেল ম্যাগনাসকে রক্ষা করলেন এবং সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিলেন। কিপলিংয়ের 'অন দ্য গ্রেটওয়াল' বইয়ে মিথরাস নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। গান রচিত হয়েছে। কবিতার অংশবিশেষ :

'মিথরাস, মধ্যরাতের দেবতা, এখানে রয়েছে মৃত ষাঁড়গুলো।
দেখ এই অন্ধকারে শিশুরাও রয়েছে।
হে দেবতা, আমাদের আত্মত্যাগ তোমার প্রতি উৎসর্গ করছি
বহু পথ ছড়িয়ে রয়েছে; তবে সব পথ আলোর সঙ্গে মিশেছে
মিথরাস, সত্যের সৈনিক, শিক্ষা দিয়েছেন সত্যের জন্য মৃত্যুর।'

এই কবিতার অসাধারণত্ব মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। রোমান্টিকতা ছাড়া আর কি-ই বা আছে এবং কল্পনাপ্রসূত ছাড়া আর কি-ই বা আছে?

প্রকৃত অর্থে যতক্ষণ মিথরাসবাদ সম্পর্কে না জানা যাবে ততক্ষণ এই কবিতার মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন। সহজ সত্য হচ্ছে, মিথরাস রহস্য এবং এর ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কিপলিংয়ের কবিতা থেকে এই

নির্দেশনা পাওয়া যায়, মিথরাসের মন্দিরে গিয়ে শুধু এটুকুই বোঝা যায় যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বকালে, সর্বজগতেঃ তা অতীত বা বর্তমান যে সময়ই হোক না কেন, রোমান বিশ্ব থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে উত্তর আফ্রিকা, সেখান থেকে স্প্যানিশ উপত্যকা, গল এবং ইতালি, বলকানের চতুর্পার্শে, এমনকি ব্রিটেনের সীমান্তবর্তী এলাকা, রাইন উপত্যকা এবং দানিয়ুব উপত্যকা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মিথরাসের দর্শন। এ কথা সত্য, একশরও বেশি মিথরাসের মন্দির, চারশর বেশি দলিলপত্র, পাঁচশর মতো স্থাপত্য এবং মাটির মূর্তি, অর্ধ ডজন বইপত্র সংরক্ষিত আছে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন মিথরাসবাদে প্রকৃত অর্থে কোন ধর্ম এবং দর্শনের কথা বলা হয়েছে তা জানার জন্য। প্রকৃত অর্থে মিথরাস একটি রহস্যময় ধর্ম। এখন পর্যন্ত এটা মানুষের কাছে রহস্যময় রয়েছে। এই ধর্মের গোপন দিক আজও উন্মোচিত হয়নি। যদিও এটা সত্য, মানুষের বহু অজ্ঞতা এবং তথ্যগত দুর্বলতার কারণে মিথরাস ধর্মের প্রসার ঘটেনি। সর্বোপরি এ কথা বলা যায়, মিথরাস ধর্মের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে অনেকেরই। আবার এটাও সত্য, ব্রেথেন গোষ্ঠী মিথরাস ধর্মের প্রতি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারশ বছর ধরে মিথরাস ধর্মের ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলেনি। নীরব নিথর হয়ে ছিল সবাই।

পরবর্তী ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, তা আর জানা যায়নি। রোমান মিথরাস সম্পর্কে তেমন কোনো প্রচার ঘটেনি। রোমান মিথরাসবাদে আলোর প্রসার ঘটেনি। এখানে পারস্যের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে। আজকের ইরানে এমনই একটি স্থানের নাম মিথরা। যে বিষয়টি সবাইকে অবাক করে তা হচ্ছে–মিথরা, মেহের এ শব্দগুলো এতটাই পরিচিত যে, ইরান এবং রোমেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আহুরা মাজদা, যাকে জরাথ্রুস্টবাদে সত্য ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এই নামটি বিশেষভাবে শোনা যায় না।

মেহের শব্দের অর্থ কী তা জানার জন্য ফার্সি ডিকশনারি দেখি। এই নামের সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করি। প্রবাদ প্রবচনে এটাকে ঈশ্বর সমতুল্য মনে করা হয়। একইভাবে মেহের দ্বারা পারস্যের সৌর বর্ষ পরিক্রমায় সপ্তম মাস হিসেবে চিহ্নিত পারস্যের বসন্ত কালীন উৎসব এবং চাষাবাদ বোঝানো হয়। আধুনিক যুগে মেহের অর্থ ভালোবাসা, প্রগাঢ় সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, আলো এবং সূর্য। এক পর্যায়ে ইরানের ধর্ম নিয়ে ইতিহাসবিদ আর সি জেহনারমের সঙ্গে আলাপ হয়। এই ইতিহাসবিদ 'দ্য ডন অ্যান্ড টু লাইট অব জরাথ্রুস্টিয়ান' গ্রন্থ লেখেন।

মিথরাস সম্পর্কে আরো একটি তথ্য জানা যায়, তা হচ্ছে আর্যদের প্রধান ঈশ্বর তিনি। আর্যরা হচ্ছে ইন্দো-ইরানীয়রা। এ দুই জাতি-গোষ্ঠী মিলিত হয়েই আর্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। এক পর্যায়ে তারাও বিভক্ত হয়ে নিজেদের মতো চলতে থাকে। ভারত এবং ইরানে নিজেদের মতো ধর্ম প্রচার করতে থাকে।

ইতিহাসে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ১৪ শতাব্দীতে আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে বোজোস্কিতে মিথরাস দর্শন সম্পর্কে প্রথম আলোচিত হয়। এ অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপের মধ্যে মিথরাস দর্শন নিয়ে চুক্তি হয়। এই চুক্তির প্রধান ছিলেন হিতিম এবং মিতানি–এই দুজন। এ দুজন পাঁচজনকে স্বর্গের সেরা মনে করেন। এই পাঁচজন হলেন : মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং অন্য দুটি হচ্ছে নাসাতিয়াম। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদে উল্লেখ আছে–মিত্র এবং বরুণ হচ্ছেন সর্বময় প্রভু এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় এবং যোগসাজশে চলেন। এ জন্য বলা হয় মিত্র-বরুণ জোড়া ঈশ্বর। আর সি জেহনারাস থেকে জানা যায় : ইন্দো-ইরানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ওপর সংস্কার করেন জরাথ্রুস্ট। দীর্ঘদিন ধরে এ দুই জাতি-গোষ্ঠী যেসব দেব-দেবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ছিল তাতে আঘাত আনেন জরাথ্রুস্ট। প্রভু বরুণ হিন্দুধর্মের বিশ্বাসীদের কাছে ধর্মীয় আহুরা মাজদা বা জ্ঞানের প্রভুরূপে আবির্ভূত হলেন। তার পাশে মিত্র, যিনি বরুণের অনুপ্রেরণা নিয়ে জ্ঞানের উৎস এবং শক্তি নিয়ে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে ওঠেন। শত বছর ধরে এই জোড়া ঈশ্বরের প্রতি হিন্দুদের সব উপাখ্যান রচিত। তারা এই জোড়া ঈশ্বরকে সেরা মনে করত। যত দিন পর্যন্ত না জরাথ্রুস্ট ধর্ম প্রচারিত হলো তত দিন পর্যন্ত মিথরা যেন ঈশ্বরের পুত্ররূপে অধিষ্ঠিত হলেন। এটা যেন খ্রিষ্টধর্মের সেই তিনটি ধারণার মতো। পিতা ঈশ্বর, খ্রিষ্টপূর্বে পঞ্চম শতাব্দীতে ইরানিরা মিথরাকে নিয়ে গান গাইত।

'আমি নিজেকে মাজদার যোদ্ধা মনে করি। তিনি একজন জরাথ্রুস্টের অনুসারী।

> *যিনি দেব-দেবতা ঘৃণা করতেন। সৃষ্টিকর্তার আইন মানতেন।*
> *আত্মত্যাগ, প্রার্থনা এবং ঐতিহ্য রয়েছে*
> *মিথরার প্রতি, যিনি সর্বদিকের প্রভু, যার হাজার কান*
> *চোখ দশ হাজার...'*

জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে প্রচলিত গান রয়েছে :

> *'সত্য, আমি যখন সৃষ্টি করেছি মিথরাকে*
> *তিনি হচ্ছে বিশ্বাসের প্রভু*
> *তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আত্মত্যাগ, প্রার্থনার জন্য।'*

যারা ভুল পথে পরিচালিত হয় মিথরা তাদের জন্য এবং সমগ্র দেশের জন্য মৃত্যু বয়ে আনেন। এতে শুধু পাপীরাই ধ্বংস হয় তা নয়, অনেক সময় বিশ্বাসীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, শয়তানের শত দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে এ কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে, একজন অবিশ্বাসী থাকলে পুরো সমাজে বিশ্বাসীদের কোনো লাভ হবে না। মিথরা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। মৃত্যুর পর মিথরা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন অবিশ্বাসীদের প্রতি। আর যারা বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। তাহলে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা বলে : 'মিথরা, তোমার সামনে আমরা মিথ্যা বলব না। কোনো অপকর্ম করব না।' আর মিথরা যাকে করুণা বা আশীর্বাদ করবেন তার কোনো ক্ষতি হবে না। তার দিকে তীর নিক্ষেপ হবে না। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে না। তার আত্মা শান্তি পাবে। দশ হাজার প্রহরী তাকে পাহারা দেবে।

মিথরা একটি দর্শন নিয়ে মানুষের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছেন। তার সঙ্গে মানুষের চুক্তি হচ্ছে স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচারের। সেইসঙ্গে রয়েছে সততা, সত্য। আলো এবং সূর্যের প্রখরতা প্রতিষ্ঠিত করতেই মিথরা একাগ্র। খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা যেমন মনে করে যিশুর আদেশ-নির্দেশ মানলে তার সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক রচিত হয়। তিনি তার প্রতি রূঢ় না হয়ে আপন করে নেন। এর মাধ্যমে ঈশ্বরের মমত্ব এবং স্বকীয়তা বৃদ্ধি পায়।

ইরানে আহুরা মাজদার পরিবর্তে মিথরার প্রতি বেশি আকর্ষণ। তিনি ক্ষমতাবান, এটাই ধরে নেয়া হয়। তিনি যেন যিশুখ্রিষ্টের মতো। ঈশ্বর এবং মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। জরাথুস্টের মন্দিরের প্রবেশদ্বারে মিথরার কথাই যেন বলা আছে। সত্য এবং ন্যায়বিচার উচ্চে স্থান দাও। তিনিই এই দর্শন কাজে লাগাতে বলেছেন। সমরকন্দে মিথরা সূর্য যেন তীব্রভাবে জ্বলজ্বল করছে। মিথরা যদি দৃশ্যমান শক্তি হতো এবং ভালোবাসার প্রতিকৃত স্পর্শ করা যেত তাহলে সেরা ধর্ম হিসেবে পরিচিত আহুরা মাজদা প্রতিষ্ঠিত হতো। তাহলে অনেকেই জ্ঞানের দেবতা আহুরা মাজদাকে শ্রেষ্ঠ বলত। এটা এমন হতো, যেমন লাতিন শিক্ষক বলেছেন মিথরা ও জরাথুস্ট হচ্ছে পারস্য ধর্মের রোমানীয় রূপান্তর। বিষয়টি আসলে তেমন নয়। উনিশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সম্ভবত বেলজিয়ামের ইতিহাসবিদ ফ্রাঞ্জ কুমন্ট তার জীবনের দীর্ঘ সময় মিথরা ধর্ম এবং মতবাদ নিয়ে কাটিয়েছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মিথরাস রহস্য'তে সব বর্ণনা দেয়া আছে। উপসংহারে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে রোমান সাম্রাজ্য গোপন এই ধর্ম সম্পর্কে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

কুমন্টের গল্প শুরু হয়েছে রোমান ইতিহাসবিদ প্লুটাসের ব্যাখ্যা থেকে। এই ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেন, জরাথ্রুস্টের শিক্ষা রোমানদের মধ্যে প্রথম শুরু হয় আনাতোলিয়ার দক্ষিণে সিসিলীয় জলদস্যুদের দ্বারা। রোমান সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল পাথুইকে খ্রিষ্টপূর্বে ৬৯ সালে পাঠানো হয় আনাতালিয়া উপকূলে।

তবে এ ব্যাপারে সম্ভাব্য কোনো তথ্য নেই। কুমন্ট উল্লেখ করেন, যত দূর জানা যায়, টাইবার এলাকায় প্রথম ইহুদি সম্প্রদায়ের রূপান্তরবাদ ঘটেছিল। এটা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে জেরুজালেম বিজয়ের পর। প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী মিথরা ঈশ্বর এবং এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভালোবাসার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছেন। বন্ধুত্বের এক লিখিত চুক্তি, সবার মাঝে চুক্তি স্থাপনকারী, সততা–তার এ দর্শনই এক পর্যায়ে তিনি অজেয় সূর্য মিথরাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন; যার দর্শন রোমানদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ফরাসি ইতিহাসবিদ এবং দার্শনিক আর্নেস্ট রেনে উল্লেখ করেন : নৈতিক ভুলভ্রান্তির কারণে সৃষ্টির শুরু থেকেই খ্রিষ্টধর্ম যদি স্তব্ধ হয়ে যেত তাহলে এই বিশ্ব হতো মিথরাসবাদ। আমরা যেমন জানি পারস্যের সূর্য দেবতা শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের স্রষ্টার পুত্রের কাছে পরাস্ত এবং চতুর্থ শতাব্দীতে এই কাহিনী পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে রোমানদের ভাগ্যের একই পরিণতি হতো। এ বিষয় নিয়ে কঠিন বিতর্ক রয়েছে। এটা কোনো হালকা বিষয় নয়। রোমান মিথরাসের সঙ্গে পারস্যের মিথরার কোনো যোগসূত্র আছে কি না এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানা যায় না। ইরানি ধর্মতত্ত্বে মিথরাসবাদের মৌলিকত্ব নিয়ে যে বর্ণনা দেয়া আছে ফরাসি দার্শনিক কুমন্ট কঠোর পরিশ্রম করে তার দর্শনতত্ত্বে জরাথ্রুস্টের উপাখ্যান, যা রোমান উপাখ্যানে বর্ণিত আছে তার মিল খুঁজে পেয়েছেন। দুটিকে এক এবং সন্নিবেশিত করেছেন। একটি ধর্ম আকেরটি ধর্মের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে মিথরাস আর জরাথ্রুস্ট ধর্ম এক হয়ে গেছে, রোমান উপাখ্যানে যা পাওয়া যায় তা সত্য কি না সেটাও প্রমাণ করা বহু কষ্টসাধ্য। কয়েকটি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কুমন্ট এই দর্শনে মত দিয়েছেন। এ জন্য যদি তার ভুল হয়ে থাকে তাকে দোষারোপ করা যায় না।

তৃতীয় শতাব্দীতে নেপলীয় যুগে দার্শনিক প্রফেরি মিথরাস ধর্ম নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন। তার গবেষণায় যে তথ্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে : প্রাচীন সমাজের নাগরিকরা ধর্মপ্রচারকদের নারী মৌমাছি হিসেবে চিহ্নিত করত। যেভাবে তারা দেবীরূপে একটি অশরীরি বস্তু প্রতীক হিসেবে বেছে

নিত। তাকে কুমারী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আবার তারা চাঁদকে নারীর মতো তুলনা করে তাকে রানি মৌমাছি বলে ডাকত। পুরুষ মৌমাছি হচ্ছে ষাঁড়। ফলে আত্মা পুরুষ ষাঁড়। সেভাবেই আত্মা সৃষ্টি। অধ্যাপক কুমন্টের ব্যাখ্যায় মিথরাবাদের উপখ্যানে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। তার মহান কর্মের মধ্যে মিথরা উপাখ্যান : ষাঁড়ের যে আত্মত্যাগ, যা প্রকৃত অর্থে মিথরাস নিজেই আত্মত্যাগের উৎসদাতা। ইরানি জরাথ্রুস্টবাদের রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। আবার তার মত ও দর্শন প্রচার করতেন মিথরা। তবে তিনি কোনো অবস্থায়ই সর্বোচ্চ ঈশ্বরে আসীন হননি। মিথরা ছিলেন মানবতা এবং স্বর্গের মিলনের মাঝে সেতু রচনাকারী। উৎসদাতা জরাথ্রুস্টের একই দর্শন ছিল। তিনি ধর্ম প্রচার করতেন এবং স্রষ্টার মহত্ত্বের কথা বলতেন। একবার ঘটল অঘটন।

আইরম্যানের দ্বারাই ষাঁড়ের মৃত্যু ঘটে। মূলত এটা শয়তানকে ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। দার্শনিক কুমন্ট ব্যাখ্যা দেন, যেভাবেই হোক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়, আইরম্যান থেকে মিথরাসের রূপান্তর ঘটে। যদিও এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার যে, মৌলিক ঘটনা কী ঘটেছিল; তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

মিথরাবাদ প্রকৃত অর্থেই মন্দিরে প্রতীক রূপে প্রদর্শিত হচ্ছে। কিন্তু এই অসামান্য ঘটনা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব এবং এর প্রসারও ঘটেছে স্বল্প মাত্রায়। খ্রিষ্টধর্মে যেমন দেখা যায়, এর একজন বার্তাবাহক আছেন। এমনকি এই ধর্ম প্রচারের জন্য বহু প্রতিনিধি রয়েছেন। বহু কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, মিথরা ধর্ম দর্শনে সমাজে বড় কোনো প্রভাব পড়েছিল। মিথরার জীবনও ছিল খুবই সাধারণ মানের। তার জন্ম হয়েছিল এক পাহাড়ের পাদদেশে। শৈশবে চাষাবাদ করে সময় কাটাতেন। অন্ধকার গুহায় সময় কাটাতেন। মিথরাস উপবাস পালন করতেন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যায় পানাহার করতেন। মানুষকে বিশ্বাস করতেন। তবে তার বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এক অস্তিত্বের প্রতি। প্রকৃত অর্থে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। বেলজীয় ইতিহাসবিদ কুমন্ট গবেষণা করে এই দর্শনতত্ত্ব বার বার প্রসারিত করেছেন। তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, মিথরাসের চিন্তা-চেতনা ছিল এক ঈশ্বর নিয়ে ভাবনা এবং সমাজে যাতে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা পায় সেটাই তার আরাধনা ছিল।

মিথরার ষাঁড়টি হত্যা করা হয়েছিল টরেকটান নামক স্থানে। এটি এমন একটি স্থান, যেখানে কল্পনা করা হয় যে, পবিত্র মিথরাবাদের এখানেই সমাপ্তি

ঘটেছে। কখনো বিস্তারিত, কখনো আবার মনের মাধুরী মিশিয়ে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। সম্ভবত দুটোই ব্যবহার হতো। এ ক্ষেত্রে গ্রিক এবং রোমান ধর্ম উপাসনালয়গুলো দেখতে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মতোই ছিল। আর দুটি জাতি-গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা ভিক্টোরিয়া যুগের দর্শনের মতো। মিথরাস পারস্যবাদীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি পারস্যের মতো টুপি পরিধান করতেন। ট্রাউজার পরতেন। তার বিখ্যাত ষাঁড়টি পেছনে রেখে প্রার্থনা করতেন। তিনি তার বা হাত পেছনে রাখতেন। ডান হাত সব সময় পশুর ওপর অস্ত্র নিয়ে রাখতেন। সব সময় পেছনের দিকে ফিরে তাকাতেন তিনি। পূর্বের কোনো চুক্তি থেকে দূরে থাকতেন সব সময়। তার চেহারায় ফুটে উঠত দুঃখ-কষ্টের প্রতিচ্ছবি। ষাঁড়গুলোকে ছুরি দিয়ে জবাই করার পর মাটিতে রক্ত প্রবাহিত হতো। পাশে দাঁড়ানো কুকুর এবং ছোট ছোট সাপ সেই রক্ত ভোগ করত। এমনও দেখা গেছে, পাখি, কাক সেই মৃত ষাঁড়ের রক্ত খাচ্ছে। বন থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির সিংহ এসে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। মিথরাসের দুই পাশে দুটি আলো নিয়ে দুজন দাঁড়িয়ে থাকত। কটেস একটি বাতি ওপরে তুলে ধরত এবং কটোপেটসের প্রদীপ নিচের দিকে আলো ছড়াত। এর দ্বারা প্রকৃত অর্থে জ্যোতির্বিদ্যার কথাই বলা হয়। সমাজতত্ত্ব এখানে মুখ্য বিষয় ছিল না। মিথরাসের মস্তিষ্ক সূর্য দেবতা সল এবং চন্দ্র দেবতা লুনার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দেবতাদ্বয়ের চতুর্পার্শ্বে এবং তার পোশাকের চারদিকের আবহমণ্ডলকে রাতের আকাশের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে—এগুলো হচ্ছে তারা, সৌরজগৎ, গ্রহ, চন্দ্রিকামণ্ডল। এগুলো সবই রোমান যুগের হেলিনিস্টিক জ্যোতির্বিদ্যার কথা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পরিচিত সব উদাহরণ বাস্তবে একক মৌলিক উৎস থেকে আগত। পেন্টাগনের ক্র্যাফটসম্যান আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অ্যাজেন উপকূলে বসে এই গবেষণা করেন। অ্যাজেন বর্তমানে তুরস্কের একটি স্থান। হেলেনিস্টিক যুগের বিখ্যাত নগরী অ্যাজেন। প্রাক আমলে জ্যোতির্বিদ্যার এই মৌলিক দর্শন আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করেছিল। গ্রিক বিজয়ে দেবীর সুপরিচিত প্রভাব ছিল। তিনি একটি ষাঁড় উৎসর্গ করেছিলেন। এথেন্সের এথেনা নিকে মন্দিরে তিনি এই ষাঁড় উৎসর্গ করেন। অনেক যোদ্ধা মিথরাসের দর্শনের প্রভাব এবং তার মুখাবয়ব দেন, পরবর্তীকালে তিনি মহান আলেক্সান্ডারের রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্ম প্রচারণা—বাস্তবে এগুলো দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? অনেক সময় গল্প কাহিনী মিলিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে মেলানো হয়েছে। আবার তাৎক্ষণিক ছবি প্রকাশ করে তা বোঝানো হয়েছে। কোনো

জটিল মুহূর্ত বোঝানোর জন্য একটি ছবিই হয়তো যথেষ্ট। যদিও জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে প্রতিটি চরিত্রের যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে এর সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই শুধু মিথরাসের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ব্যতিক্রম ছাড়া। তিনি যেন নিজেই স্বর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার মিলন রচনা করেছেন। তার যে দুটি ষাঁড় তা দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাওরাস। কুকুর দিয়ে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু বুঝিয়েছেন। সাপ প্রতীক হাইদ্রা, কাক প্রতীক ব্যবহার হয় ক্রোভাসকে বোঝাতে, সিংহের প্রতীক লিও। কটেস এবং কটোপেটস ছিলেন মিথরাসের প্রতিনিধি। তাদের হাতে ওপরে এবং নিচে প্রজ্বলিত বাতি সব সময় জ্বলছে। তাদের আড়াআড়ি পায়ে বাতি জ্বলছে। তারা কি সূর্য এবং তারার মধ্যে আলো ছড়াতে পারবে? আদৌ কি এটা সম্ভব ছিল? বিভিন্ন মৌসুমে সৌরশক্তির প্রভাব এবং মিথরাসের প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এগুলো কি মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার প্রতীক হিসেবে হাজির হবে? স্বর্গ নাকি নরকে আত্মার স্থান হবে তা এদের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। অন্য আরেকটি মতবাদ মিথরাসবাদে প্রচলিত রয়েছে। এই মতবাদ বেশ রহস্যজনক। মিথরাসবাদে রয়েছে সিংহ মস্তক আবৃত ঈশ্বর। সিংহ মস্তক আবৃত দেব নাকি দেবী তা কারো কাছেই নিশ্চিত নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে, এটা মানুষের মতো, শরীর এবং মাথা সিংহের মাথা দ্বারা আবৃত। পুরো শরীরে চারটি ঈগলের ডানা রয়েছে, সেইসঙ্গে সাপ জড়িয়ে রয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক বস্তুর মতো হলেও বাস্তবে তাদের ঈশ্বর কী আকৃতির তা নিয়ে ভাবে না কেউ। বরং বহু প্রিয় আদর্শ এবং অনুসারী, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে; গ্রিক এবং রোমান ভাস্কর্য, যা মানুষের শারীরিক গঠনে তৈরি—এগুলো প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রতিনিধির প্রতিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সনাতনী পৃথিবীতে পশুর মাথাসংবলিত কোনো ঈশ্বরের চিহ্ন বা নমুনা নেই, তবে মিসরে পশুর মস্তক আবৃত ঈশ্বরের সন্ধান মেলে। এমনকি প্রাক যুগে পূর্বের বহু অঞ্চলে পশুর শরীর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তাকে দেবতা মনে করা হতো। বহু দিবস আরমানিয়াসে বহু জাতি-গোষ্ঠী পশুর মস্তকবিশিষ্ট দেব-দেবতার প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করে। এ রকম একটি স্তুতির সন্ধান মিলেছে নিউ ইয়র্কে। মস্তকবিহীন এই মূর্তি সম্পর্কে বহুজনের ধারণা, এটা 'সিংহ মস্তকবিশিষ্ট ঈশ্বর' প্রতিকৃতি। বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদদের পরামর্শ ছিল এবং তারা মনে করতেন, জরাথ্রুস্টবাদের অনুসারী আইরম্যানের চিন্তার প্রতিফলন এবং এটা রোমানীয়তে রূপান্তরবাদ ঘটেছে। এই আইরম্যান শয়তানের শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীন লেখকদের মতে, শয়তানের শক্তিকে উদ্‌যাপন করার জন্য পশু উৎসর্গ করা হতো।

বিশ শতকের মাঝামাঝি মিথরাস রহস্য সমাধানের জন্য বহু রকম পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রসারের কারণে মিথরাস রহস্য উন্মোচনের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। জরাথ্রুস্টবাদ নতুন ধর্ম রূপে পারস্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই নামে এবং একই রূপে হাজির হয়েছেন তিনি, এটাই প্রচলিত ধর্মবাদীদের বিশ্বাস। ইরানি মৌলবাদে এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় এসব পশুর মস্তকবিশিষ্ট দেবতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো। এটাই ছিল তাদের ধর্ম। মিথরাসের প্রতি সব শ্রদ্ধা এবং জীবন উৎসর্গ করে নিজেদের ধন্য মনে করত সবাই। উৎসর্গ অনেক সময় নাবারজের প্রতিও প্রদর্শিত হতো। শামার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করত। কিন্তু বাস্তব অর্থে এ ধরনের ধর্মের এবং দেবতার কোনো অস্তিত্ব ছিল কি না এবং মানুষ কেন এক সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তিকে শরিক করত তা পরিষ্কার নয়।

প্রাক মুসলিম যুগে ইরানে রাজকীয় পরিবার দেশ শাসন করত। ইরানের রানি ফারাহ্ সিদ্ধান্ত নেন রোমান মিথরাস দর্শন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে। তিনি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন এবং অর্থ সাহায্য দেন। সম্ভবত রানি ফারাহ ধারণা করেছিলেন, ইরান এবং ইউরোপের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় কোনো যোগসূত্র ছিল। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সংশয় সৃষ্টি করেছিল। পারস্যদের সঙ্গে অন্যদের সম্পৃক্ততা নিয়ে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল।

রোমান মিথরাসবাদের বিশ্বাস সত্য আচরণ, তাদের বিশ্বাস এবং উৎসব উদ্‌যাপনের অর্থ, আচরণ সব কিছুই ছিল রহস্যময়। ফলে অন্য একটি ধর্মের প্রতি আগ্রহ এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েক দশকের মধ্যে মিথরাস ধর্ম এবং প্রচার পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সিরিয়া থেকে ব্রিটেনে ছড়িয়ে পড়ল। এই প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে রোমান সামরিক বাহিনীর অবদান ছিল। একটা বিষয় পরিষ্কার নয় এবং কখনোই জানা যায়নি, কেন রোমান সামরিক বাহিনী তাদের প্রধান শত্রু পারস্য থেকে এই মিথরাসবাদ নিজ দেশে প্রচার করল এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিল। অবস্থাটা যেন এমন দাঁড়াল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১৯৪০ সালে জার্মানির ওয়েরম্যাকট সরিয়ে দিয়েছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল নরডিক ঈশ্বরের করুণায়। আরো বিষয় হলো, হিটলার এর সমর্থন করেছিলেন। কেন তিনি এটা করেছিলেন তা জানা যায়নি কখনো। প্রাক রোমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নিজেদের স্বার্থে ইরানের পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরবর্তী কয়েকশ বছর পর সাসনীয় সাম্রাজ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে রোমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাসনীয়রা ২২৪ খ্রিষ্টাব্দে পার্থিয়ান বিজয় করে। রোমান সম্রাটগণ ক্রমাগত যুদ্ধ

করে যেত থাকেন এবং বৃহৎ পরিসরে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। পার্থিয়ান এবং সাসনীয় উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদের।

তৃতীয় শতাব্দীতে মিথরাবাদ যখন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠল তখন রোমানরা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। সাসনীয় দ্বিতীয় রাজা প্রথম শাপুর, যিনি ছিলেন মনি ধর্মের সকল দিকের রক্ষাকর্তা, তিনি রোমান সম্রাট ফিলিপ দি অ্যারাবিয়ান এবং সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে একটি লোহার তৈরি জেলখানায় আটকে রাখেন। তার মৃত্যু পর্যন্ত এই শাস্তি দেন তিনি। এই স্মৃতি স্মরণ করে রাখার জন্য তিনি ইরানের বিশাপুর এবং নাকশ-ই-রুস্তমে প্রতিকৃতি তৈরি করেন। এটা ভাবতে অবাক লাগে এবং অসামঞ্জস্য ব্যাপার যে, সাম্রাজ্যের একজন সৈনিককে তাদের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান শত্রু প্রতিকৃতি তৈরি করে রেখেছিল। এর অন্যতম কারণ স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং সত্তা বোঝাতেই এটা করা হয়েছিল।

মিথরাস দর্শনের নতুন দিক

মিথরাসবাদ নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনোই একমত হতে পারেননি। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা হাজির করেছে। এমনকি সমাজের সাধারণ মানুষ যারা মিথরাস ধর্ম পালন করত তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। পারস্যের দেবতা এবং ধর্মপ্রচারকদের সন্ধান এবং তাদের প্রকৃতি জানা সহজ ছিল না। এমনকি তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। একটা কথা সত্য, তারা সবাই এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাসী ছিলেন। আরো একটি বিষয় ভাবতে অবাক লাগে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে মিথরাস অনুসারীদের প্রবল আধিপত্য ছিল। লন্ডনে মিথরাসের মন্দির ছিল। এই মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলাম ১৯৫০ সালে। তখন আমি তরুণ। মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এটা এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ডেভেলপারদের ব্যাপক পরিশ্রমের ফলে মন্দিরের পাথর গির্জার সামনে রেখে দেয়া আছে।

একটি ঘটনা সবাইকে হতবাক করেছিল। মন্দিরসংলগ্ন বাকলবেরি অফিস কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ আট বছরের মধ্যে শেষ পর্যায়ে এসেছে, ঠিক তখন মিথরাসের একটি বিশাল আকৃতির মূর্তি আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কৃত হলো। সেই মূর্তি ভিক্টোরিয়া সড়কে পুনঃ স্থাপিত হলো। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মূর্তি ভিক্টোরিয়া সড়কে স্থানান্তরে খুশি হতে পারেননি। তা ছাড়া হলব্রুক ঝরনা নির্মাণে খননে কিছু ভুল ছিল। অধ্যাপক গ্রিমসের বর্ণনা থেকে জানা যায়,

ঝরনার একেবারে নিচু স্থান থেকে পরিকল্পনায় ভুল ছিল। যে কারণে এর ফল হবে অর্থহীন। অর্থহীন হোক আর না-ই হোক, পুনর্নির্মিত বিধ্বস্ত মন্দির এখনো সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর ঠিক বিপরীতে সাদা এবং হলুদ রং মিশ্রিত বাকলবেরি অফিস। নতুন করে ডিজাইন করা হয়েছে। লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পর্যটকদের দেখার জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয়েছে। লাল রঙের ডাবল ডেকার, কালো ট্যাক্সিক্যাব, বহু রঙের ভ্যান প্রতিনিয়ত পর্যটকদের সেবা দিচ্ছে। অফিসকর্মী, ট্রেইনার তাদের খাবার সুন্দর করে প্যাকেটে নিয়ে আসছে। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য বাসে উঠছে। আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন রয়েছে। এটা যেন লন্ডনের আধুনিক নগরী। কাজেকর্মে সবাই ব্যস্ত এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনামতো এবং ছবির মতো গোছানো রয়েছে সব প্রান্ত।

এটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার যে, একজনের পক্ষে খুবই সতর্ক হয়ে মিথরা জাদুঘরে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কীভাবে বের হবে তা বের করা। কারণ এত দিকে দরজা করে রাখা হয়েছে যে, এর মূল ফটক পাওয়া দুষ্কর। এটা করা হয়েছে পর্যটকদের স্বার্থেই। লন্ডনে বসবাসরত রোমান নাগরিকরা সাধারণত মূল দরজায় ভিড় করে। এর কারণ, তারা মিথরার ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্য মিথরাকে পূজা অর্চনা করে। এ রকম ঘটনা ঘটত দ্বিতীয় শতাব্দীতে।

মিথরা জাদুঘরের বামে টেমস নদী। এর পেছনে প্রাদেশিক সরকারের বিশাল রাজপ্রাসাদ। এর একটা চুম্বকীয় আকর্ষণ রয়েছে। প্রাচীন প্রাদেশিক সরকারের প্রধানের আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। মিথরা জাদুঘরের পেছনে ওয়ালব্রুক ব্যাংক সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন স্থানে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মাটি বেশ পিচ্ছিল এবং নরম, এর উভয় পার্শ্বে মাটি বেশ নরম ছিল। এটা খুবই শক্ত হাতে নির্মাণ করা হয়েছে। এই স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৪০ খ্রিষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণের জন্য। ওয়াটার হাউস নির্মাণ করা হয় এবং সরু চ্যানেল তৈরি হয়। ঝরনার বিপরীতে ব্যাংকের সারিবদ্ধ লাইন। সবই কাঠের তৈরি, সাদা রং মিশ্রিত। সেইসঙ্গে মাঝে লাল চিহ্ন দুটি দুই তলাবিশিষ্ট দালান। এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কর্মী রয়েছে। তারা সকাল থেকেই কাজে লেগে যায়। পচা ময়লাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঝরনার ভেতরের সব পুরনো মাছ তুলে নেয়া হয়। স্টোরের পুরনো জার নষ্ট করা হয়। সুন্দর করে আবার তা পরিচ্ছন্ন করা হয়। পুরো এলাকা যেন পরিণত হয় লন্ডনের অগাস্টা জাদুঘরে। এটা একটা বন্দরনগরী।

ব্রিটেনিয়ার এই বন্দরনগরীর যত দূর চোখ যায় দারুণ সুবাতাস বইছে। আর ড্রামের শব্দ।

ইউরোপের মধ্যবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে দেখলে অবাক হতে হয়। আর তিনিও আমাদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলেন। আপন হতে পারেন না। অন্ত রঙ্গতার অভাব। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের মানুষদের খুব সহজেই চেনা যায়। এখানে বহু সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করত। এই সমাজে বহু ধর্মের মিশ্রণ ঘটলেও একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাবোধ ছিল প্রগাঢ়। সে সময় এত প্রযুক্তি জ্ঞানের উন্নতি ঘটেনি; কিন্তু মানুষের মধ্যে মিল ছিল। তবে একটা ধারণা সবাইকে চিন্তিত করে তোলে, সাধারণ মানুষের জীবন ছিল খুবই দুঃসহ। অধিকাংশ শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে দাস করে রাখত। তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করা হতো। এমনকি এতে অনেকের মৃত্যুও হতো। অনেক সময় রাজা-বাদশাহদের আনন্দ উপভোগের জন্য নারী ক্রীতদাস বেছে নেয়া হতো। তাকে ভোগ করে হত্যা করা হতো। লন্ডনে কোনো পারিবারিক পরিবেশ ছিল না। এর কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল রোমান জীবন ব্যবস্থায়। তাদের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশ বজায় ছিল। তাদের সমাজেও ভালো-মন্দ ছিল। কিন্তু একটা কথা সবাই বিশ্বাস করত যে, তিনি রাজ্যের প্রতিনিধি। ডেভেলপারস, আইনজীবী, হিসাবরক্ষণবিদ, অভিনেত্রী, বিখ্যাত ক্রীড়া তারকা, শহরের দরিদ্র ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পোশাক শিল্পের শ্রমিক, বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক, ক্ষুদ্র অপরাধী এবং দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ যে-ই হোন না কেন, সবাই রাজ্যের নাগরিক। এমনকি রোমান দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্বচ্ছ। দেশের ধর্ম সনাতনী ব্রিটিশ রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের মতোই। ইংল্যান্ডের গির্জার মতোই।

এখানে যেন সম্মিলিত একটি শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তারা কোনো কিছুই গুরুত্বের সঙ্গে নিত না। তবে রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের মতোই কৌতুক করত তারা। তার উত্তরসূরি ক্যালিগুলা ছিলেন প্রচণ্ড বদমেজাজি। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। নিজেকে ঈশ্বর ভাবতেন এই রোমান সম্রাট। দাসদের তাই মানতে বাধ্য করেন। সাধারণ মানুষ তাকে মানতে অস্বীকার করল। ক্যালিগুলা একবার আলেক্সান্ডারিয়ার ইহুদিকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'তুমি কি ঈশ্বরকে ঘৃণা করো। যে আমাকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না তার জন্য চরম বিপদ। আমি সারা পৃথিবীতে ঈশ্বর হিসেবে সমাদৃত আর তুমি আমাকে চেন না।' এভাবে শত শত বছর পার হতে লাগল। সম্রাটরা নিজেদের ঈশ্বর সমতুল্য মনে করতেন। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। ইতিহাসবিদ লর্ড মেলবোর্নের সঙ্গে অধিকাংশ রোমান একমত হলো যে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের

আত্মিক ব্যাপার মাত্র। এটা জোর করে হয় না। কোনো ব্যক্তি, তা সে যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, সৃষ্টিকর্তার সমান হতে পারে না। ফলে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের অস্তিত্ব সমর্পণ করা যা, অন্যের কাছে নয়।

রোমানদের এই প্রাচীন বিশ্বাসের পতন শুরু হলো। নতুন করে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি হলো। মানুষ তার আত্মিক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে ধর্মের প্রধান রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। সামাজিক ন্যায়বিচার, যা আমরা বলে থাকি নবযুগের সূচনা, সেটাই যেন হলো। রোমানদের এই অদৃশ্যমান ঈশ্বরের প্রতি বা সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস, এর আগমনী সূচনা হয়েছে পূর্ব থেকে। সঠিক অর্থে বলা যায়, এশিয়া থেকে। তারা দেখল, ভারতের কৃষ্ণের সমর্থন এবং অনুসারীরা সাদা কাপড় পরে ড্রাম বাজাচ্ছে এবং ঈশ্বরের সাধনা করছে। সে যুগে এশিয়া মাইনরের জনগোষ্ঠী জিওনিসিস দেবতার অনুসারী ছিল, মিসরের লোকেরা ঈসা এবং প্যালেস্টাইনের খ্রিষ্টানরা যিশুকে অনুসরণ করত। ইরানের জনগোষ্ঠী সম্ভবত মিথরাস ধর্ম পালন করত।

রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের নবপ্রেরণা এবং হাওয়া শুরুর পেছনে কারণ ছিল। দেশের নিম্নশ্রেণীর সৈনিক, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাস থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যা-ই হোক না কেন, তাদের সমাজে কোনো স্থান ছিল না। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষ যদি কখনো মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করত, তখন তাদের অনুমতির প্রয়োজন হতো। তারা কখনো রোমান সমাজের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশে যেতে পারত না। মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার অধিকার তাদের ছিল না। রোমান সম্রাটগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা নিজেদের জরাথ্রুস্ট আদর্শের প্রধান অনুসারী মনে করতেন। নিজেদের ব্যক্তিগত মন্দিরে উপাসনা করতেন। সেখানে সাধারণের কনো স্থান নেই। আর সাধারণ মানুষ ধর্ম পালন করত সাধারণ নিয়ম-কানুনে। তাদের জন্য অন্য স্থানে মন্দির নির্মাণ হতো। সাধারণ নাগরিকরা ধর্ম পালনের জন্য সরকারি মন্দিরে যেত। ধারণা করা হয়, নিম্নশ্রেণীর মানুষ মিথরাসের নৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিল। এর অন্যতম কারণ, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মত্যাগ ছিল এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজে মন-প্রাণ বিসর্জন দিত। তারা অনুদান দিত। সমাজের শীর্ষ কর্মকর্তারা, যেমন সামরিক কর্মকর্তা, তেমনি অন্যান্য পেশার মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোটখাটো আমলা, সর্বোপরি সমাজের প্রধান ব্যক্তিবর্গ—এদের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে বিভাজন করা হতো। তিনটি স্তর, যেমন—প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী নির্ধারণ করা হতো। ধর্ম পালন করতে তারা যে কীভাবে আসত এবং কোন ধর্ম অনুসরণ করত তা সত্যিই বোঝা দুষ্কর ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী এবং

অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউই এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। রোমান পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, তিনি মিথরাস ধর্ম দর্শন নিয়ে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সেখান থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে, ধর্ম পালনকারীদের সাত ভাগে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণী বিভাজন হতো ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে।

গির্জার প্রধান পুরোহিত সেন্ট জেরম শ্রেণী অনুযায়ী নামের তালিকা তৈরি করতেন এবং ক্রমানুসারে নাম বসাতেন। সবচেয়ে নিম্ন জাতের শ্রেণীকে দাঁড়কাকের সঙ্গে তুলনা করা হতো। এদের চিহ্ন ছিল সৌরজগতে বুধ গ্রহের মতো এবং প্রতীক হচ্ছে একটি কাজ। সাধু অগাস্টিনের মতে, কোনো উৎসব হলে দাঁড়কাক যেমন কালো পাখির পালক দ্বারা আবৃত হয়, তেমনি সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকেরা উৎসব-আমেজে নতুন পোশাক পরিধান করে স্বাগত জানায়। এর ওপরে স্থান বিদ্যাধর দেবতা বা নিমপসের। এর চিহ্ন ভেনাস দেবতা। প্রতীক হচ্ছে হাতে জ্ঞানের প্রদীপ। একই সঙ্গে সত্য ধর্মের প্রতীকও বটে। নিমপসকে রক্ষা করার সৈন্যবাহিনী সুরক্ষিত অবস্থায় থাকত। মঙ্গল গ্রহ তাকে রক্ষা করত। প্রতীক হিসেবে হেলম্যাট ব্যবহার করত। বিদ্যাধর দেবতা ছিলেন অন্ধ, সম্পূর্ণ নগ্ন। তাকে যখন রাজমুকুট দেয়া হলো তিনি তা ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন : মিথরাস আমার স্বর্গীয় রাজমুকুট।

এভাবে একে একে সৌরশক্তির প্রতীক দিয়ে সমাজের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং ব্যক্তিবর্গের স্থান নির্ধারিত হতো। চরটি শীর্ষ শ্রেণীর মধ্যে ছিল লিও বা সিংহ, পেরেস বা পারস্য গোষ্ঠী, হেলিওড্রোমাস বা ধাবমান সূর্য, পিটার বা ফাদার।

লিওর চিহ্ন হচ্ছে জুপিটার। এর প্রতীক হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুন। এমনকি প্রাচীন যুগে গানের যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হতো। এ কাজে দক্ষ ছিল প্রাচীন মিসরীয়রা। সাধু অগাস্টিন মনে করতেন, লিও বা সিংহ দেবতা তার পাশের চারটি বস্তুকে আবর্তিত করে রাখে। আরেক রোমান লেখক বলেন, পরদেবী লিও বা সিংহ দেবতা তার দুটি পা পরিষ্কার করতেন মধু দিয়ে। সমাজে যারা শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন সে সময় তারা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখায় মধু ব্যবহার করতেন। আগুনের সঙ্গে যেহেতু সিংহ দেবতার সংযোগ রয়েছে তাই তিনি কোনো উৎসবে পানি স্পর্শ করতেন না।

পারস্য জাতি-গোষ্ঠী চাঁদের দ্বারা রক্ষা পেত। চাঁদ যেন তাদের সব বিপদ থেকে উদ্ধার করত। তার প্রতীক ছিল শস্যের কান সমতুল্য। হেলিওড্রোমাস বা ধাবমান সূর্যের রক্ষার দায়িত্ব ছিল সূর্যের। সূর্যরশ্মি দ্বারা একে ঢেকে রাখা হতো। সবচেয়ে ক্ষমতাবান ছিল দি ফাদার। শয়তানের চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। মিথরা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। প্রতীক

হিসেবে বিশ্বময় কর্তা এই ব্যবহার করতেন। পার্থিব জগতের এই সব দেব-দেবতার দ্বারাই মানুষের অবস্থান নির্ণয় হতো। এক লেখকের মতে, মাইলসের হাত মুরগির পালক দ্বারা আবৃত থাকত এবং অন্ধ অবস্থায় পানিতে ঝাঁপ দিতেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতেন এবং শেষ পর্যন্ত তলোয়ার তুলে নিতেন ডান হাতে। অন্যরা এটাকে বলত পুনর্জীবনের প্রতীক। ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন রুটি এবং পানি এমনকি তা যেন ব্যাপিস্টবাদে ঘটত, তেমনি ঘটত মাইলসে। সাধু গ্রেগরি ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন এর মাঝে। তার মতে, নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড, পুড়িয়ে মারা আর অন্যের প্রতি চলত অপপ্রচার। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা এক ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। এ যেন অলিখিত এক যুদ্ধ।

কোনো কিছু কল্পনা করার ব্যাপারে মন্দিরের এবং জরাথ্রুস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই পত্রপত্রিকায় বাজেভাবে প্রচারিত হয়েছে। এমনও দেখা গেছে, মন্ত্রিপরিষদে মিথরাস দর্শন নিয়ে বিতর্ক এবং বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন অনেকে। প্রত্যেকের বক্তব্য একটাই, দুই মিলিয়ন যুগ আগের ইতিহাস পুনরায় নতুন করে শুরু করে কার কী লাভ হবে? যা-ই হোক না কেন, মন্দিরের পাথর নতুন স্থানে পুনঃ স্থাপিত করা হলো। এই কাজে স্থাপত্যবিদদের পরিকল্পনা সঠিকমতো বাস্তবায়িত হলো। সব সময় নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকারীদের সজাগ রাখা হতো। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করত। নিয়মিত ধৌত করত।

অতিপ্রাকৃতিক মিথরা মন্দির সঠিকভাবে চিনতে যেন কারো কোনো সমস্যা না হয় সে জন্যই এ ব্যবস্থা। মিথরা মন্দির রাজধানী থেকে বহু দূরে।

যে কেউ রোমে ভ্রমণ করলে একটা জিনিস দেখতে পাবে সর্বত্র। বন্দরে নগরীর চারপাশে প্রচুর পরিমাণে মিথরা মন্দির রয়েছে।

রোমান পৌত্তলিকতাবাদ শত বছর ধরে প্রচলিত, ফলে এই মন্দির থাকায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। নগরীর শেষ প্রান্তে রোমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাম্রাজ্যের দালানকোঠা, ঘরবাড়ি মিথরাসের কল্যাণে টিকে ছিল। সম্ভবত তারা তাদের দাসদের কাছ থেকে ভালো কথা শুনতে পেয়েছিল এবং তা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজকের ইতালির রাজধানীতে একটাও মিথরাসের মন্দির নেই; বরং তা লন্ডন নগরীতে পাওয়া যাবে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, লাতিন বিশ্বে ভ্রমণ করলেও মিথরাস দর্শন প্রচারিত হয়েছে। সভ্যতার শেষ স্তরে সীমান্তে যেখানে কিছুই নেই শধু রয়েছে বিপদ, বন্য পর্বতমালা, বরফ একদিকে শীত এবং অন্যদিকে অন্ধকার, এই হচ্ছে বর্বর জাতি-গোষ্ঠীর নিত্য চলাফেরার পথ, তারাও মিথরাস দর্শনে বিশ্বাসী

ছিল। বর্বর সীমান্তের একেবারে শেষ প্রান্তে হাড্রিয়ান দেয়াল, যেখানে তিরিশ শতকের পারনিসাস দেবতার মূর্তি রয়েছে।

সম্রাট হাড্রিয়ান ১২২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন ভ্রমণের পর এই বিশাল দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। রোমানরা এই দেয়াল নির্মাণ করেছিল নিরাপত্তার সঙ্গে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। পনেরো ফুট লম্বা এবং দশ ফুট প্রশস্ত। প্রশস্ত দীর্ঘ করার কারণ একটাই, তা হচ্ছে যুদ্ধের সময় এই দেয়ালের পাশে অবস্থান নিতে নিরাপত্তা এবং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। দেয়ালটি প্রসারিত ছিল পুরো রোমজুড়ে। ৭৩ মাইল দীর্ঘ এই দেয়াল। নগরীর পশ্চিম এলাকা বোনেস থেকে এবং পূর্বে ওয়ালব্রন্ডের টাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রসারিত এই দেয়াল।

এটা শুধু যে একটা দেয়াল তা নয়, কারণ এর দ্বারা রোমানদের ঐতিহ্য ফুটে উঠত। এটা যেন রোমানদের দুর্গ। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে দেয়ালের অভ্যন্তরে গোলা নিক্ষেপের জন্য ছিদ্রপথ তৈরি করে রাখা হয়েছিল। অতীত এবং বর্তমান সময়ের প্রকৌশল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এবং এর যে নকশা তৈরি হয়েছিল তা করা হয় স্থাপত্যবিদ পুটোরিয়াস নিপোস এবং সম্রাটের নিজ তত্ত্বাবধানে।

এই প্রকল্প যে পুরো মাত্রায় অবাস্তববাদী ছিল তা সময়কালেই প্রমাণ হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে পুনরায় নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নকশা প্রণয়নের কাজ চলেছে ছয় বছর ধরে এবং সেইসঙ্গে দেয়াল নির্মাণকাজ হয়েছে। দেয়ালের অভ্যন্তরে নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছিল।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ২০ ফুট প্রশস্ত এবং দশ ফুট গভীর সেইসঙ্গে ২৪টি পিলার উভয় পাশে ৩০ ফুট গভীর করা হয়েছিল। এর জন্য খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এদিকে দেয়াল নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পাওয়া এবং দীর্ঘ সময় ক্ষেপণের কারণে সম্রাট হাড্রিয়ান গভর্নর নেপোর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হন। তাকে বরখাস্ত করেন। ইতিহাসবিদ কিপলিং তার 'পাক অব বুক হিলস' গ্রন্থে লেখেন কী কারণে এই দীর্ঘ দেয়াল তৈরি হয়েছিল। তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সবই অস্বচ্ছ দেয়ালের রোমান পার্শ্বে পুরোটাই সুবিস্তৃত ছিল। বাকি অংশ ছিল খুবই সরু। এটা হতে পারে, দেয়ালের পুরো পরিসরটাই রোমান অংশে, যদিও এই দেয়ালের পুরো অংশ কেউ কখনো ঘুরে দেখেনি।

সেটা বাস্তবিক অর্থে সম্ভব নয়। দেয়ালের পার্শ্ববর্তী অভ্যন্তরে গ্যারিসন নগরী রূপে পরিণত হলো। ব্যাপকভাবে নগরীর প্রসার ঘটতে লাগল। বার, খাবারের দোকান, পতিতালয়, ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক নগরী এবং শরণার্থী

শিবিরের অনুসারী অর্থাৎ প্রতিটি শ্রেণী পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বাস করতে থাকে। এখানে এই নগরীতে সামরিক কর্মকর্তারা যোগ দিতেন এবং তারা এখানে আনন্দ উপভোগের জন্য মিলিত হতেন।

এ ছাড়া সাধু সন্ন্যাসী এবং ধর্ম উপাসকরা স্বর্গীয় উপাসনায় মিলিত হতেন। এর অন্যতম কারণ ছিল রোমান সৈন্যরা ছিল মানসিকভাবে বাজে প্রকৃতির, তাদের স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল না, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকেই বাড়ি থেকে বহুদূরে নিরাপত্তার জন্য বাস করত। কিন্তু তারা এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হলো, যেখানে বর্বরদের প্রাধান্য বেশি।

বর্বরদের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রার্থনা করলেন। এই অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলতে একমাত্র ঈশ্বরের প্রার্থনা এবং তার সাহায্য বোঝানো হয়েছে।

তৃতীয় শতাব্দীতে মিথরাস ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। দেয়ালের পাশেই মিথরাসের তিনটি মন্দির পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, আরো অনেক মন্দির ছিল। ব্যাপক ভূমিধস, ভূগর্ভস্থ ক্ষতি এবং বৃষ্টিতে তা ভেসে গেছে। দুর্গের সবচেয়ে সন্নিকটের সেরা মন্দিরটি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

মন্দিরটির নাম ছিল ব্রোকোলিটা। বর্তমানে এটির নাম কারাবোর্গ। এইখানে নির্মিত প্রথম মন্দিরটি ছিল আয়তনে ছোট। পরবর্তী সময়ে বড় পরিসরে মন্দিরটি তৈরি করা হলো। তাও একবার নয়, দুবার।

মিথরাস ধর্ম অনুসারীরা যেন মন্দিরে এসে ঠিকমতো উপাসনা করতে পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এসব তথ্য নিউক্যাসল জাদুঘরে রাখা আছে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

কারাবোর্গ এলাকা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই করা হয়েছিল। অ্যালুসেস সেতুর দিকে এগিয়ে চলেছি। সে সময় এটাকে নিউক্যাসল সেতু বলা হতো। সম্রাট হাড্রিয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানার্থে এ নামে ডাকা হতো।

নিউক্যাসল থেকে হেক্সাম পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাইল ট্রেনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এমনকি রোমান সীমান্তবর্তীয় দেয়াল থেকে কারাবোর্গ পর্যন্ত হাঁটতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মিথরাস ধর্মের প্রাচীন কিছু হেঁটে হেঁটে দেখব। যেন একটা আনন্দঘন মন তৈরি হবে। কিন্তু সব স্বপ্ন এবং ইচ্ছা পূরণ হয় না। কারাবোর্গ মন্দিরের কাছে যতই এগোতে থাকলাম, আবহাওয়া ততই বিরূপ আচরণ শুরু করল। প্রচণ্ড বরফ আর তুষারপাত হচ্ছে।

সামনে এগোনোর জন্য শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিচালক পর্যটক হিসেবে আমাকে তার ট্যাক্সিতে তুলে নিল। এই হাড্রিয়ান দেয়ালের পাশ দিয়ে প্রচুর ট্যাক্সি চলে। বহু বছর ধরেই এ ব্যবসা চলছে। রোমান ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান এবং শিক্ষা রয়েছে আমার। তাই এ দেয়াল নির্মাণ এবং এর অপর পাশে কী ঘটেছে তাও জানা। এ সব কিছুই জানা নেই ট্যাক্সিচালকের। রোমান-ব্রিটেনের অংশে কী ঘটেছিল তা জানার কথাও নয় ট্যাক্সিচালকের।

ট্যাক্সিতে চড়ে মিথরাস মন্দির দেখতে যাচ্ছি। হঠাৎ ট্যাক্সিচালকের প্রশ্নে ঘোর কেটে গেল। আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করায় সে আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি কি বুঝতে পারছেন রোমে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং শৈত্যপ্রবাহ চলছে? তারা দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে রোমান শীতকালীন পোশাক আমদানি করেছে। শুধু তা-ই নয়, চারাগাছ আমদানি করা হয়েছে। এই চারাগাছ ব্রিটেনের নয়। উষ্ণ থাকার জন্য এই চারাগুলো চুরি করা হয়েছে।

ট্যাক্সিচালক গিভাউ জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ। টিনেসাইড এলাকা থেকে এসেছে। বহু প্রজন্মের হাত ধরে তার পরিবার এই এলাকায় এসছে। চালক বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, ঈশ্বরই জানেন তারা প্রকৃত অর্থে কোথা থেকে এসেছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে টিনেসাইড উচ্চারণে কথাগুলো বলল। তার ভাষা এবং কথা শুনে মনে হচ্ছিল স্ক্যান্ডেনেভিয়ান, বিশেষ করে ডেনমার্কের ভাষায় কথা বলছে। এই ডেনিশরা নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন শাসন করেছে। তবে চিন্তা বেশি দূর এগোতে দিল না ট্যাক্সিচালক।

কল্পনা করার কোনো অবকাশ রাখল না। যখন জার্মানি দখলদার গোষ্ঠী এসে পড়ল তখন থেকেই রোমান-ব্রিটিশ দুই পক্ষই হতাশ হলো। জার্মানি দখলদার বাহিনী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরেই থাকত। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না। এই দ্বিমুখী অবস্থার জন্য মাঝখানে কাজ করেছে ইংরেজ বাহিনী। এমনকি এই দায়িত্বে রোমান-ব্রিটিশদের মিশ্রণ ছিল। আবার উপজাতি-গোষ্ঠী সমন্বয় এবং মৌলিকত্বে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগ সূত্র ছিল। সৈনিকদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য রোমান সীমান্তবর্তী এই দেয়ালের কাছে এসে স্থায়ী বসত গড়েছিল। যেহেতু রোমাননীতি ছিল, তাই তাদের দেশ থেকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিল। এটা করা হয়েছিল সাম্রাজ্য থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখার জন্য।

ট্যাক্সিচালকের কথা মন ভরে শুনছিলাম। সে সময় আমরা পার হচ্ছিলাম সারমাথিয়ান দ্বীপ। এই স্থানে বাস করত ইয়া জিজিয়াগ। এই উপজাতি এসেছে ইরান থেকে। দানিয়ুব পেছনে রেখে তারা সারমাথিয়ানে চলে আসে।

শেষ পর্যন্ত তারা পরাস্ত হয়েছিল সম্রাট মার্কাস অরলিয়াসের বাহিনীর কাছে। কিন্তু এই দ্বীপ দখল করে বড় ধরনের সংকটে পড়েছিলেন সম্রাট মার্কাস।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সম্রাট মার্কাস আট হাজার সৈন্য নিয়োগ করেন এবং ব্যাপক অস্ত্র সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। সাম্রাজ্য শক্তির আরো পাঁচ হাজার সৈন্য ব্রিটেন থেকে রোমান সীমান্তবর্তী দেয়ালের কাছে নিয়ে আসা হয়। তারা আর কখনো বাড়ি ফিরে যায়নি। চিরস্থায়ীভাবে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরল উপত্যকায় বসতি গড়ে তোলে। স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী নিয়ে প্রায় ১৫ হাজার নাগরিক সারমাথিয়ানে বসবাস করে। এই ভূমিতে জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল না। তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে।

এই সীমান্তবর্তী দেয়ালের কোথাও জরাথ্রুস্ট ধর্মের সন্ধান মিললে ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইরানি জনগোষ্ঠী, যারা মিথ্রাসকে ঈশ্বর মনে করে, ইরানে এই ধর্মের জনপ্রিয়তা এবং প্রসার সবচেয়ে বেশি, তাকে নিয়ে বাস্তবে কী চিন্তা করে। এ কথা শুনে ট্যাক্সিচালক কিছুটা বিরক্ত হলো।

সে বলল :

> *'রোমান সৈন্যরা নিজ ভূমি থেকে বহু দিন ধরে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তারা যা বিশ্বাস করে সেটা মনে-প্রাণেই করে। দুজনে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম মিথ্রাসের তাম্র মূর্তি। পাশ দিয়ে সেলটিক ঝরনা।'*

রোমানরা এই ঝরনার পাশে এসে মুদ্রা নিক্ষেপ করে এবং নিজের প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো যারা এই ঝরনার কাছে এসে পয়সা নিক্ষেপ করে এবং প্রার্থনা করে তারা পরোক্ষভাবে যেন এই দেয়ালের পার্শ্বে শপিং মলের উন্নয়নে সাহায্য করছে। আর এই ঝরনার থেকে পাম্পের লাইনে মুদ্রা এত জমে যায় যে, পরিষ্কার করতে লোক নিয়োগ করতে হয়। এই অর্থ দিয়ে সামাজিক কাজকর্ম হয়। আমার কথা শুনে ট্যাক্সিচালক বেশ উৎফুল্ল হলো।

মধ্যযুগে সারমাথিয়ানদের অবদান এবং গোথিক কৌশল, সেইসঙ্গে রাজা আর্থারের যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভূমিকা–এ সবই তাকে আনন্দ দিল। রাজা আর্থার ছিলেন ব্রিটিশ-রোমান যুদ্ধের প্রধান সেনানায়ক। তিনি ভেবেছিলেন, ইরানের যোগসূত্র থাকতে পারে এই যুদ্ধে। স্থানীয় সংস্কৃতিতে এর প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হত। ব্রিটিশ-রোমান যুদ্ধে আর্থারের মৃত্যু হয় এবং এই সীমান্তবর্তী কোনো স্থানে পুড়িয়ে ফেলে দেয়া হয়।

মৃত্যুর আগে রাজা আর্থার তার ইচ্ছার কথা জানিয়ে যান। রোমান দুর্গের কাছে বাড়ির সন্নিকটে এই দুর্গের গভীর গর্তে চলে যান তিনি। গভীর গর্তে ক্রোলিং করে টানেল পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেন। এই টানেল পাড়ি দিতে গিয়ে হাতে লেখা একটি চিঠি দেখতে পেলেন। কুড়িয়ে নিলেন কাগজটি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন তাতে লেখা আছে : 'আমাকে এক গ্লাস মদ দাও। মদে ডুবিয়ে রাখো।' হঠাৎ করে নিজের পকেটে হাত দিয়ে নিউক্যাসল ব্রাউনের একটি মদের বোতল বের করলেন রাজা আর্থার।

টানেলের গভীরে যেখানে পাহাড়-পর্বতের মতো ঘেরা সেগুলো সব যেন শূন্য। পর্বতের চারদিকে খুলে যাচ্ছে। আর সেখানে রাজা আর্থার ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অদৃশ্য থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো : 'তুমি আমাকে মদ পান করাতে চেয়েছিলে। খুবই বাজে ব্যাপার।'

রাজা আর্থার বললেন : এটা তোমার জন্য খারাপ হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে মদ দাও তাহলে আমি এখান থেকে বের হওয়ার শক্তি পাব এবং ব্রিটেনকে বাঁচাতে পারব।

ব্রিটেনকে রক্ষা করবে? কার হাত থেকে? জানতে চাইল অদৃশ্য শক্তি।

রাজা আর্থার বললেন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের অপশক্তির হাত থেকে।

প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আকাশ ভেঙে যেন সব বরফ এই কারাবোর্গ মন্দিরে পড়বে। ঝোড়ো বাতাস বইছে। গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় রয়েছে। স্থির হয়ে আছে গাড়িগুলো।

নিউক্যাসল থেকে কার্লাইল সড়ক পর্যন্ত বরফে ঢেকে রয়েছে। আমার জামার কলার যেন শুভ্র শুভ্র বরফে ঢেকে আছে। আবহাওয়ার এই বৈরি আচরণে জামার কলার দিয়ে কান ঢেকে রাখলাম।

ট্যাক্সিচালককে থামানোর চেষ্টা করলাম। ফুটপাথ খোঁজার চেষ্টা করলাম। কোথাও কোনো ফুটপাথ নেই। ব্রোকোলিটা দুর্গ থেকে সোজা সড়ক চলে গেছে মাইলের পর মাইল। সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ফসলি জমি। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি।

বহু দূর পাড়ি দিয়ে একটা স্থানে এসে পৌঁছালাম। এখানে বেসামরিক জনগণের আবাসস্থলের সন্ধান মিলল। পুরো ভূমি ঢেকে রয়েছে নর্দানব্রিয়ান সুরল্যান্ডের সাদা দালানে।

কিন্তু মিথরাসবাদ বা তার জাদুঘরের বা মন্দিরের চিহ্ন কোথাও পেলাম না। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চোখে পড়ল না, যতক্ষণ না মাটির নিচে তাকিয়ে দেখলাম। হঠাৎ করে বরফময় সড়কের এক পাশে দেখলাম কাদামাটি উঠে আসছে। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে, দুর্গের সন্ধান পেলাম। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে

এগোতে থাকি। কচুরিপানার মতো ঢালু এলাকা চোখে পড়ল। আর ঠিক তখনই বিধ্বস্ত মন্দির দৃষ্টিগোচর হলো। মন্দির দেখে অবাক হলাম।

মন্দির দেখেই বুঝতে পারলাম বহু দিন ধরে পড়ে আছে। আনুমানিক সাতশ বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পাথরের দেয়াল এবং মূর্তিগুলো অস্তিত্ব নিয়ে কিছুটা হলেও টিকে আছে। এ যেন পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দেয়া যে, মিথরাস ধর্ম এখনো টিকে আছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলো মূল ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ভূমি থেকে চার ফুট ভেঙে গেছে। পার্শ্ববর্তী প্লাটফর্মগুলো কোনোমতে টিকে আছে। এর মাঝেও তিনটি মূর্তি অস্তিত্ব নিয়ে যেন টিকে আছে। ধার্মিকরা এখনো উপাসনা করতে যথাসম্ভব এখানে আসে। এখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী এসে যেভাবে ধর্ম পালন করে তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

অনেকে নগ্ন হয়ে নাচ-গানকেই ধর্ম মনে করে। কেউ বা আবার সূর্যকে দেবতা ভাবে; কিন্তু তারা কেউই মিথরাসের দর্শন বোঝে না। এটাও একটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবত ব্রোকোলিটা দুর্গ এতটাই ঠান্ডা এবং উক্ত এলাকা থেকে বহু দূরে যে, কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। আজও এই দুর্গ নগরী থেকে বহু দূরে।

রোমানরা একের পর এক স্থান দখল করে নিয়েছে। তারাই ব্রোকোলিটা দুর্গ তৈরি করেছিল দুই বছর আগে। এটা হতে পারে, কারাবোর্গ মিথরাস জাদুঘরে শুধু রহস্যই নয়, খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দৃঢ়চেতা জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে, কত নিষ্ঠুরতা ঘটেছে এই দুর্গের মাঝে।

গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এই দুর্গের মাঝে মিথরাস মন্দির এং মূর্তি যেন নীরব সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে। মন্দিরের মূল সড়কপথ চোখে পড়ল। মিথরাস যেন অজেয় ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

মিথরাসের প্রভাব, বিশেষ করে তার বাম হাতে যে প্রদীপটি ছিল তা যেন স্থির হয়ে আছে। এই প্রদীপ যেন সাধারণ ধর্ম পালনের থেকেও বেশি শক্তিশালী। স্থানীয় মিস্ত্রিরা আজও এই মূর্তি তৈরি করার সময় বাম হাতের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

রোমানরা এই শিল্পকলায় কোনো হস্তক্ষেপ করে না। কাজের ধরন অনুযায়ী এবং চিন্তা-চেতনায় মূল শিল্পকর্ম থেকে পার্থক্য হতে পারে। সেটা হয়ে থাকে বটে। এ সম্পর্কে যেসব প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া যায় তা একেবারে শিশুসুলভ মনে হতে পারে। মিথরাস রাজমুকুট পরে আছেন। তার সারা শরীরের সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। এই সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে মূর্তির ডান প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। তার দুই হাতে প্রদীপ জ্বলজ্বল করছে।

সূর্যরশ্মি তার আলো ছড়াতে পারছে না। এই দৃশ্য দেখলে মিথরাস সম্প্রদায় আশ্চর্য হয়ে যায়। ফলে এটা বোঝা খুবই মুশকিল যে, মিথরাস ধর্মবিশ্বাসীরা এই দুর্গে আসার পর প্রকৃত অর্থে কোন ধর্ম পালন করে। তারা কি সূর্য শক্তিকে পূজা করে, নাকি মিথরাসকে মান্য করে? তবে যেহেতু এরা সাধারণ মানুষ তাই তারা এসব নিয়ে ভাবে না। বরং কিছু সময়ের জন্য মন্দিরে এসে বাইরে অবস্থান করে, মদপান করে এবং হাসি-তামাশা করে সময় কাটায়।

মিথরা ধর্মের ভাবনা নিয়ে একজন এই আদর্শে বিশ্বাসীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমার ধ্যান-ধারণা তার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করলাম। সাধু জাস্টিন মাটিয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে ধ্যান-ধারণা দিয়েছিলেন সে কথাই যেন বলা হচ্ছে। হঠাৎ করেই এ উপলব্ধি হলো যে, এই মন্দিরের অভ্যন্তরে এবং মূল পর্ব এবং এর টেবিল বা স্তর দেখতে পেলাম। যেভাবেই দেখা যাক না কেন, রোমের সামরিক বাহিনী মনে করত তারাই সঠিক পথে এবং মূল আদর্শে রয়েছে। দুর্গের স্থানে স্থানে ভূমি বিক্রেতাকে দেখা গেল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল সৈন্য, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, দাস এবং শ্রমিক। রোমানদের নিজস্ব আইন-কানুন বেশ জবাবদিহিমূলক।

তাদের ঘরবাড়ি বেশ পরিষ্কার। নিজস্ব বাসাবাড়িতে নারীরা চেয়ারে বসে আর পুরুষরা মাটিতে। ক্ষমতা এবং প্রভাব বোঝাতে একটা নিয়ম মানে–সেটা হচ্ছে নীচু শ্রেণীর কেউ দেখা করতে এলে তাকে বসার অনুমতি প্রদান করে। দাসদের হেলান দিয়ে বসার কোনো অধিকার নেই। সেভাবে তারা খাবার গ্রহণ করতে পারবে না।

মিথরাস ধর্মবিশ্বাসীরা অবশ্য রাতের খাবার গ্রহণের সময় তা বেশ সুষ্ঠুমতো ভোগ করত। তারা আরাম-আয়েশে বসত। গুণগত মান এবং মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করত এবং সেভাবে কাজ করত। বর্তমান সময়ে দেখা যায়, কোনো ধর্মীয় উৎসবের পর ইহুদিরা, যারা রোমান সময়ে তাদের ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত তারা খাবার পরিবেশন করে এবং খানা সম্পন্ন করে দাঁড়িয়ে।

এক শিশু হঠাৎ করে প্রশ্ন করল, কেন তারা এটা করে? এ প্রশ্ন তার মতো অনেকের, যদিও এর সঠিক কোনো উত্তর নেই। আরমানিক জাতি-গোষ্ঠীর একজন এর উত্তরে বলেছিল :

'আজ আমরা দাস। আগামী বছর মুক্ত হব।'

মিথরাসের বিশ্বাসী এবং পূজা অর্চনাকারী, চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত পৃষ্ঠপোষক, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সাহস, সততা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছ লেনদেন, সৈন্যদের বিশ্বাসী

এবং বিশেষ বস্তু, খুচরা বাণিজ্য কর্মী, মুক্ত মানুষ, দাস, মুক্তচিন্তার মানুষ, সাম্যতা—এ সবই করা হতো আগামীর চিন্তা করে।

পরিত্যক্ত মন্দিরের দিকে তাকালে একটা বিষয় চোখে পড়ত, চারিদেকে হতাশা এবং দুঃখ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে রহস্য যেন ছড়িয়ে রয়েছে। বাস্তবিক অর্থে আমাদের কোনো ধারণা নেই এই মন্দিরে কে রোমানদের আশ্রয় দিয়েছিল। ফলে এটা খুব সহজ ছিল যে, তাদের পূর্ব দখলদাররা তাদের মানবতা এবং আবেগ দিয়ে সব কিছু জয় করেছিল। কিন্তু এই ব্রোকোলিটা দুর্গে মিথরাসের অনুসারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিল।

কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় ঘটেছিল। কিছু ধর্মীয় যোগসূত্র ঘটেছিল। ধর্মীয় উপাসকদের যোগাযোগ, একই সময়ে খুব অন্তরঙ্গ হওয়া আবার দূরত্ব রচনা করা, এর ফলে মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মিথরাসবাদে বিশ্বাস যেন হারিয়ে গেল।

পরিত্যক্ত হলো মিথরাস ধর্ম। এ কথা সবাই মানে, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস একটি নিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের যেখানেই শেষ, সেখান থেকেই রহস্যময় শুরু। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভাষ্য মতে, মিথরাস মন্দির সর্বত্র পতন হয়েছিল অব্যবহারের কারণে। চতুর্থ শতাব্দীতে এর পতন এবং ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, এই ধর্মে বিশ্বাসীরা অনেকেই অন্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যদিও এর উদাহরণ যৎসামান্যই। এর সাক্ষ্যপ্রমাণও খুব কম। এই সময়ে নবধর্মে দীক্ষিত খ্রিষ্টবাদীরা মিথরাস অনুসারীদের আক্রমণ করল। পরিণতি ঘটল একটাই—মিথরাস ধর্মের পতন।

ওয়াল্ব্রুক কর্তৃক লন্ডনে মিথরাসবাদ সংস্কারপদ্ধিতে রূপ নেয়। এই ধর্মের গোপনীয়তা এবং প্রভাব সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হতো। মিথরাসবাদীরা মূর্তি মেঝেতে পুড়িয়ে ফেলেছিল। একটা সময় পর্যন্ত বাকুসের মন্দির হিসেবে এটা ব্যবহার হতো। বাকুস হচ্ছে একই সঙ্গে মদ এবং ভালো অনুসারীদের মন্দির।

বাকুসের দর্শনে বলা হচ্ছে, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে আমি নতুন জীবন দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীতে সাইরাসের ধর্মযাজক উল্লেখ করেন, এই স্রষ্টার কথা আজও রহস্যময়। বাকুসের মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় মন্দিরের এক কোণে। পঞ্চম শতাব্দীর মন্দিরটি এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। বছরের পর বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার ফলে ছাদ ধসে গেছে। দেয়ালে গাছ, ঘাস জন্মেছে। রোমান সময়ে যে মন্দির বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তা আজও

যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইংলিশ ঐতিহ্য স্যাক্সন সময়কালে এই মন্দির দৃশ্যপাত হয়। কিন্তু কারাবোর্গে মিথরাস মন্দির অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। অনেকের ধারণা ছিল, খ্রিষ্টধর্ম সম্প্রদায় অথবা স্থানীয় ব্রিটেনবাসী মিথরাস মন্দিরে হামলা করতে পারে। যদিও এই ধারণা কারো কাছেই পরিষ্কার ছিল না। সাবেক ধর্ম চিন্তাবিদরা বা সাধু সন্ন্যাসীরা মিথরা মন্দির ধ্বংস করতে চাননি। খুব অল্পসংখ্যকই ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একটা বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের যে দর্শন তা অনেকটা মিথরাস ধর্ম দর্শনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। স্বাধীনতা, সাম্য এবং ঐক্য–এই দর্শন নিয়ে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল।

খ্রিষ্টধর্মের প্রধান দিনেই মিথরাসের উদ্ভব ঘটেছিল। মিথরাস হচ্ছে অজেয় সূর্য। তার জন্ম হয়েছিল শীতকালে। যখন সূর্যের তেজরশ্মির তীব্রতা কম ছিল। এ সময়টা হতে পারে ২১ অথবা ২২ ডিসেম্বর। এ দিনের পরের থেকে সূর্যরশ্মির তীব্রতা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে তেমন কোনো উদ্‌যাপন না হলেও তার জন্ম তারিখ এবং সময় নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানা যায় না।

চতুর্থ শতাব্দীতে মিথরাস ধর্মের অধঃপতন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে মেধাবি এবং প্রজ্ঞাবানরা বিশ্বাস করে, পুরনো এই ধর্মের প্রতি আধিপত্য দখল করল খ্রিষ্টরা। এখানে সর্বোপরি সূর্য দেবতার জন্ম এবং অজেয় সূর্যের জন্ম একই দৃশ্যপটের আবর্তনে আবর্তিত।

স্থাপত্যবিদদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মিথরা দর্শন এবং গির্জাতেও ব্যাপক প্রচার হয়েছে। প্রাচীন ঈশ্বরে মতবাদ এবং বিশ্বাস নিয়ে যত তর্কই থাকুক না কেন, সবাই ধর্মের প্রতি নরম ছিল। মিথরাস ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসে কিছুটা হলেও গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল বিশাল সরু আকৃতির জাহাজটি, যা প্রাক পূর্ব ইউরোপে একই কাঠামোতে তৈরি হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল মিথরাস আদর্শবাদীদের জাহাজে বিপদের সময় স্থান দেয়া।

ইউরোপীয় সংস্কৃতি নিয়ে আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। এটা সম্ভব হয়েছিল মিথরাসবাদের প্রভাবের কারণে। ঐতিহাসিক ফ্রাঞ্জ কুমন্ট বিশ্বাস করেন, হাজার বছরের সমস্যা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস, সেইসঙ্গে জোতির্বিদদের চিন্তা-চেতনা এক কাতারে মিশে গেছে। কিন্তু এটা সত্য যে, মিথরাস ধর্ম এবং দর্শন ইউরোপীয়দের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল।

ছয় হাজার ফুট দৈর্ঘ্য নমরুদের লাশ তাওরাস পর্বতমালায় শায়িত অবস্থায় রয়েছে। তাওরাস পর্বতমালা দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের ইউফ্রেটিস নদীর

উপত্যকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই এলাকা ধর্মের নিয়ম পালনের জন্য অসাধারণ স্থান। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজা প্রথম অ্যান্টিকস পর্বতমালার চারপাশ থেকে সব কিছু পরিষ্কার করতে থাকেন। এ সময় মহামতি আলেক্সান্ডারের উত্তরসূরি হেলেনসিক এই স্থানকে পবিত্র করে তুললেন। তিনি জানালেন, এটা হবে ঈশ্বরদের থাকার স্থান।

এই স্থানের সঙ্গে কোনো কিছুর সামঞ্জস্য হতে পারে না। এখান থেকে মূর্তিগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাস থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে যাওয়ার পথ রয়েছে। এই নির্দেশদাতা ছিলেন রাজা প্রথম অ্যান্টিকস। জরাথুস্ট ধর্মের প্রসার হয়েছে এখান থেকেই। এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থ ভূমিকা রেখেছে মিথরাস ধর্ম। মিথরাস ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। একটা বিষয় দেখলে সবাই অভিভূত হয়, মিথরাস এবং অ্যান্টিকস করমর্দন করছেন। এটা যেন জরাথুস্ট বিশ্বাসীদের ধর্মান্তরিত করার এবং স্বর্গীয় ঈশ্বর থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা।

ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার অধঃপতনের ফলে–রোমেরও পতন নেমে এলো। চতুর্থ শতাব্দীর প্রক্কালে রোম সাম্রাজ্য শাসন করতেন তিনি। তাকে ইউরোপের সর্বযুগের সেরা সম্রাট হিসেবেই মেনে নেয় হয়েছে। এই সময়ে রোমের সৈন্যরা মাঠে সমবেত হতো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। কিন্তু এ সব কিছুরই একটা শেষ আছে। তাদেরও পতন হলো। একই অবস্থা ঘটল ব্রিটেন প্রদেশে। ৪১০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হনোরিয়াস সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেন। একই সঙ্গে তিনি নির্দেশ দেন, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী যেন তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। ৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কেন্টে পৌছান প্রথম রোমান সম্রাট। শুরু হলো ইংরেজ ইতিহাসের নতুন যুগের। এরপর ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির উপজাতি-গোষ্ঠীর প্রধান রোমান সম্রাটকে বিতাড়িত করেন।

একটা বিষয় ভাবতে বেশ অবাক লাগে, ব্রিটেনে নেহায়েত এবং সম্ভবত সর্বত্রই লাতিন সভ্যতার ধারাবাহিকতা আরো শত বছর বৃদ্ধি করেছিল। তবে এই সময় রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোতে মিথরাস ধর্ম দর্শন থেকে মানুষ খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাহলে কি এই প্রশ্ন উঠছে যে, মিথরাস অনুসারীরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে? তার পক্ষে কি ধর্মের সত্যতা এবং সাফল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়? মিথরাসবাদ এবং এই ধর্ম যেন খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। অস্তিত্বের সংকটে পড়ল। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস যেন গণহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি ব্রিটেনে যেন সুন্দরভাবে এবং দৃঢ়তায় খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস

প্রগাঢ় হলো। মিথরাস ধর্মের প্রতি অনাস্থা এসে পড়ল। সারা ব্রিটেনে গির্জার ধর্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পেল। এই প্রসারতায় একাদশ শতাব্দীতে ওয়েলসেও খ্রিষ্টধর্মের প্রচার হলো। অবস্থাটা এমন দাঁড়ল যে, মিথরাসবাদ যেন পুরুষদের ধর্মের পরিণত হলো। পুরুষরা মন্দিরে গিয়ে মিথরাকে পূজা অর্চনা করত আর খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা, বিশেষ করে নারীরা এই ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব নিল।

চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম খ্রিষ্টান উল্লেখ করেন। ফলে পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসীরা যে নিজেদের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে যাচ্ছে তা পরিষ্কার বুঝে গেল। খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা অন্য ধর্ম এবং বিশ্বাসীদের বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারত না। এ জন্য বহু রক্তপাত হয়েছে উভয় পক্ষের মধ্যে।

ঐতিহাসিক নোয়েল সোয়েরডলের মতে, একটি সম্ভাব্য কারণে মিথরাস ধর্মবিশ্বাসীরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তিনি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন : মিথরাসবাদ পুরোটাই রহস্যময়। মিথরা ধর্ম নিয়ে গির্জায় প্রধান ধর্মযাজকের নীরবতা প্রমাণ করে, এই ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ। অবস্থা এমনই যে, দুই ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ-লড়াই শুরু হয়নি। কোনো ধর্মযাজক এই বোকামি করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেননি। খ্রিষ্টধর্মের কোনো শীর্ষ কর্তৃপক্ষ বা শাসকগোষ্ঠীর কেউই মিথরাস ধর্মবিশ্বাসীদের তাদের ধর্ম ত্যাগের কথা বলেননি। তারা শুধু এটুকু বললেন যে, ঈশ্বরের নিজস্ব শক্তি নেই, তার অস্তিত্ব বেশি দিন থাকে না। সম্ভবত নোয়েল সোয়েরডল এটাই বলতে এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন খ্রিষ্টধর্ম এবং মিথরাসবাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কখনোই কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়নি। বরং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যা দেখা গেছে তা হচ্ছে, দুই ধর্মের আদর্শবাদীদের মধ্যে মিল ছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, মিথরাসবাদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল খুবই কম আর সে কারণেই এই ধর্ম তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধর্ম কিছু উপাখ্যানের ওপর ভিত্তি করে টিকে ছিল। যেমন টর্চ, চাবি, টুপি, সৌরজগৎ-এ সবই এই ধর্মের উপাখ্যানের অন্তর্গত। অন্যান্য ধর্মের মতোই সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ভাষায় যেমন বর্ণনা করে তেমনি মিথরাস ধর্মের একই ঘটনা ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে তাই আকর্ষণীয় সমাধান দেয়া গেছে। রহস্যময় নাম বা কোনো ধর্মের ব্যাখ্যা না চেয়ে প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে মেনে নিয়েছে। তারা ভুলেও গেছে যে, এই উপাখ্যান ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল কি না। হঠাৎ করেই সামাজিক নিয়ম-কানুন থেকে এগুলো যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসীরা বলে পৌত্তলিকবাদের বিরুদ্ধে তাদের যে বিজয়, তার একমাত্র কারণ তাদের ধর্ম সত্য, অন্য সব মিথ্যা। ধারণা করা যায়, যিশুর প্রতি বিশ্বাস, তাকে ঈশ্বরের

পুত্র হিসেবে মেনে নেয়া–এটা এক অর্থে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে আরো জোরালো করল। এই ধর্ম মহান হতে শিক্ষা দেয়। ইহুদিদের ধর্মের প্রতি উন্নাসিকতা এবং একের পর এক নবী-রাসুলকে অমান্য করার কারণে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। ইউরোপের খ্রিষ্টধর্মের প্রচার এবং প্রসার একেবারে শুরু থেকেই হয়েছে। ইউরোপে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে এই কারণে যে, বিভিন্ন ঘটনাগুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে কল্পকাহিনী বা উপাখ্যান নয়, বরং বাস্তবতার ছোঁয়া ছিল। ইতিহাসে যা ঘটেছে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হতো তা হচ্ছে–তাদের ঈশ্বরের বা প্রভুর গল্পকাহিনী, বিশেষ করে গ্রিক এবং লাতিন সাহিত্যে বহু বীরত্বের কাহিনী এবং অলিম্পিয়া পর্বতমালায় স্বর্গীয় দেব-দেবীদের বাসস্থান সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হতো। মিথরাস ধর্মে বহু কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। ষাঁড়ের জন্য আত্মত্যাগ এবং সূর্যদেবতার সঙ্গে উপবাস পালন–এ সবই ছিল বীর মিথরাস ধর্মে বিশ্বাসীদের মনোকথা। কিন্তু এ কথা কখনোই কেউ বলতে পারেনি, কখন এবং কোথায় এসব ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের ঈশ্বর ঠিকমতোই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। এই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, যার কাছে অন্য ধর্মের বিশ্বাসীরা টিকতে পারেনি।

নতুন রোমান ধর্ম এবং এর সঙ্গে ইরানের পৌত্তলিকতাবাদের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে লৌহমানবের মতো বিজয় অর্জিত হয়েছে। ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রচার হয়েছে মূলত ইহুদিদের দ্বারাই, আবার তারাই ঈশ্বরের সব নির্দেশ সবচেয়ে বেশি অমান্য করেছে। এর ফলে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী এবং অনুসারীরা একক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা এই পৃথিবী যত দিন সৃষ্টিশীল থাকবে তত দিনে টিকে থাকবে। এ কথা কারো জানা নেই, রোমান মিথরাসদের সঙ্গে ইরানীয় মিথরা ধর্মগোষ্ঠীর কী ধরনের যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল। এ কথা শুধু জানা যায় যে, ইরানিরা প্রশ্নাতীতভাবে প্রথম বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে।

৬.
শেষ সময়

আলেক্সান্ডারের বিজয়

মধ্যপূর্বাঞ্চলের অ্যান্টিকুইটি নগরীর পিঙ্গল বর্ণের পাহাড়ি ঢালু পথে হেঁটে বেড়ালে আশ্চর্য রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হবে। প্রাচীন এই নগরীর সব কিছু পরিদর্শন করতে হলে পরিদর্শক প্রয়োজন হবে। আর সেই পরিদর্শক যদি প্রাচীন আমলের প্রত্যক্ষদর্শীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি হন তাহলে অতীত ইতিহাস এবং এই নগরীর চার হাজার বছরের অতীত ঐতিহ্য বর্ণনা করতে থাকবেন। সেই সুপ্রাচীন আমল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অবলীলাক্রমে বর্ণনা করে যাবেন তিনি। আর যদি কোনো অনভিজ্ঞ নির্দেশক সঙ্গে নিয়ে নগরী ঘুরে বেড়ানো হয় তাহলে তিনি কোনো কিছুই বর্ণনা করতে পারবেন না। তার পক্ষে বলাও সম্ভব নয়। পুরো নগরী ধূসর বর্ণের। এই নগরীর রাজপ্রাসাদ, অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির, অফিস, দোকানপাট, এমনকি সাধারণ মানুষের বাড়িঘর–সবই যেন ধূসর এবং কাদাটে ইটের মতো। বালুর সারি অপসারিত হয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই পোড়ামাটির ঘরবাড়ি এবং রাজপ্রাসাদ খুঁড়ে অনেক গভীরে গিয়ে বাস্তবতা বুঝতে চেয়েছেন যে, এর প্রকৃত মাটি আসলেই কেমন। দেয়ালগুলোও যেহেতু ইটের তৈরি ফলে এগুলো পুরোমাত্রায় ধূসর। জানালা-দরজা কাঁধ পর্যন্ত উঁচু। সড়কগুলো সব একমুখী। মেরি সেলেস্তে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলেছে রাস্তাগুলো। এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলে দেখা যাবে কেউ ঘুমাচ্ছে অথবা খাচ্ছে অথবা বসে গল্প করছে। নিজের মনেই প্রশ্ন জেগে উঠবে সব কিছুই অন্তঃসারশূন্য এবং বহু প্রাচীনকালে মারা যাওয়া অধিবাসীরা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। এই ভূ-ভাগে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া মার্বেল এবং পাথর, কোথাও কোথাও শুষ্ক পাথরের দেয়াল এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সন্নিবেশিত রয়েছে।

মেডেস এবং পারস্যের প্রথম রাজধানী প্রাচীন একবাতানা। আধুনিক যুগে হামাদান নগরী। এই নগরী ছিল তেহরানের ২০০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে।

এই নগরী ঘুরে দেখার জন্য আমি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের শরণাপন্ন হলাম। তার মাধ্যমে জানতে পারলাম, মেডিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডিওসেস। তিনিই এই শক্তিশালী এবং সুরম্য দেয়াল তৈরি করেছেন নিজের জন্য। সেই দেয়ালকে এখন একবাতানা বলা হয়। এর একটি অংশ ভেতরে, অন্যটি বাইরের দিকে। দালান এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, দেয়ালের প্রতি বৃত্তাকার অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু। প্রতিটি দেয়াল তৈরি করা হয়েছে যুদ্ধের দুর্গ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। ফোকরবিশিষ্ট এই প্রাচীরগুলোর একেকটি একেক রঙের। প্রথম প্রাচীরের রং সাদা। দ্বিতীয়টি কালো, তৃতীয়টি লালচে, চতুর্থটি নীল, পঞ্চমটি কমলা। ফোকরবিশিষ্ট এই পাঁচটি বৃত্তাকার দেয়াল পাঁচটি রঙের নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ দুটি বৃত্তাকার দেয়াল ভিন্ন রঙে তৈরি হয়েছে। একটি রুপার, অন্যটি স্বর্ণের। এই দুটি বৃত্তাকার দেয়াল ডিওসেস নিজের জন্য তৈরি করেছেন। দেয়ালের অভ্যন্তর অংশে তার রাজপ্রাসাদ। সাধারণ মানুষের জন্য দেয়ালের বাইরে ঘরবাড়ি নির্মাণের নির্দেশ দিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল ধূসর রঙের। উজ্জ্বল পিঙ্গল রঙের দেয়ালগুলোর একবারে লাগোয়া অবস্থায় ছিল বাড়িঘর। পাশেই ছিল রাজপ্রাসাদ এবং সরকারি খাজাঞ্চিখানা। এ সবই তৈরি করা হয়েছিল জার্মান স্থাপত্যবিদ কার্ল ফ্রেইচের পরিকল্পনামতো। সুন্দর এই নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একাবাতান সড়ক। এই সড়কের পেছনে তাকালে আশ্চর্য হতে হয়। বর্তমানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে সব কিছুই যেন হার মানছে। প্রাচীন একবাতানা নগরী, যা বর্তমানে হামাদান নগরী নামে পরিচিত, তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচুতে। এই নগরীতে রয়েছে জার্গাস পর্বতমালা। শীতে প্রচণ্ড তুষারপাত হয়। এই সময় পর্বতের দৃশ্য জাদুর মতো মনে হয়।

অল্পসংখ্যক পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসে। বাস্তবিক অর্থে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। ইরানের বহু স্থানে প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে এবং সেসব স্থানে হাজারখানেক জাদুঘর রয়েছে। এসব জাদুঘর এবং ঐতিহ্যময় নগরী ভ্রমণে পারস্যের শুধু সাধারণ মানুষ নয়, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানপিপাসু মানুষ, প্রত্নতত্ত্ববিদ সবাই আসে। যদিও এই নগরী ভ্রমণের সময় আলেক্সান্ডারের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী জানতে পারবে অনেকেই। তিনিও এই নগরীতে এসেছিলেন।

একবাতান সড়কের পেছনে কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সড়ক শুধু সামনের দিকেই অগ্রসরমান। সড়কের প্রাণকেন্দ্রে ছোট ছোট গাছের সারি। সড়কের পাশ দিয়ে অফিস-আদালত, দোকান, দালান বাড়িঘর। গাছের

সারি আর দিগন্তজুড়ে মাঠ। বৃদ্ধরা বসে গল্প করছে, বসন্তের হালকা রোদে নিজেদের শরীর আরাম করে নিচ্ছে। কালো চা পান করছে অনেকেই। কেউ কেউ গল্প করছে। আবার এর ফাঁকে কেউ তসবিহ্ টিপছে। এ দৃশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ের সন্ধান মেলে। অবশ্য পাহাড় না বলে টিলা বলাই শ্রেয়। টিলাগুলো পুরো পরিবেশ বদলে দিয়েছে। কিছু স্থানে বাতি রয়েছে। মাঝেমধ্যে সিংহের প্রতিকৃতি দেখা যায়। হতাশ বদনে, একেবারে নিশ্চুপ নিথর অবস্থায় এগুলো পড়ে আছে। বর্তমানে ইরানিরা একে শের-ই-ঘামঝিল বা দুঃখ ভারাক্রান্ত সিংহ বলে। অনেকে এটাকে শের-ই-সাঙ্গি বা পাথুরে সিংহ নাম দিয়েছে। ইরানি জনগণের মতে, সিংহের মূর্তি ভাস্কর্য করা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ শতাব্দীতে মহামতি আলেক্সান্ডারের নির্দেশে। তিনি তার প্রিয় বন্ধু হেপাথিয়ানকে সিংহের ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য নির্দেশ দেন। হেপাথিয়ানকে অনেকেই অপছন্দ করত। প্রচুর মদপান করতেন। একবার আত্মহত্যার জন্য তিনি অতিরিক্ত মদপান করেছিলেন। এমনও কথা প্রচলিত আছে যে, তার শত্রুরা হত্যার জন্য মদে বিষ মিশিয়েছিল। হেকমাতানে পর্বতমালায় তিনি সিংহের ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। ইরানিদের বিশ্বাস, সিংহের ভাস্কর্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে আলেক্সান্ডারের নিজের বীরত্বের কথাই বোঝানো হয়েছে। তিনিই যেন এর প্রতিনিধি। সিংহ যেমন পশুদের রাজা, তেমনি ক্ষমতা এবং বীরত্বে সেরা মহামতি আলেক্সান্ডার। পার্থিয়ান সময়ে সিংহের ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছিল নগরীর প্রধান দেয়াল বাব-আল আসাদ বা সিংহ দুয়ার বলা হতো সেখানে। সিংহের ভাস্কর্য মূর্তি পরবর্তী সময়ে ভেঙে ফেলেন ইরান দখলকারী সৈনিক জিয়ার আর্দ আবিদ। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, সিংহের মূর্তি নগরীর প্রবেশদ্বারে থাকার অর্থই হচ্ছে অতিপ্রাকৃতি বা সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এভাবেই পতন ঘটতে থাকে আলেক্সান্ডারের স্মৃতির।

একবাতানা নগরীতে সাত রঙের সাতটি দেয়াল ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল সাদা রঙের। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই সাদা দেয়ালটি ধীরে ধীরে কালোতে রূপান্তরিত হলো। কেন এমন হলো ইরানি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতেই সে আমার দিকে বিচলিতভাবে তাকাল। বলল : 'তুমি কি লক্ষ করেছ, যেসব নারী গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ তারা এখানে আসে। এই দেয়াল স্পর্শ করে তারা প্রার্থনা করে যেন গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে। তারা এই আশা নিয়েই আসে। দেয়াল স্পর্শের আগে হাতে তেল লাগিয়ে নেয়। শত শত বছর ধরে এ অবস্থা চলার কারণে হাতের ছাপে দেয়াল কালো হয়ে গেছে।'

এদিকে হামাদান পর্বতমালায় পাথরের সিংহ মূর্তি মানুষের মধ্যে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করে না। বরং মানুষ মনে করে, মহামতি আলেক্সান্ডার তার ব্যক্তিগত বীরত্বের কথা প্রচারের জন্য এই সিংহ মূর্তি তৈরি করেছিলেন। মানব ইতিহাসে কল্যাণকর কোনো অবদান তার নেই। দেশের পর দেশ, এলাকার পর এলাকা দখল, গণহত্যার পর গণহত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন, অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা এবং সব ধরনের বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে পারস্যাতে তার ক্ষমতার চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হয়। তিনি যে কখনো পারস্য এবং হামাদানে ক্ষমতায় ছিলেন তার প্রমাণ রাখেনি পারস্যবাসী। তার ক্ষমতার সব নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলা হয়। সম্ভবত ক্ষমতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের তুলনায় এটা খুব বেশি ছিল না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলেক্সান্ডার বীর ছিলেন। কিন্তু যে বিষয়টি সবাইকে ভাবায় তা হচ্ছে, তিনি ধ্বংসযজ্ঞ রচনায় যতটা পারঙ্গম ছিলেন, সৃষ্টিশীলে ততটা নয়। ফলে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ শতাব্দীতে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তার মৃত্যু হলে সমাজে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। একজন সম্রাটের মৃত্যুকে মূল্যায়ন করা হয় তিনি তার সাম্রাজ্যের জন্য কী কল্যাণ বয়ে এনেছেন তা দিয়ে। এ ক্ষেত্রে আলেক্সান্ডারের অবস্থান বিপরীতে। পৃথিবীর মানুষও তার ভালো দিক কমই জানতে পারল। শিশুদের ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে তার সাফল্যের কথা বর্ণনা করা হলেও তিনি যে ইরানের শাহের কাছে ক্রমাগত যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন, এমনকি এক পর্যায়ে তার নিজের বিজয় করা মেসিডোনিয়া এবং গ্রিসের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা খুব কম লোকই জানতে পেরেছে। এই বিশাল সাম্রাজ্য পারস্যের আকামেনিদসের দখলে চলে যায়। তার সম্পর্কে কি পারস্যবাসীরা শুধু অন্যায়-অবিচারের কাহিনী প্রচার করেছে? কোনো আদর্শ বা মহৎ কিছুই প্রচার করেনি? এ কথা সবার জানা, ইতিহাস সব সময় লেখা হয় সফল এবং বিজয়ী ব্যক্তিদের নিয়ে। ইউরোপের ইতিহাস যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার শুরুটা প্রাচীন গ্রিকরাই শিখিয়েছে, ফলে আলেক্সান্ডার যখন পরাস্ত হলেন তখন তার অপরাধের কথাই তুলে ধরা হবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? প্রশ্ন এসে যায়, যখন গভীরভাবে চিন্তা করা হয়। ইরানে আলেক্সান্ডারের ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে বিশদভাবে যে কেউ ব্যাখ্যা করতে থাকে। পশ্চিম এশিয়ার উত্থান এবং সনাতনী যুগের আবির্ভাব, বিশেষভাবে হেলেনিস্টিক যুগের সূচনা হলো তখন থেকেই। হেলেনিক সংস্কৃতির প্রভাব হওয়ার কারণেই এই নামকরণ হয়। গ্রিকরা অবশ্য হেলেনিক শাসক ছিলেন সিরীয় এবং মিসরীয় ও মেসিডোনিয়ার সংযোগস্থলের মধ্যবর্তী প্রতিনিধি। অনেক জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করার পর উপসংহারে এভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, আলেক্সান্ডারকে নিয়ে যা প্রথমে

কল্পনা করা হয় তার থেকেও অনেক বিতর্ক থেকে যায়। একইভাবে পৃথিবীর মানুষ মনি এবং অন্যান্য ধর্ম উপাসককে নিয়ে যা ভাবে, এমনকি জরাথ্রুস্টবাদ নিয়ে বিশ্বাসী দ্বৈত মত পোষণ করে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, মনির সময়ে পারস্যের শাহের যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তা সে সময় একজন শাসকের নির্দেশেই হয়েছিল। স্বর্গ থেকে ঈশ্বর সেই ধ্বংসযজ্ঞের বাণী পাঠাননি। তা হয়েছিল তলোয়ারের জোরে। আবার একইভাবে পারস্যের নবী জরথ্রুস্টের ধর্ম নিজ সীমান্ত ছেড়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য নতুন বারতা।

মহামতি আলেকজান্ডারের বিশ্বজয় যেভাবে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা হয় সে প্রেক্ষিতে সমাজে যে প্রভাব পড়েছে তাতে এর বিপরীত চিত্র ছিল, যা পরবর্তী সময়ে দৃশ্যপট হয়েছে। আমাদের অতীতের দিকে তাকাতে হবে। দৃষ্টি দিতে হবে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ ফার্সের দিকে। এটা ইরানের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী নগরী। তবে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এখানেই রয়েছে পার্সেপোলিস রাজপ্রাসাদ। নাকশ-ই-রুস্তম থেকে বেশি দূরে নয়। এই নাকশ-ই-রুস্তম এলাকায় সাসনীয় শাসকগোষ্ঠী প্রাক আমলে তাদের বিজয় সূচনা করেছিল। বর্তমানে ইরানের যে আত্মসম্মান ও ভাবমূর্তি তা থেকে পার্সেপোলিস ব্যতিক্রম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একদিকে সাধু সন্ন্যাসীদের ধ্বংসাবশেষ, অন্যদিকে ইরানে ইসলামি পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। শেষ সম্রাট শাহর কীর্তিকলাপ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ইরানের গর্ব নতুন করে যেন শুরু হলো। পুরনো সব কিছু ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করার জোর লড়াই চলল। ধূসর রঙের কোই-ই রহমত বা ক্ষমার পর্বত ৩৫ একর সমতল ভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছিল। এক সময় এই স্থানটি উর্বর সমতল ভূমি ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫২০ শতাব্দীতে শাহেনশাহ এখানে ১৫০ বছর ধরে তার রাজপ্রাসাদ এবং সভাসদ নির্মাণ করেছিলেন। একটা প্রজন্ম শেষ হতো, আরেক প্রজন্ম রাজপ্রাসাদ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করত। প্রাচীন সময়ে অন্যান্য রাজপ্রাসাদের থেকে এটা ছিল ব্যতিক্রম। এই রাজপ্রাসাদ এবং সভাসদ কক্ষ তিনটি শ্রেণীর জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। একটিতে থাকত সর্বনিম্ন শ্রেণী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠী, দ্বিতীয় স্তরে ছিল সামাজিকভাবে মর্যাদাবান গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি থাকত বা বাস করত রাজকীয় পরিবারবর্গ। দারিউস এবং জেরেক্সের রাজপ্রাসাদ এখনো শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে বহু স্তম্ভ এবং কলাম। সেইসঙ্গে তাদের সিংহাসন কক্ষ, দর্শকদের হলরুম এবং সরকারি খাজাঞ্চিখানা। বিভিন্ন রঙের তৈরি দেয়াল অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু পড়ে রয়েছে পাথরের নির্মিত কাজগুলো। দরজা এবং জানালার অবকাঠামো

ভেঙে পড়লেও শেষ চিহ্ন নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো দেখলেই একধরনের আনন্দ জেগে ওঠে। প্রাচীন আমলের সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। পাথরের জানালার ফ্রেম তৈরি হয়েছিল রাজা দরিউসের বাসগৃহে।

ভাবতে অবাক লাগে, এটা কী ধরনের পাথরের কাজ ছিল। প্রতিটি কাজ ছিল নিখুঁত। প্রতি ইঞ্চি আবৃত করা হয়েছিল ব্যাসটি দিয়ে। এই নান্দনিক ডেকোরেশনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। ছাদ তৈরি করতে গিয়ে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন স্থাপত্যবিদগণ এবং শ্রমিকরা। ছাদে নির্মাণ করা হয়েছিল ষাঁড়, সিংহ এবং ঈগলের প্রতিকৃতি। এগুলো তৈরি হয়েছিল পাথর এবং স্বর্ণ দিয়ে। এগুলো তৈরির সময় মূল ভূমি থেকে ২৪ ফুট ব্লক এবং ৫০ ফুট ওপরে সমানভাবে খনন করা হয়েছিল। এটা তৈরি করার সময় মালপত্র, বিশেষ করে বিশাল আয়তনের পাথর উত্তোলনের জন্য ঘোড়ায় গাড়ি ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু কোনো দস্যু যেন ডাকাতি করতে না পারে সে জন্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। মূলত এই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল উৎসব আয়োজনের জন্য। এখানে আকামেন সাম্রাজ্যের ধর্মীয় উৎসব পালন করা হতো। এই রাজপ্রাসাদে বিদেশি দূত এবং তাদের সহযোগীরা ভ্রমণ করতেন। উপঢৌকন প্রদান করতেন তারা। পারস্যের নতুন বর্ষ শুরুর প্রথম দিনে নোরুজের উদ্দেশ্যে সব উপহার তার কাছে হস্তান্তর করতেন। চলত দশ দিনব্যাপী উৎসব। মহান রাজা যেন এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি–এটা মেনে নিত সবাই।

ইরানে নোরুজ উৎসব দশ দিন চলত। এটা এমন এক সময়ের কথা বলা হচ্ছে, যা জরাথুস্ট ধর্মপ্রচারের আড়াই বছরের আগের ঘটনা। কিন্তু একটা বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয়, পার্সেপোলিস নগরীর সড়ক দিয়ে নববর্ষের প্রথম দিনে হাঁটাচলা করলে, বিশেষ করে সকালে দেখা যায় পুরুষরা পাতলা শার্ট এবং জিন্সের প্যান্ট এবং মহিলারা চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে রয়েছে। বর্তমান সময়ের তরুণ-তরুণীদের যদি প্রাচীন যুগের সেসব কাহিনীর কথা জিজ্ঞেস করা হয়, তারা তেমন কোনো উত্তর দিতে পারে না। তবে তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ঠিকই রয়েছে। সেই রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে যাওয়ার সময় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সেই রাজপ্রাসাদ দুই হাজার বছর অতিক্রম করেছে। রং অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীন ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। মাঝেমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে রং করা হয়। এটা কল্পনা করা কঠিন বা অসম্ভব নয় যে, বাস্তবতার কারণেই এসব স্মৃতিময় রাজপ্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আর বাস্তবতার সঙ্গে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। রাজ শাসনামল নেই, রাজাও নেই। ৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ

এবং এর দরজা-জানালা, সেইসঙ্গে পাথরের তৈরি বিশাল দুটি ষাঁড় আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই রাজপ্রাসাদের একেবারে সামনের দিকে দর্শকদের বিশাল হলরুম। আপাদানা হলরুমে ৩৬টি স্তম্ভ রয়েছে, ৬০ ফুট উঁচু। পুরো হলরুম দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরি ছাদ দিয়ে। হলরুম শোভামণ্ডিত করতে স্বর্ণ এবং রূপার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ এবং স্বর্ণের রঙে সজ্জিত করা হয়েছে। এই হলরুমে প্রতিবছর উৎসবের সময় ২৩টি দেশের দশ হাজার শীর্ষ প্রতিনিধি আনন্দ উদ্‌যাপন করেন। আকামেন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এবং শক্তির নিদর্শন এর থেকে প্রমাণিত হয়। এটা সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং শোভামণ্ডিত হলরুম।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি এবং শীর্ষ কর্মকর্তারা এই রাজসভাসদ কক্ষে আসতেন এবং রাজার জন্য উপহার নিয়ে আসতেন। আফ্রিকার নুবিয়ান একবার স্বর্ণনির্মিত হাত উপহার দিয়েছিলেন রাজাকে। ভারতীয়রা উপহার দেয় সিংহের চাদর। একই সঙ্গে পারস্যবাসী পাদুকা এবং গাধা উপহার দিয়েছিল। এক জোড়া ষাঁড় দিয়েছিল। এ ছাড়া ঝুঁড়িতে বহন করা যায় এমন কিছু মূল্যবান উপহার প্রদান করে রাজাকে। এশিয়ার কেন্দ্রস্থল স্কাইথিয়ান থেকে এই জাতি-গোষ্ঠী ঘোড়া, বস্ত্র, জুতা উপহার দেয়। সম্ভবত লাল চামড়ার পার্থিয়ান জুতাগুলো পরবর্তী সময়ে রোমান সম্রাটদের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাদের রানিরা যখন সিংহচিহ্নিত ঘোড়ার গাড়িতে বসে ভ্রমণ করতেন তখন চারপাশে নিরাপত্তারক্ষীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাহারা দিত। তাদের সঙ্গে থাকত ব্যাবিলনীয়, আরব, থারাসিয়ান এবং গ্রিকরা। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় এই যে, ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী ইহুদিরা দূরে থাকত। তারা কোনো উপহার দেয়ার মধ্যে ছিল না। আকামেডিয়ান সাম্রাজ্যে ইহুদি জাতি যে এতটাই বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত তা ভাবাই যায় না। ইহুদিদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ছিল। তারা ব্যাবিলনীয় জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি থেকে আলাদা থেকে আরবের দুটি ঘোড়ার গাড়িতে স্বর্ণালংকার বহন করত। তাদের নিরাপত্তারক্ষীদের চেহারা কেউ দেখতে পেত না। তারা এমনভাবে টুপি পরত নাক পর্যন্ত তা ঢাকা থাকত। হাল আমলের সনাতনী ইহুদিবাদীরা একই কাজ করত।

পার্সেপোলিস নগরীর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস মনে পড়ে গেল। নিজেকে সেই আমলের একজন প্রতিনিধি মনে হচ্ছিল। আমি এবং আমার পথনির্দেশক রাজপ্রাসাদের একজন প্রতিনিধি দ্বারা যেন পরিচালিত হচ্ছি। এখানে প্রতিটি মানুষ যেন পারস্যের অন্তরের অন্তস্তল থেকে আগত। প্রত্যেকে নিজের মতো করে পরিচালিত হচ্ছে। এখানকার

মানুষের চুল, দাড়ির স্টাইল–সবই যেন রাজকীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে আগত। এই রাজপ্রাসাদে নববর্ষের প্রথম দিনে রাজার জন্য আজও উপহার নিয়ে আসা হয়। পাথরের বিশাল টেবিলে তা সাজিয়ে রাখা হয়। এটা মানুষের একধরনের বিশ্বাস।

> *রাজা জেরেক্স বলেছিলেন, 'আহুরা মাজদার কল্যাণে এবং মৌন সমর্থনে পারস্যের আশপাশে যত দেশ দেখা যাচ্ছে প্রতিটির রাজা ছিলাম। মেডিয়া, ইলাম, আরাকোসিয়া, আর্মেনিয়া, ড্রানজিয়ানা, পার্থিয়, বাকট্রিয়া, সগদিনা, কোরাসিমা, ব্যাবিলনিয়া, আসিরিয়া, সাত্তাগিদিয়া, সার্দিস, মিসর এবং আয়োনিয়ন–এই সব দেশের সাগরের সঙ্গে এবং সাগরের পাশ দিয়ে সংযোগ ছিল। আরবের মক্কার মানুষেরা, গান্ধারা, সিন্ধু, কাপ্পাডোসিয়া, দাহে, আমিরজিয়ানের স্কাইথিয়রা, টুপি-পরিহিত স্কাইথিয়রা একক্রুড্রা, আকাযুনকার মানুষেরা, লিবীয় এবং ইথিওপীয় জনগোষ্ঠী সবাই আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল।'*

পারস্য এবং মেডেসের নিরাপত্তাকর্মীরা রাজপ্রাসাদ পাহারা দিত। তাদের কোনো ঘুম ছিল না। এ জন্য তাদের জন্য বিছানার ব্যবস্থা করা হতো না। এ রকম কয়েকজন শাহ নিজে যুদ্ধে যেতেন এবং রাজপ্রাসাদে রক্ষিত স্বর্গের তৈরি সিংহ ধ্বংস করে ফেলতেন। এ সবই সম্ভব হতো আহুরা মাজদার পাখার প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে। আহুরা মাজদা হচ্ছেন জ্ঞানের প্রভু। জরাথ্রুস্টের শিক্ষায় বলা হয়, একমাত্র ঈশ্বর। তার নাম রাজার শাসনে ছড়িয়ে পড়ে। স্বর্গীয় নিয়ম-নীতি এবং যারা অপরাধ করে তাদের দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী সাগরের উপকূলে রাখতেন, যাতে অপরাধীদের সাগরে ডুবিয়ে দেয়া সহজ হয়। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে লেখা আছে :

> *'আহুরা মাজদা মহান ঈশ্বর। তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন। মানবতা তার দ্বারা সৃষ্টি। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিটি ভালো বস্তু তারই সৃষ্টি। তিনি জেরেক্সকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকারী।'*

আরো লেখা রয়েছে, রাজা জেরেক্স বলেন :

> *'আহুরা মাজদার কল্যাণ এবং আশীর্বাদে আমি এই শক্তি পেয়েছি যে, পৃথিবীর যত জাতি-গোষ্ঠী আছে তা সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করতে পেরেছি। পারস্যাতে যত সুন্দর সব বস্তু দেখা যাচ্ছে তা আমি এবং আমার পিতার তৈরি। যা কিছু সুন্দর দেখাচ্ছে তা আহুরা মাজদার কল্যাণে এবং আশীর্বাদে। আহুরা মাজদা আমাকে এবং আমার রাজা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'*

যত দূর জানা যায় আকামেন সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে সেরা এবং শক্তিধর ও ক্ষমতাবান সাম্রাজ্য। রাজা দারিউস বলেন, 'এই বিশাল সাম্রাজ্য আমি নিয়ন্ত্রণ করি। স্কাইথিয়ান থেকে যে দেশটি রয়েছে সাগিদিয়ানার পেছনে, অগ্রভাগে ইথিওপিয়া, সিন্ধু থেকে সার্দিস পর্যন্ত সবই আমার দখলে। এর পরিধি নীল নদ থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, ভারত মহাসাগর, ককেশীয় পর্বতমালা থেকে আরব সাগর পর্যন্ত–সবই আমার দখলে।' দারিউস দম্ভস্বরে বলেন, 'রাজা জেরেক্স এবং আতরা মাজদা পারেননি তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। তারা বীর আলেক্সান্ডারের এবং তার বিশাল সেনাবাহিনীর গতি রোধ করতে পারেননি।' আলেক্সান্ডার তার দলবল নিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ শতাব্দীর ৩০ জানুয়ারি পার্সেপোলিস নগরী দখল করে নেন। মেসিডোনিয়ার এই সম্রাট পার্সেপোলিস নগরীর এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং এর যা কিছু আছে সব করায়ত্ত করেন। তারা এই নগরীর সঙ্গে অন্য কোনো কিছু তুলনা করতে পারেন এমন কিছু দেখতে পাননি। এমনকি সরকারি খাজাঞ্চিখানায় স্বর্ণ এবং মুদ্রার মজুত দেখে হতবাক হয়ে যান। এই ভাণ্ডার লুট করতে আলেক্সান্ডারের এবং তার বাহিনীর সাত হাজার ঘোড়ার গাড়ি লেগেছিল। পুরো সম্পদ যা ছিল তা এথেনীয় সাম্রাজ্যের তিনশ বছরের বার্ষিক আয়ের সমান। আলেক্সান্ডার এবং তার বাহিনীর জন্য ছিল এ এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা। তারা দুই হাতে নগরীর সম্পদ লুট করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনশ বছর পর গ্রিক ইতিহাসবিদ ডিওডোরাস পার্সেপোলিস নগরীতে আলেক্সান্ডার বাহিনীর পরবর্তী সময়ে কী পরিণতি হয়েছিল তা বর্ণনা করেন। তার বর্ণনানুযায়ী, আলেক্সান্ডার তার বাহিনীকে বলেছিলেন পার্সেপোলিস এশিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং বাজে নগরী। মেসিডোনীয় এই সম্রাট তার বাহিনীকে নগরী ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পারস্যের প্রতিটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল তার নির্দেশে। নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং শিশুদের দাস বানিয়ে রাখা হতো। আলেক্সান্ডার বাহিনী এতেও শান্ত হলো না। এক পর্যায়ে সম্পদের নেশায় একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এতে বহু সৈন্য নিহত হয়। অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কঠোর সংগ্রাম করে জীবন নির্বাহ করতে হয় তাদের।

এখানেই শেষ নয়। ওই বছরের মে মাসের শেষদিকে অথবা জুনের প্রথম ভাগে জেরেক্সের রাজপ্রাসাদ দখলের পর ওই রাজপ্রাসাদে ব্যাপক মদপান করে মাতাল হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় এথেনিয়ার এক যোদ্ধা সবার উদ্দেশে আহ্বান করলেন, এশিয়ার পুরো মহাদেশ দখল করার ক্ষমতা তিনি রাখেন, যদি মহাবীর আলেক্সান্ডার তাদের সঙ্গে যোগ দেন। আর এই বিজয়ের উৎসর্গ

হিসেবে জেরেক্সের রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। পারস্যের নারীদের অন্যদের কাছে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে হবে। তাদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। এ কথা শোনার পর প্রত্যেকে মোমবাতির আলো তুলে ধরল এবং যেন বিজয়ের মালা তৈরি করল। মূলত এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন থাইস নামক এক যোদ্ধা। ডিওডোরাস আরো লেখেন, পুরো পার্সেপোলিস নগরী তারা পরিভ্রমণ করে। মোমবাতির আলো নিয়ে সর্বাগ্রে ছিলেন থাইস। পরে ছিলেন মহাবীর আলেক্সান্ডার। তার সৈন্যরা হাতে মোমবাতি নিয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল। যেন প্রতিশোধের নেশায় মত্ত হয়েছিল তারা। এ ঘটনার ১৫০ বছর পূর্বে জেরেক্স এবং তার বাহিনী এথেন্স আক্রমণ করেছিল এবং এর মন্দির এবং ধর্মীয় উপাসনালয় পুড়িয়ে ফেলেছিল। এথেন্স এবং আলেক্সান্ডার বাহিনী জেরেক্সের পারস্য নগরী এবং এর রাজপ্রাসাদ আগুনে পুড়িয়ে দিল। ডিওডোরাস আরো বর্ণনা করেন, এই ঘটনা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, রাজা জেরেক্স একজন নারীর কাছে হার মেনেছিলেন। সেই নারীকে তিনি লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, সব কিছুই খেলার ছলে করা হয়েছিল। জেরেক্সের রাজপ্রাসাদের ছাই আজও ঢাকা রয়েছে।

বিশাল পর্বতমালা থেকে নিচের দিকে নেমে আসার সময় ইরানি পথনির্দেশক আমাকে বলল, পারস্যবাসীরা ইতিহাসের এই কাহিনী ভিন্ন মাত্রায় ব্যাখ্যা করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাও ভিন্ন। পথনির্দেশক জানালো, আলেক্সান্ডার প্রত্যাশা করেছিলেন পার্সেপোলিসের রাজা নোরুজ তার জন্য উপহার নিয়ে আসবেন। আর সে কারণেই আলেক্সান্ডার এই নগরীতে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলেন। এখানেই আশ্রয় গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তার মনে হলো ইরানিরা কখনোই তাকে মেনে নেয়নি। তিনি সুশাসক নন বরং অত্যাচারী হিসেবে সবার কাছে স্থান করে নিয়েছেন। এতেই ক্ষিপ্ত হলেন মহাবীর আলেক্সান্ডার। তার উপদেষ্টা তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন : যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্সেপোলিস নগরী ধ্বংস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না যে পারস্যের রাজা সত্যিই পরাস্ত হয়েছেন। ক্রমাগত এবং ধারাবাহিকভাবে এই দাবি উঠতে থাকে। প্রত্যেকের দাবি, পার্সেপোলিস নগরী ধ্বংস করতে হবে ভবিষ্যতের শান্তির জন্য। কিন্তু এই শান্তি শুধু গ্রিকবাসীদের জন্য। আলেক্সান্ডার চেয়েছিলেন সারা পৃথিবী গ্রিসের দখলে নিতে। পুরো পৃথিবীতে গ্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আর এই লক্ষ্যে দশ হাজার ইরানি মহিলাকে জোরপূর্বক তার সৈন্যদের সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি তার কপালে হাত রাখলেন। এটাও কী কারণে করলেন তা রহস্যই থেকে

যায়। ইরানের রাজধানী পুড়িয়ে দেন। নারীদের ধর্ষণ করেন। প্রমাণ করার চেষ্টা করেন গ্রিকরা ইরানের থেকে শ্রেয়।

ইরানি পথনির্দেশকের চোখ হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে গেল, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। পারিবারিক উৎসব করতে একটা পরিবারের সকলে কোথায় যেন যাচ্ছে। আমাদের সামনে দিয়ে পার হলো।

পথনির্দেশক বলল : আপনি লক্ষ করেছেন, আমরা এখনো এখানে রয়েছি। ইরান তার স্থানে অবিচল, মুক্ত এবং স্বাধীন দেশ। তার মুখাবয়বে পুষ্ট হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, মেসিডোনিয়ার কী অবস্থা? সেটা কোনো স্বাধীন দেশ নয়। বরং সাবেক যুগোস্লাভিয়ার প্রদেশ ছিল।

পার্সেপোলিস নগরী ধ্বংস করে আলেকজান্ডার দেশান্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। বাস্তবে গ্রিসে তা কখনোই ঘটেনি। পার্সেপোলিস নগরী পুড়িয়ে দেয়ার সাত বছর পর আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। শুরু হয় মেসিডোনিয়াতে গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ ৩০ বছর চলে। শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সাম্রাজ্য বিভক্ত হয় সৈন্য প্রধান এবং তাদের উত্তরসূরিদের মাঝে। এত কিছুর মাঝেও সে সময় গ্রিসের নতুন শাসকগোষ্ঠী, সঠিকভাবে বলতে গেলে হেলেনিস্টিক শাসকগোষ্ঠী, যাদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন জোতির্বিদ টলেমি, সেলেকুলাস, অ্যানাকুলাস। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ইঁদুর-বিড়ালের লড়াইয়ের মতো।

মেসিডোনিয়া নিজেদের দখলে নিতে চাইল গ্রিকরা। এদিকে অত্যন্ত ক্ষমতাবান রোমান এবং পার্থিয়ানরা, সেইসঙ্গে ইরানের বর্বর জাতি-গোষ্ঠী আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিদের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল। মেসিডোনিয়ার নতুন শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত সীমান্তবর্তী এলাকায় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এভাবে ১৫০ বছর ধরে সীমান্তবর্তী নগরীতে বহু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অবশেষে আসে স্থিতিশীলতা।

পারস্য সাম্রাজ্যের আকামেনীয় শাসকের পতনের পরও অনেকেরই তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে যায়নি। তার সম্পর্কে কোনো বাজে ধারণা পোষণ করেনি পারস্যবাসী। তারা কখনো বিশ্বাস করেনি, বিশ্বে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। প্রাচীনকালে এটা ধরেই নেয়া হতো যে, রাজা হতে হলে স্বর্গীয় দেবতার নির্দেশের প্রয়োজন। সর্বশক্তিমানের কৃপা এবং দয়া থাকতে হবে। যদিও পারস্যদের মধ্যে একটি আদর্শে বিশ্বাস ছিল, তা হচ্ছে আহুরা মাজদা। তবে তারা অন্য জাতির বা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। অন্য ধর্মের লোকেরা যেভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করত বা মানত, তাতে কোনো বাধা প্রদান করত না। বাস্তবিক অর্থে আকামেন্দিস তার জাতির মানুষের মধ্যে সাহস ও বীরত্বের প্রতি

জোর দিতেন। তাদের উৎসাহ দিতেন। একই সঙ্গে প্রত্যেককে নিজের ধর্মীয় ঐতিহ্য পালন ও অনুসরণ করতে বলতেন। পারস্য রাজাদের শাসনামলে ব্যাবিলনে ক্ষমতারোহণ করেন মারডুক দেবতা। ওই সময় ইহুদিরা জেরুজালেমে তাদের ধর্ম উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করে। এসব ক্ষেত্রে পারস্যবাসী এবং শাসকগোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিদেশি শাসক শ্রেণী, তারা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, ধর্মযাজকদের দ্বারা নতুন নিয়ম চালু হলো এবং তারা সমাজে অসমতা সৃষ্টি করল। সমাজে বসবাসরত প্রত্যেকে প্রত্যাশা করল, গ্রিক নিয়মে দেশ পরিচালিত হোক। অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিল। সমাজে সর্বস্তরে অস্থিরতা। প্রাচীন যুগে দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হলে সে দেশের সম্পদ লুট করে জাহাজে করে দেশে নিয়ে আসত। পারস্যের পার্সেপোলিস নগরীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রাচীনকালে সৈন্যরা ভূমি দখল করে সেখানেই তাদের তাঁবু গড়ে তুলত। ফলে কৃষক তার জমি হারাতে থাকে। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমতে থাকে। গবাদি পশুও কমে যেতে থাকে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি দেখা দেয়। কৃষক খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করে। তার জমিতে চাষ নেই। ফসল ফলে না। সেখানে সৈন্যদের তাঁবু। নগরী, যা কিনা অর্থনীতির চালিকাশক্তি তা ধ্বংস হতে থাকে। তাদের সর্বশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। নগরীর অধিবাসীরা নিজেদের পকেটে ছুরি রাখে। খাবার না পেলে আত্মহত্যা করার জন্য। অনেকে দাস হয়ে নিজেকে বিক্রি করে। সমৃদ্ধিশালী এবং ঐতিহ্যবাহী ইরান রাতারাতি হতদরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হলো। প্রতিটি স্ত রে দেখা গেল গ্রিক আধিপত্যবাদ। শহরের সর্বত্র গ্রিসের নাগরিক। রাষ্ট্র পরিচালিত হতে লাগল গ্রিক সংবিধানের আদলে। এ যেন আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়ার পদচিহ্নের মতো অবস্থা। নিজ ভূমিতেও ইরানিরা পরবাসীর মতো জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। বিশ্ব সংস্কৃতির নতুন যুগের সূচনা হলো। আর সেই সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক গ্রিক। ঠিক যেমনটি হয়েছিল উনিশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের দখলে থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষের।

পার্থিয়ানরা যখন পারস্যকে উপনিবেশ হিসেবে দখল করে নিল, তখন নতুন শাসকগোষ্ঠী তাদের মুদ্রায় গ্রিসের বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি সংযোজন করত। ৪০০ বছর ধরে পার্থিয়ার শাসকরা তাদের মুদ্রা বাধ্য হয়েই গ্রিসের কাছে মজুদ রেখেছেন। ফলে দুর্নীতি হয়েছে ব্যাপকহারে। এভাবেই চলতে থাকে যুগের পর যুগ। শত শত বছর পার হতে থাকে। এক পর্যায়ে পার্থিয়ানদের কাছ থেকে সাসানীয়রা ক্ষমতা দখল করে। ইরানের লোক-

লোকান্তর এবং সাধারণ মানুষ জরাথ্রুস্ট ধর্মের এবং আদর্শের কথা ভুলে যায়নি। তাদের বিশ্বাস ছিল এই ধর্মের প্রতি। এক সময় জরাথ্রুস্টবাদ রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি ছিল। ধর্মের ৫০০ বছরের পুরনো স্মৃতি যদি আলোচনা করা হয় তাহলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসবে তা হচ্ছে, আর্দেশি এবং শাপুরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সাইরাস, দারিউস এবং জেরেক্স। কত সহজেই তারা বেরিয়ে এসেছে এবং নিজের ধর্ম ও আদর্শ প্রয়োগ করেছে সমাজ এবং রাষ্ট্রে।

হেলেনিস্টিক যুগের কারণে জরাথ্রুস্টবাদ মতের পরিবর্তন ঘটেছে। ইরানে যেন এ সময় আইরম্যানের ক্ষমতা প্রদর্শিত হলো। এই আইরম্যানকে শয়তানের প্রতীক হিসেবেই ভাবে সবাই। প্রাচীনকালের সব নবীর মতোই জরাথ্রুস্টও এই শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, ইতিহাস স্থির নয়। এটা ঘূর্ণায়মান। একদিন মানুষ সত্য জানতে পারবেই। জরাথ্রুস্ট নিজেই বলেছেন, ভালো এবং মন্দের যে লড়াই এবং সংগ্রাম তা একদিন মহা লড়াইয়ে পরিণত হবে। বহু সমস্যা, বিপদ, সাধারণ মানুষের প্রতি নির্যাতন–এত কিছু করেও সত্যের জয় হবে। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন স্বর্গীয় বার্তাবাহক জরাথ্রুস্ট এবং তার আদর্শের মানুষেরা। শয়তানের পতন হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হবে। জরাথ্রুস্টের নিজের ভাষায় : 'ফ্রশো কেরেতি' যার অর্থ সুন্দর পৃথিবী রচিত হবে। সত্যের জয় হওয়ার ফলে পৃথিবী বিশুদ্ধে পরিণত হবে। বাস্তবিক অর্থে এটা ইহজগতে ঘটবে তেমন কথা বলেননি জরাথ্রুস্ট। ধর্মপ্রচারক জামায়েদ হাম্মাশাত বলেন :

'সেদিন মানুষ নতুন করে জন্মাবে না, মৃত্যু হবে না,
সময় যেন পার হবে না, কোনো দুর্নীতি হবে না,
মানুষ বাস করবে এবং বড় হবে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায়।
যখন জীবন পুরোপুরি আনুত্যুতে পরিণত হবে
পৃথিবীও সঞ্চিত থেকে ফুরিয়ে যাবে।'

বাস্তবিক অর্থে পৃথিবী কবে ধ্বংস হবে তার কোনো নিশ্চিত দিন-তারিখ উল্লেখ নেই। ধর্ম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী প্রতিটি লোক এ কথা মানে, নশ্বর পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। না তাওরাত, না ব্যাবিলনীয়, না গ্রিক, না ভারত, না চায়নিজ–কেউই পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে পারেনি। কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য, শাসক বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠী এ ঘোষণা দিতে পারেনি কখন ধ্বংস হতে পারে পৃথিবী।

জরাথ্রুস্ট ধর্মের বার্তাবাহক সোসিয়ান্ত বিশ্বাস করতেন–ইরানের বিজয় মানসিকভাবে পুনরুদ্ধার হবে যখন আওরা মাজদার নির্দেশ আসবে। দেব-

দেবীহীন গ্রিকের বিজয় হবে প্রথম ধাপে। চূড়ান্ত যুদ্ধে সত্যের বিজয় হবে। তা হবে খুবই শক্তিমত্তা এবং ঐতিহ্যবাহী। এ কথা নিশ্চিত, সর্বশেষে সত্যের জয় হবেই।

পারস্যবাসীরা এসব নিয়ে কী ভাবছিল? হেলেনিস্টিক যুগের সংরক্ষিত দলিল এবং এমনকি পার্থিয়ান যুগের ইতিহাস এ ব্যাপারে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বাস্তবিক অর্থে পার্থিয়ান শাসকগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন সম্রাট জানতেন তাদের শেষ দিনের কথা। কারণ মুদ্রার পেছনে দিনক্ষণ লেখা থাকত। যদিও সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্নরাই নিশ্চিতভাবে মুদ্রার পেছনে কী লেখা ছিল তা বুঝতে পারত। এই লেখনী মুদ্রার ব্যবধান ৬০০ বছর ছিল। শাপুরের কাল থেকে আলেক্সান্ডারের বিজয় পর্যন্ত মুদ্রায় লেখা ছিল। ধর্মীয় কথাও লেখা থাকত। এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে, খালি চোখে দেখা যেত না। এসব তথ্য পরে জানা যায় গ্রিক চিন্তাবিদ সিবিলের গবেষণা থেকে। তিনিও গবেষণা করে দেখান পৃথিবী ধ্বংস হবে খুব সন্নিকটে। এটা হাতের মুঠোর ব্যাপার মাত্র। সিবিল ছিলেন জরাথুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকার গির্জার প্রধান ল্যাকটানেটিয়াস উল্লেখ করেন : হেস্তাপিয়াস বলেন, 'এমন একদিন আসবে, যখন সুবিচার বলে কিছু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, নিরপরাধ ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার হবে, শয়তান ভালো মানুষকে নিঃশেষ করে দেবে। ভালো মানুষের প্রার্থনা কাজে আসবে না। কোনো আইন-কানুন, শৃঙ্খলা কাজে আসবে না। কেউই বয়স্কদের শ্রদ্ধা করবে না, কারো মধ্যে ধর্মের প্রতি কর্তব্য করার ইচ্ছা জাগবে না। নারী এবং শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না কেউই। স্বর্গীয় আইনের বিরোধিতা করতে সবাই যেন ঐক্য গড়ে তুলবে। ষড়যন্ত্র করবে বিধাতার আইনের বিরুদ্ধে। প্রকৃতির বিরুদ্ধেও লড়াই হবে। পুরো পৃথিবী একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এভাবেই পৃথিবীর ধ্বংস রচিত হবে।'

পৃথিবী ধ্বংস বা শেষ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলেও। তবে অধিকাংশ বিশ্বাসী এই অনুমোদন দিয়েছে যে, ইরানিরা সঠিক পাদটীকা দিয়েছে। তারা এই জ্ঞানার্জন করেছে ইহুদি শিক্ষকদের কাছ থেকে। হিব্রু ধর্মগ্রন্থে প্রকৃতভাবে পৃথিবী ধ্বংসের সঠিক সময় উল্লেখ নেই। বরং পৃথিবী সম্পর্কে তাদের দর্শনচিন্তা ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে তারা দেখতে পেয়েছিল, অষ্টম শতাব্দীতে পৃথিবীতে কী বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ঈসা নবী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, বিপদ অত্যাসন্ন।

'শোক দিবস আসছে, বহু মানুষ তপ্ত হয়ে পুড়ছে
চারদিকে গর্জন, সাগরের গর্জন হচ্ছে
পুরো বিশ্ব তুলার মতো উড়ছে
সব একত্র হচ্ছে এবং প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে।'

ইহুদি জাতি-গোষ্ঠী পৃথিবী ধ্বংসকে অন্যভাবে দেখে। তারা মনে করে, এক স্থান ধ্বংস হবে, অন্য স্থান পুনর্জাগরিত হবে। ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের রাজা খ্রিষ্টপূর্ব ৭২১ শতাব্দীতে আসিরীয়দের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পর এবং ৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য জুদাহ থেকে সমাজের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নির্বাসন-এগুলো সবই শেষ হওয়ার চিহ্ন মাত্র। পৃথিবী ধ্বংসের ব্যাপারে মুনি ঋষিরা বলেছেন : একদিন অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে। ঈসার বার্তাবাহক এই তথ্য দিয়েছেন। সেই বার্তাবাহক আরো জানিয়েছেন, ঈশ্বর তার প্রতিনিধি পাঠাবেন এবং ইসরায়েলের বিজয়সূচি সব কিছু ধ্বংস করে দেবেন। সেইসঙ্গে ইহুদিদের স্বীকৃতি মিলবে।

ঈসা মসীহ বলেন : 'আমি প্রতিটি জাতির প্রাণকেন্দ্রে হাজির হব। মানুষের অন্তস্তলে আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ আমার কথা শোনার জন্য তাদের ছেলেদের কোলে করে এবং মেয়েদের কাঁধে করে নিয়ে আসবে। রাজা তাদের লালন-পালন করবে। রানি সকল শিশুর সেবা করবে। তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকবে। মাথা নিচু করে পা দেখতে থাকবে।'

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীতে বহুবার প্রচারিত হয়েছে। ঈসা মসীহর এই বার্তা মানুষ বহুবার প্রচার করেছে। ইরানীয়দের বিশ্বাস, ইহুদিদের শেষ যুদ্ধ সেরা বা অতি উৎকৃষ্ট ঘটনা নয়। এটা ইহুদিদের শেষ ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই হতে পারে; কিন্তু সারা পৃথিবীর জন্য নয়। নবী এটাও বলেছেন, ইহুদিরা একদিন বিজয়ী হবে এবং অন্য সব জাতি ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হবে।

মিসর অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইদম বন্যভূমিতে পরিণত হবে। কিন্তু ইহুদিবাদ চিরকালের জন্য থাকবে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুই জাতির ভিন্ন চিন্তা এবং পুরনো ঐতিহ্য নতুন করে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। একটি ইরানিদের চিন্তা, অন্যটি ইহুদিদের। ফলে দুই দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর উন্নতি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে ঘটেছে। দুটো জাতি-গোষ্ঠীই প্রায় একই হেলেনিস্টিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। যদিও দুই জাতি-গোষ্ঠী কখনোই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। বরং তৃতীয় শক্তির মধ্যস্থতা গড়েছে। তারা মহান শিক্ষা নিয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে

এটাও একটা বার্তা বটে, পারস্য এবং ইহুদিরা একই নবীকে সম্মান করতে শুরু করে। তিনি এমনই এক নবী, যিনি তার দেশের দুই জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নবীর মর্যাদা পেলেন। তিনি হচ্ছেন দানিয়েল নবী। তিনি ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের শেষ নবী। তিনি সুস নগরীতে বাস করতেন। একবার লক্ষ্য এবং ইচ্ছা ছিল দানিয়েল নবীর কবর দেখব, এটা ছিল ইলম প্রদেশে সুস রাজপ্রাসাদে। সেখানে ভ্রমণ করলাম।

দানিয়েল নবী

সুস আধুনিক পারস্যের নগরী। শাহুর নদীর কোল ঘেঁষেই এই নগরী। তাইগ্রিস থেকে ৯০ মাইল পূর্বে এই শহরের অবস্থান। এই নগরীতে প্রথমে যারা বাস করত তারা চিত্রকর এবং মিস্ত্রী জাতীয় শ্রেণী। সেটাও খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। পরবর্তীকালে ইলমিতিসের রাজধানীতে পরিণত হয়।

আসিরীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩৯ সালে এই নগরী আক্রমণ করে পুরো ধ্বংস করে ফেলে। এর ১০০ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে আকামেনীয় রাজা সুস নগরীকে পুনঃ স্থাপন করে তাদের শীতকালীন আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার করেন। সুস নগরী এবং আকামেনিয়ার রাজা রাজপ্রাসাদে উৎসবের জন্য বিশাল হলরুম তৈরি করেন। হিব্রু ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলে সুস রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। মহাবীর আলেকজান্ডারের পারস্য বিজয়ের সময়ও সুস রাজপ্রাসাদ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। একইভাবে পার্থিয়ান এবং সাসনীয় ঐতিহ্যবাহী শাসকগোষ্ঠী এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সুস নগরী ভ্রমণ করেন ইহুদি পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক বেঞ্জামিন। তিনি এই নগরীতে সনাতনী এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত অবকাঠামো দেখে মুগ্ধ হন। এ ঘটনার ঠিক ১০০ বছর পর মঙ্গলরা সুস নগরী দখল করে নেয়।

আজ আর সুস নগরীর কোনো সৌন্দর্য নেই। ইরানের অন্য দশটি শহরের মতোই প্রচুর ধূলিময়, অপরিচ্ছন্ন, আর বহু পুরনো দালানকোঠার অস্তিত্ব বিরাজমান। এটা ঠিক, পার্সেপোলিস নগরীর মতো একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি সুস নগরী এবং এর রাজপ্রাসাদ। সুস রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ দেয়াল এবং সুড়ঙ্গ পথগুলো ধ্বংস হয়ে যায়নি।

বহু দর্শক এখানে ভ্রমণ করেছে। পথ হারিয়ে ফেলেনি তারা। আড়াই হাজার বছর পরও রাজপ্রাসাদের দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এটা ঠিক, অনেক ক্ষতি হয়েছে। দালানের ভূমিতে ক্ষয় ধরেছে; কিন্তু অবাক বিস্ময় এই

যে, আকামেনিয়ার মহান শাসকগোষ্ঠী যে ধরনের পোশাক পরিধান করত, প্রধান প্রধান সড়কে সে ধরনের চিত্র আঁকা রয়েছে। এই রাজপ্রাসাদের নিম্নাংশে ভেঙে পড়েছিল। নিচের অংশে মার্বেল পাথরের কলাম বা সারি ছিল। কমপক্ষে আট ফুট ব্যাসার্ধ ছিল।

সনাতনী এবং ঐতিহ্যগত আকামেনীয় ডেকোরেশন করা হয়। মূল ভিত্তির চারপাশে অসাধারণ শোভাবর্ধন করা হয়েছিল। যদিও প্রাচীন সময়ের অধিকাংশ অবকাঠামোয় ক্রসেড স্টাইলের দুর্গ তৈরি হতো। অবশ্য এই ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়েছে গত ১০০ বছরে।

পারস্যের দালান নির্মাণকারীদের প্রধান এবং ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদের দল সম্মিলিতভাবে নিজেদের আরব যাযাবর জাতি-গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্য গড়ে তুলেছিল। তারা দালানকোঠা নির্মাণের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিত সবচেয়ে বেশি।

মূল সড়কের সঙ্গে লাগানো টিপিগুলোতে গেলাম। সেখানে বহু ছোট ছোট দোকান রয়েছে এবং কোমল পানীয়, পোস্টকার্ড ও রংবেরঙের দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা ঘুরে ঘুরে তাদের পণ্য বিক্রি করছে। টিপিতে উঠে নগরী দেখার জন্য নিচের দিকে তাকালাম। খুবই সুন্দর লাগছিল নগরী। নগরীর সামনের দিকে নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। প্রধান সড়কের পেছনে লোহার দোকান। অবাক বিস্ময়ে টিপিতে দাঁড়িয়ে নগরী দেখছিলাম। শহরের মানচিত্র তৈরি করেছেন পৌরসভার কর্মকর্তাগণ। তারা পিরামিড আকৃতির স্টাইলে নগরী সাজিয়েছেন এবং সেভাবেই তৈরি করেছেন।

সুস নগরীর এই প্যাটার্ন দেখে হঠাৎ করে মনে পড়ল এ ধরনের আকৃতি কোথায় যেন দেখেছি। এর সঙ্গে সাদৃশ্য এবং মিল রয়েছে চেস্টারফিল্ড গির্জার। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এবং বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করলাম যে, ইহুদি ধর্মের কোনো পুরোহিত পার্সেপোলিস নগরীর দেয়ালের রাস্তা মতো পোশাক পরিধান করেছেন এবং সুস নগরীতেও একই দৃশ্য দেখা গেল।

একই আকৃতির প্রতিকৃতি দেখা গেল যেন আবার। পাথরের নির্মিত হ্যাট পরে আছে যেন ইহুদি ধার্মিকরা। এটা মূর্তির তৈরি। আরেকটি বিষয় খুবই বেখাপ্পা মনে হলো–দানিয়েল নবীর কবরের নির্মাণশৈলি। সত্যিই, এ কবর বা সমাধি দেখলে সবাই অবাক হবে।

সুস নগরীতে দানিয়েলের কবর নিয়ে ইতিহাস রয়েছে। যদিও বর্তমান সমাধিখানা বেশি দিনের প্রাচীন নয়। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই কবর পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। পুনর্নির্মাণের আগ পর্যন্ত দানিয়েল নবীর কবর নিয়ে অতীতে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মতাদর্শের

ভিত্তিতে দখলদারী আরব জাতি-গোষ্ঠী সপ্তম শতাব্দীতে সুস নগরীর আপাদানা দখল করে। সে সময় দানিয়েল নবীর কবরের সন্ধান পায় তারা। তার কবর নিয়ে বিখ্যাত গল্প রয়েছে। লোক মুখে প্রচারিত হতো সেসব কাহিনী।

ভিসিনাথ রাজা, যিনি রোমের শাসকগোষ্ঠীকে নগরী থেকে ২০০ বছর আগে বিতাড়িত করেছিলেন, তাদের ইতাগির বুসেস্তে নদীর পূর্ব পাশে ঠেলে দেন। এ সময় খলিফা ওমর অধ্যাদেশ জারি করেন, শহুর নদীর মোড় বা স্রোতধারা ঘুরিয়ে ফেলতে হবে। দানিয়েলকে নদীর মূল স্রোতধারার দিকে অর্থাৎ সেদিকে তার কবর হবে। নদীকে সেভাবেই প্রবাহিত করা হবে। এমনই হুংকার দিলেন তিনি। এ ধরনের ঘটনার সত্যতা প্রমাণের কোনো সুযোগ হয়নি কখনো কারো। এটা অনেকের কাছে কাল্পনিক কাহিনী মনে হয়। অধিকাংশ আরববাসী সম্ভবত কখনোই দানিয়েল নবীর কথা শোনেনি। ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাক যুগে দানিয়েলের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক বেঞ্জামিন এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি দানিয়েল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> *'দানিয়েল নবীকে সমাধিস্থ করা হয় নদীর কূল ঘেঁষে আর নদীর কূলেই বাস করত ইহুদি ব্যবসায়ীরা।'*

তাদের বিশ্বাস ছিল, দানিয়েলের আশীর্বাদে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটছে। নদীর অপর পাশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিংসাপ্রবণ হয়ে উঠল। তারা রাগে, ক্ষোভে ফুঁসছে। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বিরোধ, পরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল, উভয় পক্ষ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিল নবীর কবর এক বছর নদীর এক পাশে থাকলে পরবর্তী বছর অন্য পাশে থাকবে।

ঐতিহাসিক রাব্বি বেঞ্জামিন লেখেন :

> *'উভয় পক্ষ এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল। ফলে উভয় দেশই ধনী হয়েছিল।'*

কিন্তু একটা সময় আসে যখন এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পারস্যের রাজা শাহ-বিন-শাহসহ ৪৫ জন রাজা তার একক কর্তৃত্ব মেনে নিলেন এবং সুস নগরীতে এসে এই স্থান দখল করলেন। মহান শাসক শাহ-বিন-শাহ সুস নগরবাসীকে নির্দেশ দিলেন দানিয়েল নবীর উৎসর্গে যে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা হোক এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন খুঁজে বের করতে হবে।

তিনি আরো নির্দেশ দিলেন, দানিয়েলের কবরের কফিন দুই স্থান থেকে তুলে আনতে হবে এবং স্বচ্ছ স্ফটিক কাচের তৈরি ঘর নির্মাণ করা হবে।

সেতুর মাঝখানে লোহার যে চেইন তা তুলে ফেলতে হবে। এ স্থানটি হবে সবার জন্য উন্মুক্ত।

দর্শনার্থীরা এখানে এসে দানিয়েলের কবর দেখবে। যার ইচ্ছা প্রার্থনা করবে। সে ইহুদি হতে পারে, অথবা যেকোনো ধর্মের লোক হতে পারে। রাজা শাহ-বিন-শাহের নির্দেশে সেতুর পাশ থেকে কফিন সরিয়ে নেয়া হলো। রাজা আরো নির্দেশ দিলেন, নবী দানিয়েলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই নদীর পূর্বে এবং পশ্চিমে এক বর্গমাইল এলাকাজুড়ে কোনো জেলে মাছ ধরতে পারবে না।

বাস্তবিক অর্থে এ কথা কেউই জানে না যে, ধর্মপ্রচারক এবং ইতিহাসবিদ বেঞ্জামিন নবী দানিয়েল সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা কতটা সত্য। কোনো ইহুদি ধার্মিক এ সত্য নতুন করে প্রচার করেনি। কিন্তু তার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলেও এ বিষয় কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না যে, কীভাবে সেতু থেকে কাঠের কফিন সরিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হলো।

সাদা এবং গোলাপি রঙের দানিয়েলের সমাধিস্থল দিনের বেলায় খুব একটা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। যেন লুকানো রয়েছে। বরং ইরানীয় সনাতনী মসজিদ ঠিকই আকর্ষণ করে। মসজিদের একটি পাশ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেন জ্যামিতিক প্যাটার্ন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোরআন এবং মোহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী আরবিতে লেখা রয়েছে। এই লেখাগুলো সাদা, স্বর্ণ এবং নীল ছায়ার দ্বারা আবৃত।

ধর্মপ্রাণ মুসলিম দলে দলে মসজিদের কাছে এসে এই লেখাগুলো পড়ে এবং ধর্মপালন করে। অনেকেই মসজিদের কাছে পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়। মসজিদের প্রধান দরজা পার হওয়ার সময় জুতা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এ সময় মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের একজন এসে আমার ক্যামেরা ধরলেন। তিনি দাবি করলেন, তার সঙ্গে আমি যেন মসজিদের বাইরে যাই। তার আরো দাবি, তার কাছ থেকে আমি যেন কিছু ছবি কিনি। তিনি যে একজন ছবি বিক্রেতা তাও জানা গেল। তিনি যখন জানতে পারলেন ছবি কেনার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই তখন আমাকে আর বাধা দিলেন না। মসজিদের বাইরের অংশে শিয়া ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রচারকদের কাজ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে ধাতু দিয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো বিস্ময়ের বিষয়, পুরো মসজিদ নীল, সবুজ এবং স্বর্ণের রঙে ঢেকে দেয়া হয়েছে। বাতিগুলো স্বচ্ছ। একধরনের আলোর প্রতিফলন ঘটে। ইউরোপীয়রা মসজিদ নিয়েও বহু চিন্তা করেছে। এত রঙের প্রতিফলন ঘটে

কীভাবে? এ ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানা সম্ভব হয়নি। মুসলিম পর্যটকরা মসজিদের অভ্যন্তরে বিশাল ধাতুতে চুমু খায়। তারপর প্রার্থনা করে।

মসজিদের দেয়ালের এক পাশে দানিয়েল নবীর কাহিনী বর্ণনা করা আছে। ফার্সি ভাষায় লেখা এবং দেয়াল অনেকটাই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। দানিয়েলের কাহিনীতে লেখা আছে : পরম ক্ষমতাশালী নেবুশাদনেজারের শক্তি তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কীভাবে তিনি তার শিক্ষক শ্যালডেনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, ব্যাবিলনীয় রাজার জন্য নিজেকে কীভাবে উৎসর্গ করেছেন তাও বর্ণনা করেছেন। তিনি একা কীভাবে রাজার স্বপ্ন পূরণ করেছেন, কীভাবে ইসরায়েলি শরণার্থীদের এক বিশাল গোষ্ঠী নিয়ে সুস নগরী পাড়ি দিলেন তাও লেখা আছে। সেখানেই জীবনের বাকি অংশ কাটিয়েছেন তিনি। কিন্তু এ কথা কোথাও প্রমাণ বা দলিল নেই যে, দানিয়েল ইসলামের আদর্শের কোনো মহামানব নবী ছিলেন। কোরআন এবং হাদিসে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা বা উল্লেখ নেই।

ইহুদি এবং শিয়া সম্প্রদায় তাকে খুবই সম্মান করত। দানিয়েলের চিন্তা-চেতনা হতে পারে এমন যে, মুসা এবং জরাথ্রুস্টের ধর্ম দর্শন তিনি এক করেছিলেন। আর সেটাই তিনি কার্যত নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। দানিয়েলের এই দ্বৈত পরিচয় এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে তোলে। আরো অবাক করা ব্যাপার এই যে, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি বা আইরিশ সেনাবাহিনীতে তাদের বিশাল জাদুঘরে ডাবলিনে আকামেনীয় শরণার্থীদের ছবি চিত্রায়িত আছে।

সেখানে দেখানো হয়েছে, ইরানি সৈন্যবাহিনী এবং ফিলিস্তিনের দুজন গেরিলা মাস্ক পরে জেরুজালেম নগরীতে যাচ্ছে। সেখানে শ্লোগান দিচ্ছে। শ্লোগানে লেখা ছিল :

'আমাদের পবিত্র রাজধানী আল-কুদস।'

আল-কুদস ইসরায়েলি রাজধানীর ইসলামিক নাম। আধুনিক ইসলামিক ইরানি প্রজাতন্ত্রে এ ধরনের দৃশ্য কম নয়। আদর্শগত চিন্তা এবং হৃদয়ে তা ধারণ করে আছে সেদেশের মানুষ। একই সঙ্গে ইসরায়েলি এই দানিয়েল নবীর আদর্শ তারা ধারণ করে। প্রকৃত অর্থে এটা ভাবার সময় এসেছে এবং পেছনে ফিরে তাকাতে হয়, বাইবেলে যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে প্রশ্ন জাগে দানিয়েল বলে কেউ ছিলেন কি?

দানিয়েলের গ্রন্থও আশ্চর্য বা অবাক করার মতো বিষয়। এই গ্রন্থের মূল বিষয় দুটি ভাষায় লিখিত হয়েছে। একটি হিব্রু, অন্যটি আর্মায়িক। কেন দুটি ভাষায় লেখা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই গ্রন্থে দুটি উপাখ্যান বর্ণনা

করা হয়েছে। দানিয়েল নিজে তার বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মী ও অনুসারীদের কথা বলেছেন। যিনি ব্যাবিলনে নেবুশাদনেজার এবং বেলশাজার শাসনে ওই এলাকায় বসত গড়েন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেটাই বর্ণনা করা আছে। অন্য অংশে দানিয়েল নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের কথা জানিয়েছেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন শয়তানের পতন হবে। ঈশ্বর সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নেবেন এবং নতুন করে পৃথিবী রচিত হবে।

তার গ্রন্থের আরেকটি দিক হচ্ছে, তার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে বেল এবং ড্রাগনের। বাইবেলে এসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। ইহুদি এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা এসব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিক চিন্তাবিদরা পবিত্র বাইবেল নিজেদের মতো করে সাজিয়েছেন। তাদের সেই সময়ের ইতিহাস এবং অন্যান্য ঘটনাপঞ্জি পবিত্র গ্রন্থে পুনরায় নতুন করে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা তা গ্রহণ করেছে। পবিত্র বাইবেলে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দানিয়েলের প্রকৃত সত্য ইতিহাসের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ক্রমানুসারে যে ইতিহাসের ধারণা তা ঠিকমতো বর্ণনা করা হয়েছে খুবই কম। সঠিক ধারণা এবং ইতিহাস গ্রথিত হয়েছে কমই। বেলশাজার নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যিনি নেবুশাদনেজারের সন্তান। বাস্তবিক অর্থে তাদের সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। নেবুশাদনেজারের প্রকৃত নাম নেবুশাদেজার।

ব্যাবিলনের শেষ শাসক নবনিডাস। তিনি তার সাম্রাজ্য হারিয়েছিলেন দারিউসের কাছে। অনেকের ধারণা, দানিয়েল নবীর নির্দেশ ছিল এতে। আবার অনেকর মতে, পারস্যের সাইরাসের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। নবনিডাসের ছেলে বেলশাজার কখনোই রাজা হতে পারেননি। যাই হোক, দানিয়েল নবী সম্পর্কে ইতিহাসবিদ এবং লেখকরা যা শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তা সেই সময়ের কথা। তার বইয়ে ব্যাবিলনীয় ইতিহাসের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এমনও প্রচার করা হয়, দানিয়েল প্রার্থনা করেছিলেন রাজা যেন প্রাণে বেঁচে যান। যুবরাজ বেলশাজার রাজধানীর বাইরে বাইরে নবনিডাসের সঙ্গে থাকতেন। তার ধর্মীয় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেন। তবে এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে, নেবুশাদনেজার মস্তিষ্ক বিকৃত অর্থাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে নবনিডাস বেশ কয়েক বছর অসুস্থতায় ভুগেছিলেন। এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে সে আভাস দিয়েছিলেন দানিয়েল বহু যুগ আগেই।

এমনকি ব্যাবিলনে ইহুদিরা বিতাড়িত হবে সেটাও তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। দানিয়েলের এসব কথা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত আছে। এসব ঘটনা কখন ঘটেছে, আর কীভাবেই বা বর্ণনা হয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক লেখক বেন সিরা মহান কাজ সম্পাদন করেন। তিনি ইসরায়েলের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দিয়ে একটি বই তৈরি করেন। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক সত্য যে, এ তালিকায় দানিয়েল নবীর নাম নেই। আবার ইরানের এক দার্শনিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০ শতাব্দীতে তার একটি বইয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ বছর আগের ঘটনা উল্লেখ করেন। সেখানে দানিয়েল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। ম্যাকাবিস বইয়ে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে তার সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য জানা যায়। যথেষ্ট শক্তিশালী প্রমাণ থাকার ফলে দানিয়েল নবীর তথ্য জানা যায়। ম্যাকাবিস গ্রন্থে দানিয়েলের দর্শন এবং ধর্ম প্রচার করা হয়েছে।

দানিয়েলের গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, সমাজব্যবস্থা কার্যকর এবং বাস্তবায়ন হয় সত্যিকার অর্থে খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ শতাব্দীর পরে। ওই বছর জেরুজালেম এবং দানিয়েলের সমাধিস্থল ও উপাসনালয়ে সিরিয়ার রাজা তৃতীয় অ্যান্টিকস আক্রমণ করেন। তিনি জেরুজালেম নগরী এবং দানিয়েলের উপাসনালয় ধ্বংস করে ফেলেন।

রাজা তৃতীয় অ্যান্টিকস মূলত রোম সম্রাট মহাবীর আলেক্সান্ডারের থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। আলেক্সান্ডার নিজেকে ঈশ্বরে প্রতিনিধি এবং তার দর্শনকে ঈশ্বরের ইশতেহার বলে অভিমত পোষণ করতেন। অন্যরা তাকে বদ্ধ উন্মাদ বলত। অ্যান্টিকস জেরুজালেম নগরী এবং দানিয়েলের উপাসনালয় ধ্বংসের কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত করেন খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৪ শতাব্দীতে। এই সময়টি ইহুদিদের সবচেয়ে সংকটকালীন সময়।

ভয়াবহ ক্রান্তিকাল পার করেছে তারা। ৪০০ বছরের অধিক সময় ধরে তারা ব্যাবিলন দখল করে রাখে। ব্যাবিলনবাসী এবং ইহুদিদের জন্য বিপদ ত্বরান্বিত হতে থাকে। তাদের শুধু ধর্ম পালন করতে এবং তারা যে নবীকে বিশ্বাস করে তার প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

সামাজিক কাজকর্মে তাদের কোনো অগ্রাধিকার ছিল না। বাস্তবিক অর্থেই ব্যাবিলনে ইহুদি ধর্মের লোকেরা হুমকির সম্মুখীন হলো। ব্যাবিলন তার স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্য হারান। আর এর সব বিপদ বা ঝড় ইহুদিদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো।

পুরো ব্যাবিলনে ইহুদি গোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কি না এ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। প্রথমে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা ব্যাবিলন জয় করেন। তারপর আলেক্সান্ডার পারস্য জয় করেন।

এরপর আলেক্সান্ডারের উত্তরসূরিরা ব্যাবিলনের অংশবিশেষ দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে একটি বিষয় চিহ্নিত হয় যে, ২০ বছরে জেরুজালেমের ভৌগোলিক এবং মানচিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে সাতবার।

বিশ শতকে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশের মানচিত্র এতবার পরিবর্তন হয়নি। পারস্যরা ব্যাবিলনে ক্ষমতা দখলের পর এবং জেরুজালেমকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ইহুদিদের নিজ দেশে অর্থাৎ যেখান থেকে তারা এসেছে সেখানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণের নির্দেশ দেয়। তবে তাদের অধিকাংশই বিতাড়িত হতে থাকে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যের শীর্ষ কর্মকর্তা ইহুদিদের উদ্দেশে ঘোষণা দেন, এই পৃথিবীর প্রতিটি স্থান এবং সাগর পূর্ণ হয়ে গেছে। তোমাদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই।

ঐতিহাসিক জোসেফ বলেন, 'এই পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে ইহুদিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। বিশ্বের প্রতিটি ভূমিতে তারা রয়েছে। তা যেভাবেই থাকুক না কেন।' তাদের সংখ্যা শুধু পূর্বাঞ্চলেই ৮০ লাখ, যা মোট ইহুদি জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ। আর তারা পূর্বেই বাস করে।

আরো অবাক করা ব্যাপার, ইহুদি জাতি-গোষ্ঠী ব্যাবিলন থেকে বিতাড়িত হলেও তারা যেখানে স্থান করে নিয়েছে, সেখানেই প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আরোহণ করেছে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে। সেইসঙ্গে নিজেদের ধর্মানুসারে বাস করেছে। যতটা সম্ভব মানুষের মাঝে ধর্ম প্রচার করেছে। এসব কারণেই ইহুদিরা প্রকৃত অর্থেই তাদের সুশাসন ও আচরণের জন্য সবার কাছে সম্মানিত হতে থাকে।

হেলেনিস্টিক যুগে বা সময়ে তাদের বিশ্বব্যাপী সাফল্য সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। এ সময় তারা ধর্মের থেকে কিছুটা সরে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই অ-ইহুদি মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। তবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ভয় ঠিকই ছিল। নব্য ইহুদিবাদে বা চিন্তা-চেতনায় রূপান্তরিত হলেও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আদর্শে এবং বিশ্বাসের প্রতি অনুধাবন ঠিকই ছিল।

সনাতনী যুগে ইহুদিরা চিন্তা করল সর্বত্র মিশনারি ছড়িয়ে দিতে। এর উদ্দেশ্য একটাই, তাদের ধর্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বকে জানানো।

এমনকি রোমান কবি হোরাস নিজেই বর্ণনা করেছেন—'যখন আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নিই, তখন আবারও আমাকে লিখতে বাধ্য করা হয়।

এটা একধরনের ছোট্ট অপরাধ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইহুদিদের অনেকেই উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। আমাদের সম্মিলিত শক্তির মাঝে ইহুদিরাও যোগ দেবে।'

কবি হোরাসের এ ধারণা ছিল ভুল। ওই সময়ের ইহুদিরা অন্য প্রাচীন এবং সনাতনী ধর্মের সঙ্গে যোগ দেবে—এ ধারণা সঠিক ছিল না। ইহুদিবাদের কোনো ক্ষুদ্রগোষ্ঠী মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেয়নি।

বরং বহু ধর্মের, বিশেষ করে তাওরাত মৌলবাদী ধর্মপ্রাণ গোষ্ঠী তারা ইহুদি ঈশ্বরের সন্নিবেশিত হওয়ার চেষ্টা করল।

এসব ধর্মপ্রচারক জেরুজালেমে রওনা হতে চাইলেন। তারা জেরুজালেমকে গ্রিসের অন্তর্ভুক্তি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। জেরুজালেম নগরীতে আধুনিক গোসলখানা, শারীরিক পরিচর্যার জন্য জিমনেসিয়াম তৈরি করলেন।

সেই জিমনেসিয়ামে তরুণরা নগ্ন হয়ে শরীর চর্চা করত। তাদের এই আচরণে অনেকই দুঃখ পেত। তারা যোগ ছিল এফিবিয়নে, 'যাকে তরুণ গিল্ড বা কর্ণধার হিসেবে ভাবা হয়।'

এই শাসক শ্রেণীর কর্ণধার বিশালাকৃতির চওড়া টুপি, কাঁধে মাফলার, কোট এবং হিলতলা জুতা পরিধান করতেন। একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল, জেরুজালেম নতুন নাম ধারণ করল। নতুন নাম হলো অ্যান্টিওকা।

এই অ্যান্টিওকা নগরী রোমানদের দ্বারা খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৮ শতাব্দীতে ধ্বংস হলো। এই একই সময়ে মিসরও রোমানদের দখলে চলে এলো। হেসোডক এবং তার সৈন্যবাহিনী এলুসিসের দিকে অগ্রসর হলো। এই এলুসিস হচ্ছে আলেক্সান্ডিয়া নগরীর সীমান্তবর্তী এলাকায়। এখানেই রোমান সাম্রাজ্যের শীর্ষ কর্মকর্তা গিয়াস পপিলাস হেসোডককে দেখতে চাইলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন।

অ্যান্টিকোয়ার তাঁবুতে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। গিয়াস পপিলাস রাজা অ্যান্টিকিয়াসকে নির্দেশ দিলেন মিসর ত্যাগ করার জন্য। তার বাহিনীকে সরে যেতে বললেন। কিন্তু অ্যান্টিকিয়াস প্রত্যাখ্যান করলেন। রোমানরা হুমকি দিল। গ্রিকরাও ঔদ্ধত্য আচরণ করল। এক পর্যায়ে গিয়াস পপিলাস ধৈর্যহারা হলেন। তিনি রাজা অ্যান্টিকিয়াসকে চরমপত্র জানিয়ে দিলেন।

বললেন, 'আপনি এবং আপনার বাহিনী যদি এখান থেকে চলে না যায় তাহলে রোম আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আপনার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে রোম।'

অ্যান্টিকিয়াস বললেন, 'কিছুটা সময় দেখা হোক। এরপর রোমান সম্রাট অত্যন্ত রাগের স্বরে এবং ক্ষোভের সঙ্গে গ্রিক রাজার চারপাশে ঘুরে বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি একটি সারি তৈরি করলেন। মাটিতে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এই সীমানা বরাবর তার সৈন্য বাহিনী আসতে পারবে না।' তারপর তিনি তার তলোয়ার উন্মুক্ত করলেন। অ্যান্টিকিয়াসকে বললেন, 'এই সীমানা পাড়ি দেবেন না; যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আপনার উত্তর পাচ্ছি।'

অ্যান্টিকিয়াস ভালো করেই জানতেন তিনি রোম সম্রাটের ক্ষমতার কাছে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। ফলে মিসর এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সত্যিকার অর্থেই অ্যান্টিকিয়াসের ব্যর্থ ভ্রমণ। তাকে তার নিজ ভূমি সিরিয়াতে ফিরে আসতে হলো।

এই হতাশা এবং দুঃখের মধ্যেও সিদ্ধান্ত নিলেন পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার। রাজনৈতিকভাবে তিনি যেন পরাস্ত হলেন। দুর্বলের কাছে পরাজয় মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি অন্তত সেই ইহুদি গোষ্ঠীকে দেখতে চেয়েছিলেন, যারা ক্ষমতাবান। এই রাগ আর ক্ষোভেই তিনি তার সৈন্যবাহিনীকে জেরুজালেম আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

সেনাপ্রধান খুব ভালো করেই ইহুদিবাদ সম্পর্কে জানতেন। তিনি সাবাথের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এটাও অনুধাবন করতে পারলেন, সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসী সাবাথ যুদ্ধ করবে না। এর জন্য সেনাপ্রধান অপেক্ষা করলেন না।

নগরী ধ্বংস করা হলো। দেয়াল ভেঙে দেয়া হলো। দালানকোঠা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হলো। জবাই করা হলো জেরুজালেমের অধিকাংশ মানুষকে। বাদবাকিদের ক্রীতদাস বানানো হলো।

অ্যান্টিকিয়াস অধ্যাদেশ জারি করলেন, ইহুদিরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে না। সাবাথ নিষিদ্ধ, তাওরাত পাঠ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হলো। ইহুদি ধর্ম উৎসব পুরোপুরি বাতিল করা হলো। সব ইহুদিকে মেরে ফেলা হবে। ধ্বংসযজ্ঞ যেন আরো বাকি ছিল। অলিম্পিয়া পর্বতমালায় জিউস দেবতার (গ্রিক ভাষায় যাকে স্বর্গের দেবতা বলা হয়) মূর্তি মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থানান্তর করা হলো। শূকর ছানার মাংস ভক্ষণ করা হলো। এ যেন আত্মত্যাগের মহোৎসব শুরু হলো। ভয়ার্ত এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় একটা বিষয় অনুভব করা গেল যে, ইহুদিবাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এ যেন দানিয়েলের বইয়েই উল্লেখ ছিল।

দানিয়েলের বইয়ে ইহুদিদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর ফলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, দানিয়েল ছিলেন সাধু এবং তিনি ঈশ্বরকে ভয়

পেতেন। ঈশ্বরের নির্দেশমতো চলতেন। নবী দানিয়েল তার চারটি অভিজ্ঞতার কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করেছেন। এই চারটি অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রথমত সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাসের তাৎপর্য, বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, বইয়ের পাঠকদের সব কিছু জানানো–এ সব কিছুই যেন জরাথ্রুস্ট দর্শন থেকেই আগত। এর মাধ্যমেই সময়ের শ্রেণী বিভাজন এবং পৃথিবীর বয়স জানা যায়। চারটি অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন দেবতার নাম দেয়া এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রথম উল্লেখ রয়েছে–মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আরেকটি প্রথম বিষয় এই যে, তার বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে–সর্বশক্তিমান তার শেষ বিচারের দিনে আগুনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবেন।

নেবুশাদনেজারের স্বপ্নের বিশেষ একটি গুরুত্ব রয়েছে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তার মাথা স্বর্ণের তৈরি। তার বুক এবং দুই বাহু রৌপ্যের, থাই ঘাসের রঙের এবং পা লোহার তৈরি। ঐতিহাসিক নরম্যান কোন তার আগ্রহ বিশ্বকে জানিয়েছেন। তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সম্পর্কে জরাথ্রুস্ট ধর্মগ্রন্থে ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। মহামতি আলেক্সান্ডারের সময়েরও বহু পূর্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সর্বশেষ রক্ষাকারী স্বর্গের মেঘে চড়ে পৃথিবীতে হাজির হলেন। পরে খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা এটা মনে করত, যিশু স্বর্গ থেকে মেঘে ভেসে এসেছেন। আবার এ কথা মনে হতে পারে, এ যেন জরাথ্রুস্ট ধর্মের শিক্ষা থেকে আগত। দানিয়েলের বইয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংসের সময় কবে হবে এবং কী পরিণতি হবে এবং জরাথ্রুস্টবাদে এ ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাস, এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস এবং কল্পনা করা হয়েছে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার হিব্রু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে পৃথিবী তার অস্তিত্ব নিয়ে বেশি দিন টিকতে পারবে না। এই পৃথিবীর যেকোনো সাম্রাজ্য হোক না কেন, সাম্রাজ্যে কোনো মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব যা-ই থাকুক না কেন, তা সব কিছুই স্বর্গ থেকে উৎসারিত আর সব কিছুই ঈশ্বরের নির্দেশে চলে।

পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা তাকে মান্য করে। পৃথিবীতে সব সময় যে সুখ বা আনন্দ ঘটবে তেমন নয়। দুঃসময় আসে। মানুষ যখন ধর্মের নৈতিকতা থেকে সরে আসে, অন্যায় করতে থাকে তখন পুরো সমাজেই শুধু নয়, দেশের ওপর আঘাত আসে। এমনই অবস্থা হয়েছিল ইহুদি ধর্মের।

বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং রাজা ও সম্রাটদের সঙ্গে ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসীদের বিতর্ক এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ইহুদিরা নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করল। নবরূপে অনেক কিছু সাজাল।

রাজা অ্যান্টিকিয়াস ধর্মের এই যে অসাধারণ ক্ষমতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন, তার বিরোধীরা যে এতটা শক্তিশালী। বিশেষ করে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তারা খুবই হিংসাপরায়ণ। এ ব্যাপারে তারা কোনো আপস করত না। নিজের জীবনের থেকেও ধর্মীয় আইন প্রণয়নে রোমান ইহুদিরা ছিল একেবারে এক এবং অনন্য। এ বিষয়টি অ্যান্টিকিয়াসের মাথায় এলো যখন তার প্রতিনিধি জেরুজালেমের থেকে সাত মাইল উত্তরে মদিয়াস গ্রামে গিয়ে ইহুদিদের ধর্ম এবং আচরণ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল।

ইহুদি এবং রোমান ইতিহাসবিদ জোসেফাস যে বর্ণনা করেছেন তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই জাতি-গোষ্ঠী। ধর্মপ্রচারক ম্যাথিয়াস তার ম্যাকাবিস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অ্যান্টিকিয়াসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বর্গীয় দেবতার প্রতি যেন নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

ম্যাথিয়াস আরো বলেছিলেন, 'আইন এবং অধ্যাদেশের দোহাই, ঈশ্বর যেন আপনাকে ক্ষমা করেন। আমরা ইহুদিরা রাজার নির্দেশমতো চলব না। আমাদের ধর্মের নিয়ম-কানুন বাদ দিতে পারি না। এতে আমাদের যত ক্ষতি হয় হোক। ডানে-বায়ে ভাবার কোনো অবকাশ নেই।'

ম্যাথিয়াস যখন তার কথা বলা শেষ করলেন সেই মুহূর্তে এক ইহুদি তার সামনে এলো। তার হাতে ছিল বেদি। তা দেখে ম্যাথিয়াসের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার নির্দেশ ভুলে গেলেন। তিনি বেদির কাছে গিয়ে মাথা নত করলেন। রাজার প্রতিনিধি এক মুহূর্তে দেরি না করে বেদি নিয়ে আগত ইহুদিকে হত্যা করল এবং সেই বেদি মাটিতে ফেলে দিল।

ম্যাথিয়াস এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। বিপদ আঁচ করতে পেরে তিনি পর্বতে উঠে গেলেন। যদিও বৃদ্ধ এই ধর্মপ্রচারক শিগগিরই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় তার পাঁচ সন্তান প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন।

তারা সিদ্ধান্ত নিলেন সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিকিয়াসের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করবেন। তারা তা-ই করলেন। বাবার মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে ম্যাথিয়াসের তৃতীয় সন্তান জুডাস মন্দির পুনরায় দখল করলেন।

মন্দির পুনঃ সংস্কার করা হলো। ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজয় উৎসব পালিত হলো। আলোর বন্যা বয়ে গেল পুরো নগরীতে। পরের বছর জুডাস রাজা অ্যান্টিকিয়াসের মৃত্যুর পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি জেরুজালেমে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ দিলেন।

ইহুদিদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এর ৯ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৪ শতাব্দীতে সর্বকনিষ্ঠ ভাই সিমন ধ্বংসযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি ইহুদিবাদ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে জেরুজালেম প্রতিষ্ঠিত করলেন।

তার মৃত্যু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৩ শতাব্দীতে।

জেরুজালেমে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তার সন্তান জন হারকানুস। হারকানুস জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রসারিত করেন। উত্তরে সামারিয়া থেকে দক্ষিণে ইদুমানিয়া পর্যন্ত জেরুজালেমের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ইহুদি ধর্মে রূপান্তরিত করেন। যেখানেই তিনি পা রেখেছেন, জোরপূর্বক সেই অঞ্চলের মানুষকে ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করেন।

বাস্তবিক অর্থে ইসরায়েলের আবাসভূমি এবং ভবিষ্যদ্বাণী যেন সত্যে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু ইহুদিরা যদি এটা বিশ্বাস করে, ম্যাকাবিয়ান জয়ে তাদের সব অর্জন সম্পন্ন হয়েছে এবং ইসরায়েলের শত্রুদের ওই সব দেশ এবং জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথিবীর ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তাহলে তারা শিগগিরই ভুল করবে।

এ ব্যাপারে গ্রিক দার্শনিকরা সম্ভাব্য ধারণা করেছিলেন যে, ম্যাকাবিয়ান শাসকরা দ্রুত পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি নজর দেবেন।

তারা হাসমেনিয়ান এবং সনাতনী হেলেনিস্টিক যুবরাজের আদর্শ তুলে ধরবেন। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের সম্প্রদায়ের যে যেখানে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং সম্পদ ব্যবহার করবেন। এমনকি সিরিয়ার দূতকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

রাজার বন্ধু অ্যাথেনুমাস জেরুজালেমে ফিরে আসেন। তিনি যখন সিমনের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হন, স্বর্ণ এবং রুপার কাপ বোর্ড দেখে অভিভূত হন। সিমনের ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে বিস্মিত হন অ্যাথেনুবাস।

এ সবই ম্যাকাবিসের প্রথম গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। জন হারকুনাসের ছেলে আরো অগ্রসর হলেন। তিনি জোরপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ পদক ফিলহেলেন্স পদবি গ্রহণ করলেন। খারাপ অবস্থা অব্যাহত থাকল।

নতুন শাসক পরিবার-গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের মতো করে ধর্মযাজক সেজে বসলেন। তারা এমন স্থানে আরোহণ করলেন, যেন ঈশ্বরের নির্দেশে তা করলেন।

মুসার ভাই অ্যারনের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই কাজ হাসমোনীয় জাতি-গোষ্ঠী করতে পারেনি। ধর্মপ্রচারকরা ভিন্ন মত পোষণ করলেন। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা এবং অসন্তোষ দেখা দিল।

ইহুদি সমাজব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে পড়ল। যুদ্ধ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বে এতটা ছাড়ায়নি এবং দেখাও যায়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আলেক্সান্ডার জানুনিয়াস, যিনি ছিলেন অত্যধিক মদ্যপায়ী এবং লাম্পট্যের শ্রেষ্ঠ অধিকারী এবং হাসমোনিয়ান, যিনি ইহুদিদে সকল ঐতিহ্য ভেঙে ফেলেন এবং নিজেই রাজা হন।

তিনি ডেভিডের উত্তরসূরি ছিলেন না। এ অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবে জনতার আক্রোশ রাজার ওপর পড়ল। চারদিকে বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। ধর্মীয় উৎসবে জানুনিয়াস শীর্ষ ধর্মপ্রচারক হয়ে মন্দিরে প্রার্থনা করতেন এবং সবাইকে তা করতে বাধ্য করতেন।

ধর্মীয় উৎসবের সময় তিনি কাঁদতেন। তার মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যেত। তার সহস্র দাস-দাসী বিশাল পাত্রে ফল পরিবেশন করত। জোসেফাসের মতে, এই দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার।

অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, একদিকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, হতাশা, কষ্ট; অন্যদিকে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা, নোংরামি এবং অপকর্ম-ফলে সমগ্র রাজ্যে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল। এ কারণে জাতিকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। টানা ছয় বছর গৃহযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নিজের দখলদারিত্ব এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জানুনিয়াস বিদেশি শক্তি প্রয়োগ করলেন।

জেরুজালেমে বিদেশি দখলদারী স্বত্ব মেনে নিলেন। যুদ্ধে সাময়িকভাবে পরাস্ত হলেও পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করেছেন তিনি।

জোসেফাস বলেন : 'জানুনিয়াস যখন নগরীর ক্ষমতা দখল করলেন তখন মানুষকে তার ক্ষমতার মধ্যে এনে নির্যাতন করলেন। তিনি মানুষকে জেরুজালেমে নিয়ে এলেন। তাদের সেখানে নিয়ে এসে এই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং বর্বর আচরণ করলেন। তিনি নগরীর ৮০০ নাগরিকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন। এখানেও থেমে থাকল না তার অমানুষিক নির্যাতন। ক্রুশবিদ্ধ মানুষগুলো মৃত্যুর আগেই যেন দেখে যায় তাদের নিষ্পাপ শিশুদের কেটে কেটে ফেলা হয়েছে এবং ওই সব মানুষের স্ত্রীদের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

তার সম্পর্কে আরো যা জানা যায়–তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললে সেই মানুষকে কাঠে আটকিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলতেন। এ রকম শাস্তি অবশ্য ইসরায়েলে প্রাচীন শাসনামলে কেউ কখনো দেখেনি।

জানুনিয়াসের মৃত্যু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৭৬ শতাব্দীতে। তার মৃত্যুতে জেরুজালেমবাসী রক্ষা পেল। জানুনিয়াসের সঙ্গে পারস্যবাসীদের ৩০ বছরের

গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এ সময় উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ধর্মপ্রচারক হাসিদিম। তিনিও কোনো আশার আলো দেখতে পাননি।

ইহুদি জাতি-গোষ্ঠীর দুর্ভোগ যেন শেষই হচ্ছে না। এ সময় রোমান সৈন্য পম্বেই ইহুদিদের ওপর চরম আক্রমণ করে। তারা হাসমেনিয়ানদের একই সঙ্গে ধ্বংস করে দেয়। এটা কি ভাবা যায়, ধার্মিক ইহুদিরা কীভাবে তাদের অস্তিত্ব শেষ হলো তা নিজ চোখে দেখতে পেল? পম্বেই নগরী এবং শাসকগোষ্ঠী জেরুজালেম দখল করে নিল। এ জন্য তারা ১২ হাজার মানুষ হত্যা করল।

জেরুজালেম ছিল ইহুদিদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমি। এই স্বতন্ত্র ভূমি দখল হয়ে গেল। ধূলিসাৎ হলো তাদের স্বপ্ন। যুদ্ধ আর হত্যালীলায় রক্তে পরিণত হলো। সাগর হিব্রু ঐতিহ্যে ইহুদিদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল এবং তারা ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলত। কিন্তু তাদের সব কিছু ধ্বংস করে ছিল পম্বেইরা। ফলে ইরানের ঐতিহ্য বিজয়ের পথ সৃষ্টি হলো।

মৃত সাগরে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলন মেলা

জেরুজালেম এবং মৃত সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে ইহুদি জাতি-গোষ্ঠীর সনাতনী এবং বন্য প্রকৃতির মানুষ একসঙ্গে যেন মিলেমিশে বাস করছে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু এলাকা।

স্থলভাগের সবচেয়ে নিচু এলাকা। পুরো এলাকায় সূর্য প্রখরভাবে কিরণ দিচ্ছে। এখানে বাস করে বেদুইন এবং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী। শত শত বছর ধরে যেন তাদের মিলন রয়েছে। এটা ছিল প্রাচীন কালের ঘটনা। এটি এমন একটি স্থান, যেখানে শরণার্থী এবং নতুন অভিবাসীরা একসঙ্গে বাস করছে।

সাগরের উপকূলজুড়ে এই মিলন মেলা যেমন অসাধারণ, তেমনি দেখার মতো। পবিত্র জেরুজালেমে পর্বতমালা থেকে বিশাল এলাকাজুড়ে মরুভূমি আর এই স্থানে বাস করছে সমাজের যত শ্রেণীর বিদ্রোহী বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী।

একই সমাজের গোষ্ঠী বা শ্রেণী বাস করছে। তারা তাদের নিজেদের মতো করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে। তীব্র তাপদাহে ঝলসানো পর্বতমালা এক সময় ইহুদি উপজাতি-গোষ্ঠী নিজেদের সম্পত্তি মনে করত। এই পর্বতমালাকে গির্জার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই পর্বতে বসেই ব্যাপ্টিস্ট জন ধর্ম প্রচার করতেন আর এখানেই যিশুখ্রিষ্টকে শয়তান ভুল পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। এই পাহাড়ে দাঁড়ালে মনে হয় সময় যেন স্থির হয়ে আছে। সেই

যেন ২০০০ হাজার বছর আগে যিশুখ্রিষ্টের সময়কালে ফিরে গেছি। নবীর সেই সুসময়ে ফিরে গেছি। আবার এ কথাও মনে হয়, পৃথিবী যেন ধ্বংস হওয়ার সময় এসে গেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হাসমেনিয়ান শাসনের শেষ দশকে ইহুদি সাম্রাজ্যে কিছুটা হলেও শান্ত এবং সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পেরেছিল তারা।

বহু জটিল চরিত্র এ সময় হাজির হয়। বিশেষ করে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে ইহুদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাঝে আনন্দদানের জন্য ব্যাবিলনীয় তালমদ ওঝার আগমন ঘটে।

ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা কানিনা বেন দোশা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন, তিনি সাপের ঘরে গিয়ে বসলেন। এই সাপের ঘরে তৈরি করেছেন যিনি, তাকেই দংশন করল সাপে। তারা চিকিৎসক কানিনা বেন দোশাকে বিষয়টি জানালো। তিনি তাদের বললেন : আমাকে সাপের গর্তের মুখটি চিহ্নিত করে দেখাও।

তারা সাপের গর্তের মুখ দেখাল। তিনি আর দেরি করলেন না। গর্তের ভেতর পায়ের গোড়ালি ঢুকিয়ে দিলেন। সাপ বেরিয়ে এলো। তিনি সাপ মেরে ফেললেন। মরা সাপ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখলেন সাপটিকে।

কানিনা বেন দোশা সন্তানদের বললেন : হে আমার সন্তানেরা, লক্ষ করো। এটা শুধু একটা সাপ নয়, যা মেরে ফেলা হয়েছে বরং একটা পাপ মোচন করা হয়েছে।

ছেলেরা বলল : এই সাপের সামনে যারা পড়ে তাদের বিপদ হয় আর সাপ যদি কানিনা বেন দোশার সামনে পড়ে তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে পড়ে। কথাগুলো ছেলেরা বীরের মতো করে বলল। প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় শতাব্দীতে চিকিৎসক মিসনা যে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছিলেন তাই যেন বাস্তবায়ন হলো। তিনি বর্গাকৃতির ঘর তৈরি করেছিলেন। এই ঘর ছিল কোনি দ্য মার্কেল। ঈশ্বরের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ হতো।

কোনি দ্য মার্কেল ড্রয়ারের উদ্দেশে তারা বলল : আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করো।

কানিনা বেন দোশা সেই প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বৃষ্টি এলো না। তিনি কিছুটা বিচলিত হলেন। কী করা যায় ভাবছিলেন।

নতুন করে আবার বৃত্তাকার ঘর তৈরি করলেন। নিজে দাঁড়ালেন সেখানে। প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের কাছে দুই হাত জোড় করে বলেন, 'হে প্রভু, তোমার সন্তানেরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তুমি যতক্ষণ না আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করো ততক্ষণ এই বৃত্তাকার ঘর থেকে এক বিন্দু সরে যাব না।' এর কিছুক্ষণ পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো।

কানিনা বেন দোশা বললেন, 'আমি এ ধরনের বৃষ্টি চাই না। এমন বৃষ্টি চাই, যেন প্রকৃতির আশীর্বাদ বয়ে আনে।' শুরু হলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। এই বিরামহীন বৃষ্টির ফলে জেরুজালেমের মন্দির থেকে পুরো ইসরায়েল পর্বতমালা পর্যন্ত এক স্তর ওপরে উঠে এলো। এতে ক্ষুব্ধ হলেন সিমন। তিনি বললেন : 'তুমি যদি কানি না হতে তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে ফেলতাম।' 'কিন্তু এখন আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? তুমি স্রষ্টার কল্যাণ নিয়ে চলাফেরা করো। তার ইচ্ছাই পূর্ণ করো।'

রাব্বি সিমনের হুমকি তেমন কোনো কাজে এলো না। কারণ সে সময় এমন কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি, যাতে ইহুদিবাদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বাস্তবিক অর্থে ইহুদি ধর্ম বহু ভাগে, বহু মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থা অতীতে হয়নি। এক সূত্রে জানা যায়, চব্বিশ অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল ইহুদিবাদ।

৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম উপমালায় ভেঙে দেয়ার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল। এই চব্বিশ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানভাবে জানা যায় বোথুসিয়ানস, এসেন্স, হাসিদিম হেলেনস, হেরোদিয়ান্স এবং মিত্রিনদের কথা। অন্যদের তেমন পরিচিতি বা প্রভাব ছিল না। সম্ভবত অন্য গোষ্ঠীরা ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলত। অবস্থা এমন ছিল, খ্রিষ্টধর্মের প্রধান প্রচারক জন ব্যাপটিস্ট, যিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবী ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং ঈশ্বর তার ধ্বংসাবশেষের কাজ তৈরি করতে বিজন প্রদেশে ধর্মপ্রচারকদের পাঠিয়েছেন। অনেক পণ্ডিত এবং দার্শনিক ধারণা করতেন, ধর্মপ্রচারকগণ ব্যাপটিস্ট এসেন্সের দ্বারা প্রভাবিত।

ইহুদি জাতি-গোষ্ঠীর বিভক্তির বিভিন্ন অংশের তালিকা এবং সেই বিভিন্ন মতাদর্শের প্রধানদের নাম জানা সম্ভব হয়েছিল নানা তথ্যের মাধ্যমে। তাদের বিশ্বাস এবং অন্য ইহুদিদের সঙ্গে নিজের ভিন্নমত পোষণ করত তাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেষ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে রহস্য আরো ঘনীভূত হলো, যখন মৃত সাগরের উত্তর প্রান্তে বহু গর্ত দেখা গেল, যেগুলো প্রকৃত অর্থে গুহা এবং পথনির্দেশকরা বহু তথ্য পেল। ইহুদি ধর্মের নতুন দর্শন এবং ধারণার সন্ধান পেল তারা। এসব ঘটনা ঘটল যিশুখ্রিষ্ট জন্মের ঠিক পূর্বমুহূর্তে।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ধর্মপ্রচারকদের এক বিশাল গোষ্ঠী শুষ্ক নদীতে জেরুজালেম নগরী পুনঃ স্থাপনের বিরোধিতা করল। এই শুষ্ক এবং

স্রোতহীন নদীর নাম ওয়াদি কামরান। অনেকেই ভাবতে শুরু করল, নদী যেহেতু শুকিয়ে গেছে, স্রোত হারিয়ে গেছে, তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হতে বেশি দেরি নেই।

রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক জেরুজালেম উপাসনালয় ধ্বংসের ঠিক পূর্বমুহূর্তের ঘটনা এটি। প্রথম শতাব্দীতে এ ঘটনা ঘটেছে। পবিত্র গ্রন্থ নদী এবং মৃত সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছিল। সেখানে গুহাতে এসব গ্রন্থ পুনরায় পাওয়া গিয়েছিল।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল বিশ শতকের তিরিশ কি চল্লিশের দশকে। এক বেদুইন যুবক দেখল মৃত সাগরের মধ্যে এক বিশাল গুহার ঘর। সেই ঘরের চারদিক বন্ধ কিন্তু জানালা রয়েছে। এ ধরনের ঘর দেখে সে হতবাক হয়ে গেল।

ভাবল, পৃথিবী ধ্বংসের সময় এসে গেছে। হিব্রু ধর্মগ্রন্থে কিছু প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল এ সময়। বাইবেলের সংকলন উদ্ধার হলো তখন। বাইবেলের নতুন সংস্করণ হলো। এসব ঘটনা বিশ্বাস করা ছিল মানসিকভাবে কঠিন ব্যাপার।

সব কিছু রহস্যময়।

দুই হাজার বছরের পুরনো লাইব্রেরি মৃত সাগরে একবারে কাগজের মতো মুড়ে পড়ে আছে–এটা বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি। তবে এটাই সত্যি। খুব কঠিন হলেও কামরান ধর্ম সম্প্রদায় ও লাইব্রেরি এবং পবিত্র গ্রন্থ উদ্ধার করেছিল। এই পবিত্র গ্রন্থ কে বা কারা মৃত সাগরে লুকিয়ে রেখেছিল তার বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের গবেষক এবং বিশদ বর্ণনাকারী হার্শেল শ্যাংকস মৃত সাগর কাগজের মতো মুড়িয়ে যাওয়ার রহস্য এবং এর অর্থ উদ্ঘাটন করেন। তিনি চমকপ্রদ সব তথ্য দেন।

মৃত সাগরের এই মুড়ে যাওয়া গুহার প্রথম দেখতে পায় তামিরাহ জাতির এক সাধারণ রাখাল এজিব। সে কামরান রাজসভাসদের রাখাল ছিল। হঠাৎ করে এই রাখালের একটা পশু দ্রুত সেই গুহার কাছে গেল।

সেখানে গিয়ে অদ্ভুত এক পাথর দেখতে পেল। আরো অবাক হলো, অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনতে পেল ভাঙার শব্দ। যেন মাটির পাত্র ভাঙছে কেউ। এজিব এবং তার বন্ধুরা গুহায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল কোথাও কিছু আছে কি না। তারা বিশালাকৃতির পিতলের কলসি খুঁজে পেল। ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন যুগের লিলেন কাপড়। প্রচুর পরিমাণে কাগজ।

সব কিছু মোড়ানো রয়েছে। কিন্তু এর থেকে সামনে এগোনো তাদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না। হার্শেল শ্যাংকস আরো বর্ণনা করেন এজিব প্রকৃত অর্থে কী দেখেছিল? সেটা কি ছাগল না ভেড়া ছিল?

আর এজিব, যাকে রাখাল হিসেবে ভাবা হচ্ছে সে আসলে কে? পণ্ডিত এবং দার্শনিক ব্যক্তিবর্গ সবাই একমত পোষণ করেন যে, বহু বেদুইন নিজেকে এজিব হিসেবে দাবি করেছে। এমনকি কাগজে মোড়ানো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কবে, কীভাবে পাওয়া গেছে সে ব্যাপারে কোনো দিনক্ষণ উল্লেখ নেই।

বেথেলহেমে যখন এই কাগজে মোড়ানো পবিত্র গ্রন্থ পৌঁছাল তখন এটা এতটাই দুর্বোধ্য ছিল যে, বোঝার মতো উপায় ছিল না। এ সময় বেথেলহেমে বেদুইনরা সম্ভবত এক বা দুজনকে এ কাজে নিয়োগ দিল।

এদের একজন ফাইদি সালাহি এবং অন্যজন খলিল ইসকেন্দার। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো কাগজে মোড়ানো পবিত্র ধর্মগ্রন্থে কী লেখা আছে তা উদ্ঘাটন করতে হবে।

আর কীভাবেই বা মৃত সাগরের ওই গুহায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ চলে গেল।

পৃথিবী সৃষ্টির পর দশ থেকে পনেরো বছর কী ঘটেছিল, কী অবস্থায় ছিল পৃথিবীর অবস্থা তা জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের কাছে। অনেক সন্দেহ জন্ম নিল।

এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো যখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে যিশুর প্রচারিত বাণীর কথা কাগজে মোড়ানো রয়েছে। সেটাই প্রকৃত সত্য বলে ধরে নিল অনেকে।

কীভাবে, কখন এবং কার দ্বারা কাগজে মোড়ানো পবিত্র গ্রন্থ উদ্ধার হয়েছিল তা কখনোই জানা সম্ভব নয়। অন্ধকার যুগে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে ছায়া ইহুদিরা পুরো বিশ্ব এবং সমাজে আবৃত করে রেখেছিল সেটা ছিল দ্বিতীয় উপাসনালয়ের শাসন কালে।

এই সময়টা ছিল ওল্ড টেস্টামেন্টের একেবারে শেষ সময়ে। ওল্ড টেস্টামেন্ট তখন পুরোমাত্রায় ধ্বংস হলো। নতুন টেস্টামেন্ট লিখিত এবং সংগ্রহীত হওয়ার পূর্বেই ইহুদিরা বিশ্বাস করতে শুরু করল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

তারা এ সময় পারস্যের নবী জরথ্রুস্টের শিক্ষার কথা স্মরণ করল। প্রত্যেকে ধারণা করল, ইতিহাসের সেই প্রাচীন দর্শনের কথা। তারা ভাবল, বছরখানেকের মধ্যে এবং তাদের সময়েই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

পৃথিবী যে ধ্বংস হবে তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যাবে ইসরায়েলের কোনো নদী থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস করা একজন মানুষকে উঠে আসছে। পরে সবার শত্রু হবে সে। সব কিছু ধ্বংস করবে সে। এর ফলে মানুষের মনে আকস্মিকভাবে পারস্যের দারিউসের এবং তার উত্তরসূরিদের কথা মনে পড়বে।

এদের মধ্যে একজন আইরম্যান-শয়তানের ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত। তাকে দেখে সবাই তাই ভাববে, আইরম্যান যেমন মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করাতে সারা বিশ্বে চমক দেখাবে তেমনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারীকেও ধ্বংস করবে।

রাজা দারিউস বলেছেন : আহুরা মাজদা শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবেন। যত বিপদ, দুর্ভিক্ষ, মিথ্যার হাত থেকে তিনিই রক্ষার মালিক। ইরানের মানুষ দুটি নৈতিক ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ করে। একটি হচ্ছে ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য, আর দ্বিতীয়ত কোন পথে পরিচালিত হবে সে সত্য ও মিথ্যা পর্যালোচনা করার শক্তি ও ক্ষমতা।

পারস্যের মতে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চিহ্নস্বরূপ আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ হবে। এই আলো এবং অন্ধকার বলতে সত্য ও মিথ্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

জরাথ্রুস্ট দর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে, সব শেষে সত্যের জয় হবে। ঈশ্বরের নির্দেশমতো যারা জীবন পরিচালিত করে তাদের মুক্তি নির্দিষ্ট সময়েই হবে। তার আদর্শ এবং সত্য প্রচারকারীরা প্রভাব বিস্তার করবে। চিরতরে শয়তান ও তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সময় স্বর্গ এবং পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার বার্তাবাহক ঐশিবাণী প্রচার করবেন। তিনি বার্তাবাহকের মাধ্যমে জানাবেন সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা চিরকাল থাকবে। তার শক্তি অফুরন্ত। কোনো শেষ নেই। যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের মূল্যায়ন হবে। নির্যাতিতদের তিনি পরম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অন্ধকে আলো দেবেন, তারা স্বর্গে আরোহণ করবে। সত্য যুগের শুরু হবে এবং এই যুগের বা কালের কোনো শেষ নেই।

'এবং সেই দিনের যাত্রা শুরু হবে যখন মানুষ হবে
ছোট্ট শিশুদের মতো
তারা হাজার বছরের বৃদ্ধ হলেও
শিশুদের মতো থাকবে
হাজার হাজার বছর দিনের মতোই গণনা হবে
সেখানে কোনো বৃদ্ধ থাকবে না
কেউই এক দিনের বেশি বয়স হবে না
সবাই হবে শিশু এবং তরুণ।'

এ ঘটনা যেকোনো সময় ঘটতে পারে। ফলে ইহুদি দেশ, জাতি এবং ধর্ম একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের ঐক্য থাকবে না। পতন ধরবে।

একটা বিষয় খুবই অবাক হওয়ার মতো, মৃত সাগরের গুহা থেকে মোড়ানো ধর্মগ্রন্থের উদ্ধারকৃত লিপিতে বর্ষপঞ্জিকার হিসাব অন্য ইহুদি জাতি-গোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন। এর ফলে তারা ধর্মীয় উৎসব এবং পবিত্র দিন পালন করত তাদের সহযোগীদের থেকে ভিন্ন সময়ে। ইহুদিদের ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে পৃথিবীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণতি। তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি, ঈশ্বরের আইন-কানুনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োগের জন্য বর্ষপঞ্জিকার হিসাবের এই যে ভিন্নতা তা খুব ছোট ছিল না। তাদের হিসাবের ভিত্তিতে বর্ষপঞ্জিকা তৈরি হয় প্রাচীন হিব্রু ধর্মের ঐতিহ্য এবং সনাতনী নিয়মে। জমি চাষাবাদকারী কৃষক, মরুভূমির যাযাবর শ্রেণী, মৌসুমের দিনক্ষণ হিসাব করতে পারত না। তাদের সেটা প্রয়োজন ছিল না। তারা দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরের মৌসুমের প্রান্তিক হিসাব এবং এর ফলে মানুষের শারীরিক সমস্যা কী হতো তাও বোঝার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ইহুদি সম্প্রদায় চন্দ্রমাসভিত্তিক বর্ষপঞ্জিকার পরিবর্তে সূর্যভিত্তিক বর্ষ হিসাব নতুনভাবে প্রচলন করে। নতুনভাবে ইহুদিবাদে বিশ্বাস ও মতবাদ প্রয়োগ হয়। নতুন বর্ষপঞ্জিকা চালু হওয়ার ফলে অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠী বা সাম্রাজ্যের সঙ্গে হিসাবের অমিল ঘটেনি এবং কোনো সংঘর্ষ হয়নি। কারণ এই নতুন বর্ষপঞ্জিকা পারস্যের সম্রাট আকামেন্দিস নিজের সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করেছিলেন। তার সাম্রাজ্যে সূর্যকে ভিত্তি করে বর্ষের হিসাব করা হতো।

ইতিহাসের অনেক ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে এড়িয়ে যায়। এমনই কিছু ঘটনা দৃষ্টিগোচর হলো। সুস নগরীর জেরেক্সের রাজপ্রাসাদের ভেতরে বাগানের সামনে বিশাল এক পাথরের ওপর বসে ছিলাম। দানিয়েলের সমাধিস্থল থেকে আধুনিক সুস নগরীর সব কিছুই সুন্দরভাবে চোখে পড়ে। আধুনিক বলা হলেও বাস্তবে এর কোনো ছোঁয়া নেই। বরং প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে নগরের চারদিকে যেন ময়লার স্তূপ পড়ে আছে। সুস নগরীর প্রশস্ততা ছড়িয়ে গেছে উর্বর মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত। এর পেছনের দিকে সিরিয়ার বিশাল মরু প্রান্তর। এই পেছন বলতে আটশ মাইল দূরে। সেখানেই রয়েছে পবিত্র ভূমি। জেরেক্সের ইতিহাস, বিশাল সমতল ও মরুভূমি এবং পবিত্রনগরী—এ সবই যেন ধর্ম এবং রাজনৈতিক দৃষ্টি যেভাবেই দেখা হোক না কেন, এ যেন ইরানের সংস্কৃতির এবং ভূরাজনৈতিক অংশবিশেষ। ইরাকের বর্তমান যে সীমান্ত এলাকা চলে গেছে এবং মেসোপটেমিয়া আরব শক্তদের দ্বারা দখল হয়ে যায়। ইরাক নামটি এসেছে পারস্য থেকে। এর অর্থ নিচু ভূমি। বাগদাদ নামটি রাখেন ইরানের এক বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক। পারস্যের মতে, বাগদাদ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার উপহার। ইরানের ভূসম্পত্তির মালিক বাগদাদকে ইরাকের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এমনকি বর্তমান সময়ে ইরানে বসবাসরত ইরাকি জনগোষ্ঠী শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়।

ইহুদিদের নতুন আশার সঞ্চারের কাহিনী এখান থেকেই শুরু। দানিয়েলের দুঃখজনক এবং হতাশাজনক কাহিনীর এখানেই শেষ। কিন্তু আমার মনে হলো, কিছুটা ভুল হয়ে গেছে। মৃত সাগরের সংলগ্ন এলাকাজুড়ে ধর্মপ্রচারকরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাস্তবিক অর্থে তা ভুল নয়। বরং সঠিক ছিল। ইহুদিদের বিশ্বাস, পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। প্রাচীন এই পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা বদলে নতুন সমাজব্যবস্থা আসতে যাচ্ছে। এটাকে অনেক ইহুদি পৃথিবী ধ্বংস না বলে রূপান্তর মনে করে। চারদিকে নতুন বিশ্বাস এবং আশার বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে। ইহুদি ধর্ম সম্প্রদায় অন্যভাবে নিজেদের বিশ্বাস প্রতিস্থাপিত করল, যা ইহুদিদের মূল ধর্ম থেকে ভিন্নতর। মূল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে তারা সরে এলো। আর ইহুদিদের এই দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক ঘটনার সময়ই যিশুখ্রিষ্টের জন্ম হলো। ফলে খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর যেন নতুন যুগের সূচনা হলো। আমূল পরিবর্তন হলো খ্রিষ্টধর্মে।

বহু চিন্তাবিদ বলতে শুরু করলেন, ঈশ্বরের অবতার হয়ে যিশু এই পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য এসেছেন। এটা প্রকৃত অর্থে জরাথ্রুস্ট ধর্ম ও মতবাদের থেকে বেশি কিছু নয়। জরাথ্রুস্টের ধর্ম মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ। ইতিহাসবিদ এবং লেখক নরম্যান কোন তার বিখ্যাত গ্রন্থ কসমস, কাওস, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টু কাম গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করে দেখান যে, খ্রিষ্টধর্ম এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ইহুদি এবং জরাথ্রুস্টবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের আচরণও ভিন্ন। ধর্ম পালনের নিয়ম-কানুন এই ধর্ম সম্প্রদায় থেকে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের আলাদা। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মানবজাতির জন্য বড় লজ্জা এবং এর দ্বারা ঈশ্বর মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণভাবেই আর দুই ধর্মের থেকে ভিন্ন এবং নব সংযোজন।

জরাথ্রুস্টবিদ শিক্ষা মানুষের কাজে লেগেছিল তার কাজকর্মের ভিত্তিতে। প্রাক খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে যিশুর বার্তা খুব দ্রুত সমাজে এবং দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখেই ঈশ্বরের ওপর অভিষিক্ত হয়ে খ্রিষ্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসীরা খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তরিত হলো। খ্রিষ্টীয় ধর্ম মতবাদ এশিয়া মাইনর হয়ে পশ্চিমা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। খ্রিষ্টধর্মের বিজয় সূচিত হলো চারদিকে। যিশুর বার্তা সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো। জরাথ্রুস্টের ধর্ম এরই ভিত্তিতে একটা নৈতিক আবরণে এবং আকৃতিতে পৌঁছে গেল। পরবর্তী দুই হাজার বছর এবং এখনো জরাথ্রুস্ট দর্শন ও নৈতিকতা শেষ হয়ে যায়নি।

ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসীদের একটি বিশাল অংশ খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হলো। তারা নিজেদের মতো করে যিশুর বাণী প্রচার করল। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা

যখন জেরুজালেমে ইহুদিদের ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করল তখন ইহুদি ধর্মপ্রচারকগণ নতুন করে ইহুদি ধর্মের রূপান্তর ঘটালেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের বিদ্রোহ বিপর্যয় সৃষ্টি করল। সে সময় শ্রেষ্ঠ ধর্মবিশারদ আকিবা এ ধারণা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন, ইহুদিদের বিপর্যয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মসীহ নিজেই। ইহুদিদের পাপের কারণেই মসীহ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি, আর সে কারণেই রোমানদের কাছে তাদের এত বড় বিপর্যয়। চরম হতাশা, ঈশ্বরের নির্দেশমতো না চলা, তার প্রতিটি আদেশ অমান্য করার কারণেই রোমানদের কাছে নতিস্বীকার করতে হলো ইহুদিদের। এ যেন ঈশ্বর কর্তৃক তাদের শাস্তি। জেরুজালেম ধ্বংসে এবং রোমানদের বিরুদ্ধে ওই অসম যুদ্ধে পাঁচ লাখ ইহুদি মারা যায়। প্রাচীন রাজধানী থেকে ইহুদিরা বিতাড়িত হয়। ঈশ্বরের নির্দেশেই ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি ঘটে। যিশুখ্রিষ্টকে ত্রাণকর্তা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না ইহুদিরা। এমনকি জরাথুস্টের ধর্মনীতিতে দ্বৈত শক্তির প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিল না। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ধর্মপ্রচারক তালমুদ জটিল তথ্য উন্মোচিত করেন। তিনি জানান, প্রথম শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক এলিসা বেন আবু জার তথ্য জনসম্মুখে উপস্থাপন করেন। তিনি ধারণা করেন, স্বর্গে একটি নয়, সম্ভবত দুটি শক্তি বিরাজমান :

স্বপক্ষ এবং স্বধর্মত্যাগী বিরস বদনে বসে থাকবে। তার মন থেকেই ভেসে উঠবে 'তোমার মুখ এবং মন দ্বিমুখী আচরণ যেন না করে। তোমার চেহারার মধ্যেই যেন পাপ কর্মের প্রতিচ্ছবি ফুটে না ওঠে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করো।'

পাপী ব্যক্তি যা দেখবে তা হচ্ছে শয়তান ইহুদিদের মধ্যে প্ররোচনা জোগাবে। এটা একধরনের দ্বৈত সত্তা। তারাও বলবে দুটো সর্বোচ্চ শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

তালমুদের ধর্মপ্রচারকরা বিশ্বাস করেন, তারা ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস থেকে অনেক বেশি পরিশুদ্ধ। জরাথুস্টের ধর্ম মত দুটি সর্বোচ্চ শক্তি ইসরায়েলের এক ঈশ্বরবাদীতে বিশ্বাস যেন অপমানের বস্তুতে পরিণত হলো। পারস্যে ইহুদি নবীর সমাধিস্থলে সুস নগরীতে বসেই এই জাতি-গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় বিশ্বাসীদের দীর্ঘদিনের যে সুসম্পর্ক ছিল তা অনুধাবন করা যায়। এর ফলে পারস্যের অন্য ধর্মের চিন্তাবিদরা এটা ভালোই বুঝতে পারলেন ইহুদিদের চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় দর্শনের কোনো ছাপ নেই। তাওরাত গ্রন্থে অবশ্য পরিষ্কারভাবেই লেখা রয়েছে, ইহুদিরা স্বর্গ, নরক, দেবতা এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনের শুরুতে বিশ্বাস করে। তবে এ শিক্ষা তাদের নবীর কাছ থেকে পায়নি; পেয়েছে আগুরা মাজদার দয়ায়।

আভগ্না মাজদার কল্যাণে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নগরী। পার্সেপোলিসের রাজকীয় নগরী। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সালে মহাবীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে পার্সেপোলিস নগরী ধ্বংস করা হয়

পার্সেপোলিস নগরীর সন্নিকটে ঐতিহ্যবাহী উপসানালয় ধ্বংস হয়। এই উপাসনালয় তৈরি হয় আকেমেনিয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহান সাইরাসের নির্দেশে।

এশিয়ার বহু ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির দলিলপত্র ও নথিপত্র তুলে ধরা হলো। দারিউসের নিজস্ব আইন-কানুন এবং তার সময়ের কাহিনী প্রচার হয়েছে এখানে।

দারিউস নগরী ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। সেই নগরীর সুরঙ্গ পথ। এই সুরঙ্গ পথের দৈর্ঘ্য ৫০০ মাইল।

রাজা দারিউসের প্রতিকৃত। তিনি যেন আত্মবিশ্লেষণ করছেন।

আকেমেনিয় নগরীতে প্রধান শীর্জায় মানুষের মৃতদেহ সংরক্ষণ করা আছে। মহাবীর আলেকজ্যান্ডার সব মরদেহ মমি দিয়ে সংরক্ষণ করেন। বর্তমানে বার্লিন যাদুঘরে সংরক্ষণ করা আছে।

ব্যাবিলনের প্রবেশদ্বার। এটা হচ্ছে ইশতার দরজা। এই দরজার মূল স্তম্ভ বার্লিন জাদুঘরে রয়েছে।

ত্রুস দিয়ে সাতটি বিষয় শুরু। তেহরান হোটেলে সেই চিহ্ন দেখানো হয়েছে। তের শতাব্দিতে প্রাক ইসলাম যুগে ইরানের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এর মাধ্যমে।

শের-ঈ-সাঙ্গি। সিংহের মস্তক মূর্তি। হামাদান নগরীতে এই প্রতিকৃতি স্থাপিত রয়েছে।

হামাদান ইশতার মন্দির। সাসনীয় ইরান গোষ্ঠীরা তের শতাব্দিতে এই মন্দির ধ্বংস করে।

সিংহাসনে বসে মহান দারিউস সৈনাদের কথা শুনছেন। তেহরান জাদুঘরে সেই ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জরাথ্রুস্টের উপসানালয় ধ্বংস করা হয়। আগুনে পুড়ে দেয়া হয়। পুনরায় এই উপাসনালয় তৈরি হয়। ইরানের মুসলিম সম্প্রদায় এই উপাসনালয় দেখতে যায়।

ইতিহাসের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত হেরোডাটাস মেডেস এবং পার্সিয়া নগরী বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দিতে এই নগরী দুটি ধ্বংস হয়।

আফগানিস্তানের বামিয়ান উপত্যকা। সমুদ্র পিঠ্য থেকে ৮০০০ ফুট উচ্চে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধ মন্দির এবং মূর্তি। ২০০০ সালে তালেবানরা এই মন্দির ধ্বংস করে।

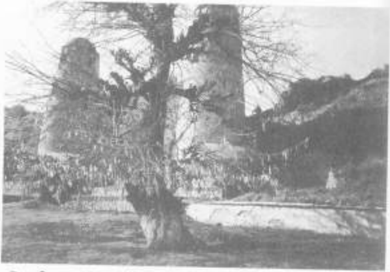

এই গাছটি অনেক ঘটনার স্মৃতি। এই গাছের পাশ দিয়েই তাজিকিস্তানের সিল্ক রোড চলে গেছে।

জরাথ্রুস্টের ধর্মীয় উপাসনালয়ে যাওয়ার পথে সুরঙ্গ পথ। এটা মধ্য ইরানের পথ দিয়ে বয়ে চলেছে। জরাথ্রুস্টের আদর্শের বিশ্বাসীরা আজো এই পথ দিয়ে হেঁটে চলে।

৭.

আশুরা মাজদার দয়া

সাইরাসের শান্তির ঘর

ভোরে যখন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় তখনো প্রকৃতি বেশ অন্ধকার থাকে আর সূর্য যেন ঠিক কমলালেবুর মতো দেখায়। আবার একই দৃশ্য দেখা যায় সূর্য যখন পশ্চিম দিকে হেলে যায়। ভোরে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট দ্বিতীয় সাইরাসের সমাধিস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম আমরা। সাইরাসের সমাধিস্থলে পৌঁছাতে আট ঘণ্টা দেরি হলো। এর পেছনে একটা কারণ রয়েছে। একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটল। আমাদের ট্যাক্সিচালককে চেক পয়েন্টের সামনে জেরা করল পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তার অপরাধ, তার ট্যাক্সিতে গাঁজা পাওয়া গেছে। শাস্তিটাও বেশ চমকপ্রদ। সন্ধ্যায় তাকে বিচারের জন্য আদালতে প্রেরণ করা হলো। আদালতে সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিচারকদের কাছে নিজের আর্জি তুলে ধরল। তাকে জরিমানা করা হলো। হতদরিদ্র এই ট্যাক্সিচালক বলল : স্যার, আমি খুবই গরিব। আমি খুব বেশি জরিমানা দিতে পারব না। পুলিশ এবং বিচারকরা বললেন : তুমি কতটা প্রদান করতে পারবে। ট্যাক্সিচালক বলল : পনেরো হাজার তুমসে। বিচারক বললেন : তাহলে তাই দাও।

আকস্মিক এ ঘটনা দেখে নিজের কাছেও অবাক লাগল। যেখানে ধর্মের এত কড়া শাসন, সেখানেই কিনা প্রকাশ্যে এত বড় দুর্নীতি। এর থেকেই বোঝা যায়, পারস্যের এই সমাজে আরো কত দুর্নীতি রয়েছে। যাই হোক, সাইরাসের সমাধিস্থলে বিকালের আগেই পৌঁছানোর কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম, সাইরাস নগরীর ৩৫ মাইল উত্তরে চলে যাব এবং সেখানে গিয়ে সাইরাসের সমাধিস্থলের পাশে গিয়ে সূর্যোদয় দেখব। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সম্রাট নিজেও সূর্যোদয় দেখতেন। পারস্যো এবং মেডেনে সাম্রাজ্যের যত দূর দৃষ্টি যায় অবলোকন করতেন।

জরথুস্ট নবী সম্পর্কে দীর্ঘ যে অনুসন্ধান তার যেন চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেছি। এটা আসলে পারস্য এবং পারস্যের নবীর কাহিনী। প্রাক ইতিহাস উপাখ্যান, যা অন্ধকার থেকে আলোয় উঠে এলো।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাইরাস শাসনামলে ইরানে বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্মের বিশ্বাস ব্যাপক আকারে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকা থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বৃহৎ, উন্নত, প্রাক সনাতনী যুগে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সাম্রাজ্য খুব কমই ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অবশ্য রোমানদের ক্ষমতা, সাম্রাজ্য এবং শক্তি আর ক্ষমতা বেশি ছিল। এটা আমার একান্ত বিশ্বাস, আগুরা মাজদা সম্পর্কে জরাথ্রুস্টের শিক্ষা, দর্শন, চিন্তা সবই সাইরাসের দৃষ্টান্ত থেকে আগত। আহুরা মাজদা হচ্ছেন জ্ঞানের প্রভু, তার বিপরীতে অ্যাঙ্গরা মানুয়ু, যাকে শয়তানের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনায় সে তার নিজ আসন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আহুরা মাজদার সময়ে যারা ধর্ম নিয়ে ভালো কিছু চিন্তা করত তাদের সুদিন ছিল। তারা সারা পৃথিবীতে পরবর্তী আড়াই হাজার বছর কিছুটা হলেও প্রশান্তি এনে দিতে পেরেছিল।

স্কুলজীবন থেকেই সাইরাস সম্পর্কে বহু ধারণা জানতে পেরেছি। গ্রিক বই থেকে সাইরাসের জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। সাইরাস সম্পর্কে প্রত্যাশিত জ্ঞানার্জন করতে পারি এবং আরো জানার জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকি। সাইরাসের সাম্রাজ্য এলাকায় পৌঁছে হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছা ছিল ঘুরে ঘুরে দেখব। কিন্তু সে আশা পূরণ হলো না। পুরো এলাকার সীমান্ত দিয়ে তারকাঁটার বেড়া। এমনকি কোনো কোনো স্থানে বিশেষ কোনো ব্যক্তিবর্গের কবরস্থান বা সেসব এলাকা পরিদর্শন করতে বড় ধরনের সমস্যা ছিল, নগর পিতার অনুমতি লাগত। প্রধান দরজা বা ফটক বন্ধ থাকত। অনুমতি নিতে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হতো। কিছু সময় ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে তারকাঁটার প্রশস্ত পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ করে অলৌকিক ঘটনা ঘটল। মন্দিরের দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ হলুদ পাজামা পরিহিত অবস্থায় ঘুমন্ত চোখ নিয়ে বিরক্ত মনোভাব প্রকাশ করলেন। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় যেন বিরক্ত হলেন তিনি। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি পাগল? সমাধিস্থলের দরজা ১০টার আগে খোলা হয় না। এখন ৬টা বাজে।

ইরানি বন্ধুটি পরিস্থিতি বুঝে তাকে বলার চেষ্টা করল, তেহরানের প্রত্নতত্ত্ব মন্ত্রণালয় থেকে এসেছি। এ কথা বলেই একটা কাগজ তার সামনে মেলে ধরল। বীরের মতোই যেন কাজটি করল।

এর পরও বৃদ্ধের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং কাগজটা নাড়াচাড়া করে বললেন : 'না, তুমি কোনো সরকারি লোক নও। তোমাকে সমাধিস্থলে এত সকালে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না।' বৃদ্ধের কথা শুনে আমরা হতবাক। ইরানি বন্ধু বেশ রাগের স্বরেই বলল : আপনি কেন এ কথা বলছেন?

বৃদ্ধ বললেন : 'তেহরানের কোনো সরকারি কর্মকর্তা এত সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমাকে এই অনুমতিপত্র দেয়নি। ফলে এই অনুমতিপত্র সঠিক নয়।' আমার ইরানি বন্ধু কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে দশ ডলার বের করে তাকে দেয়ার চেষ্টা করল।

বৃদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন : 'ঘুষ গ্রহণ খুবই অনৈতিক এবং ইসলামবিরোধী কাজ। আমি ঘুষ নিই না। সময়মতো এসো এবং তখন সমাধিস্থল পরিদর্শন করতে পারবে।' বলেই তিনি তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আবারও মন খারাপ হয়ে গেল। ইরানি বন্ধু আমার জন্য কিছু করতে না পেরে তারও খারাপ লাগছিল। এবার আমি নিজেই শেষ চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম, 'বহু দূর থেকে আমি এসেছি। দীর্ঘ ভ্রমণ করতে হয়েছে। সাইরাসের সমাধিস্থল দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা কারণেই এখানে এসেছি।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোথা থেকে এসেছ?

বললাম লন্ডন থেকে। আমার যে সফরসূচি তাতে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদি আপনি আমাদের সমাধিস্থল পরিদর্শন করতে না দেন তাহলে ব্যর্থ মনোরথ নিয়েই ফিরে যেত হবে। আমার পক্ষে হয়তো আর কোনো দিন এখানে আসা সম্ভব নয়। এটা সত্যিই আমার জন্য বড় দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা বটে।

আমার মানসিক কষ্ট কিছুটা অনুধাবন করতে পারলেন বৃদ্ধ। জানতে চাইলেন : তুমি এখানে কী চাও?

ইরানের সর্বপ্রথম এবং মহান শাসকের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

বৃদ্ধ নিরাপত্তারক্ষী পাল্টা প্রশ্ন করলেন : তুমি কি জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী এবং জরাথ্রুস্ট ধর্মের মানুষ?

তাকে বললাম : না, তা নই। তবে আমি ইরানের ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী এবং ইরানের ভক্ত। কয়েক মিনিট অস্বস্তির মধ্যে কাটালাম। মনের বিরুদ্ধে যেন লড়াই চলছে। নিরাপত্তারক্ষী সেই বৃদ্ধ ভেতরে গেলেন। তিনি যেন নির্বাহী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার এলেন। বললেন, একটু অপেক্ষা করো। নিজ ঘরে গিয়ে চাবির গুচ্ছ নিয়ে ফিরে এলেন। চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। আমাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে যখন চলে যাবে তখন আমাকে ডাকবে।

আমার ইরানি বন্ধু রেগে গিয়ে বলল : তার মানে আপনি আবার ঘুমাতে যাচ্ছেন?

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি। তুমি কি তা শোনোনি?'—বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন।

প্রাচীন পারস্যের এই পাসরাগার্ডা ক্যাম্প বা ছাউনি তৈরি হয়েছিল সাইরাসের সময়। এখানে ইরানের যাযাবররা একত্র হতো। ইরানের অন্য প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন স্থানের থেকে এই ছাউনি ভিন্নতর। এই বিশাল ছাউনি ছাড়া অত্র এলাকায় কোনো বিশাল পাহাড় বা টিপি নেই। এটা ছিল মূলত বিশাল নগরী। আকর্ষণীয় কোনো বস্তু ছিল না।

বর্তমান সময়ের পর্যটকরাও এখানে রাজকীয় প্রাসাদে ভ্রমণে এসে বা জড়ো হয়ে অতীতের স্মরণীয় কোনো স্মৃতির কথা খুব কমই স্মরণ করতে পারে।

পার্সেপোলিস রাজপ্রাসাদ এবং সমাধিস্থলে গিয়ে মানুষের মধ্যে যেমন অনুভূতি জন্মে, নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ঠিক বিপরীত অবস্থা পাসরগার্ডা ছাউনিতে। কোনো অনুভূতির সৃষ্টি হয় না। এশিয়ার সাবেক রাজা বা শাসকগোষ্ঠীর মৃতদেহের যেন ছায়া দেখা যায়; কিন্তু তাদের ঐতিহ্যের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। শুধু সাইরাসের নিজস্ব রাজপ্রাসাদের সাদা রঙের স্তম্ভের নকশা চিহ্ন দেখা যায়।

বিশাল একটা দরজা দেখতে পেলাম। সেই দরজায় যেন দেব-দেবী বসে আছে। চারটি ডানা মেলে ধরে আছে দরজাটা। সেই দেবীরা আসিরীয়দের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করেছে। আবার তাদের মাথায় মিসরীয় স্টাইলের পশমি ঝুঁটি। ঘুরে ঘুরে সমাধিস্থল দেখছিলাম।

নির্দেশক এবং গাইড বইয়ে যেভাবে বর্ণনা করা আছে তা হচ্ছে আকামেনীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের শেষ স্তর। তিনি এই সমাধিস্থল পূর্ণ করেন। এই সমাধি ক্ষেত্রেই পারস্যের সব পরিত্যক্ত বস্তুর সমন্বয় ঘটেছে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, স্বর্গীয় দেব-দেবীর প্রতি যে বিশ্বাস পারস্যরাই সারা বিশ্বে এর পরিচিতি ঘটায়।

বর্তমান সময়ে যা শুধু কল্পনাই করা যায়। এটা ছিল প্রথম মডেল। আর প্রতিটি দেব-দেবী, যেন পাখা মেলে থাকত। পারস্যের শিল্পকলাতে সেভাবেই দেবীদের তুলে ধরা হতো।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধারণা করতেন, দেবতার প্রতিনিধিরূপে সাইরাস নিজেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।

পারস্যের এলামিতে এবং ব্যাবিলনে সর্বদা প্রচারিত হতো :

> *'আমি সাইরাস রাজা, কাম্বুজিজার সন্তান। তিনিও রাজা, হাকিমানিশের উত্তরসূরি।'*

আধুনিক যুগের বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ সাইরাস রাজার আদর্শ চিন্তাদর্শন, বিশ্বাস এবং সেইসঙ্গে জরাথ্রুস্ট ধর্মের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মিল খুঁজে পান। ইতিহাসবিদগণও সুগঠিত ধারণা পান এই দর্শন থেকে। তবে সাইরাসের সাম্রাজ্য খুব বেশি সুপরিচিতি পায়নি। এত কিছুর পরও সাইরাস রাজা আনসান এলাকা দখল করে নেন।

মেডেস, পারস্য, ব্যাবিলন, লিডিয়ান এবং আরো অনেক জাতি-গোষ্ঠী পার্সেপোলিস নগরীর আকামেনিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল। তবে এ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সাইরাস রাজার বলরুমে অডিয়েন্স হল বিশাল এক পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক সময় এই বিশাল অডিয়েন্স হলরুমের পিলার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। মন্দিরের এক প্রান্তে একটি জানালা এখনো ঠিক রয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, দর্শকদের বিশাল হলরুম ধূসর বালিতে ভরে আছে।

সাইরাসের সমাধিস্থলের চারপাশে বাগান। পারস্যের ভাষায় যেন স্বর্গোদ্যান। বাইরের জগৎ থেকে এই বাগান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শুকনো এবং ধূসর বালি বাগানে পড়ে না। বাগানের চারপাশে দেয়াল থাকার কারণেই এতটা সুন্দর রয়েছে।

বর্তমান সময়ে সৌদি আরবের জনগোষ্ঠীর আচরণ কেমন? এক সময় সৌদির লোকেরা ঘোড়া এবং উটের গাড়িতে চড়ত। থাকত তাঁবুতে। আজ সেখানে টয়োটা, ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি আর সুরম্য অট্টালিকা এবং সুন্দর বাংলো রয়েছে। সাইরাস সম্ভবত ভাবতে পেরেছিলেন, তার জনগোষ্ঠী এক সময়

যাযাবর থেকে মুক্তির জন্য, তার দেশকে আধুনিক করার জন্য দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নেয় এবং নগরীকে সে সময়ের বাস্তবতায় আধুনিক করে। সাইরাসের নিজস্ব প্রাসাদ, অর্ডিয়েন্স হল এবং মন্দির–এ সব কিছুই পাথর, ইট এবং কাঠ দিয়ে স্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

সম্ভবত তিনি ধারণা করেছিলেন, তার রাজ্য সুদীর্ঘ সময় ধরে সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করবে। শুধু এ কারণেই একান্ত নিজস্ব রাজপ্রাসাদের নকশা বারবার সংস্কার করা হয়েছে। পুনঃ সংস্কার করা হয়েছে বহুবার। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় এলাকা, যেমন মূল দরজা থেকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর পর্যন্ত সাধারণ দর্শনার্থীদের সূর্যের প্রখরতা এবং গরম থেকে রক্ষার জন্য ঢেকে দেয়া হয়েছে।

প্রাসাদের দালানকোঠাগুলো বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বাস্তবিক অর্থে বাগানের ভেতরেই রাজপ্রাসাদ। যে কেউ কল্পনা করতে পারে, রাজা সাইরাস তার সুন্দর পোশাক পরে হাতে স্বর্ণের আংটি এবং হীরার ব্রেসলেট পরে এই বাগানে আসতেন। তিনি আসন গ্রহণ করতেন পশমের কার্পেটের ওপর।

চারপাশে বাতাস দিত সুন্দরী রমণীরা। সেখানে উপস্থিত থাকতেন পারস্য এবং মেখেল কবি, জাদুকর এবং নাচনেওয়ালি। সারা বাগানে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ছিল।

দুই হাজার বছর পরও বাগানটি দেখলে সেই সব দৃশ্যের কথাই যেন মনে পড়ে।

সেই স্বর্গোদ্যান বাগানে রাজা সাইরাস সারা দিনের কাজ শেষ করে এসে বিশ্রাম নিতেন। এখানে ভ্রমণে এসেছিলেন মহামতি বীর আলেকজান্ডার। তিনিও এই অসাধারণ সুন্দর বাগান দেখে অভিভূত হন। বিশেষ করে কিউবিক সাদা পাথরগুলো কীর্তিস্তম্ভের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে।

মেসোপটেমিয়ার মন্দির এবং সমাধিস্থল ঘন সাদা পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি সমাধিস্থলের কিউবিক সাদা পাথর ৩০ ফুট উঁচু। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘন সাদা পাথরের এক পাশে দরজা। এখান দিয়েই সমাধিস্থলের ভেতরে প্রবেশ করতে হয় এবং বের হতে হয়। সেই দরজা এখন বন্ধ। রাজপ্রাসাদ এবং সমাধিস্থল এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই এসেছিলেন টেলিভিশনের ফিল্ম পরিচালক মাইকেল উড।

তিনি সমাধিস্থলের কিউবিক সাদা পাথর এবং সমাধিস্থলের প্রবেশদ্বার দেখে অবাক হন। আর এই সমাধিস্থলের পাশেই মধু এবং দুধ বিক্রি হচ্ছে।

এই স্বর্গোদ্যান এবং এর অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদরে দালানের সামনে দাঁড়ালে অতীত ইতিহাস মনে পড়ে যায়। এখানেই খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সালে আলেক্সান্ডার বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন। সমাধিস্থল খুবই শোভামণ্ডিত এবং সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে।

রাজা সাইরাসের মৃতদেহ স্বর্ণ দিয়ে চারদিকে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তার পাশেই রয়েছে স্বর্ণের টেবিল। সাইরাসের তলোয়ার এবং তার ব্যবহৃত টুপি। সমাধিস্থলের স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী যেন পুরোহিতমণ্ডলী। তারা ধর্মকর্ম করতেন।

সোনা-রুপা এবং মূল্যবান বস্তু ছুঁয়েও দেখতেন না। আলেক্সান্ডার এই সমাধিস্থলে এসে দেখলেন স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা ছড়িয়ে আছে। আর সাইরাসের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, সমাধিস্থল সংরক্ষণ করা হোক এবং বাইরে থেকে বন্ধের নির্দেশ দিলেন।

গ্রিক ইতিহাসবিদদের মতে, এখানে এসে যে কেউ অভিভূত হতো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথাই যেন প্রতিধ্বনি হতো : 'হে মানব সন্তান, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, তুমি জানো যে আমি সাইরাস। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আমাকে অবহেলা কারো না। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আমি শায়িত রয়েছি।'

বাস্তবিক অর্থে রাজপ্রাসাদ এবং সমাধিস্থলের কোথাও কোনো লেখা নেই। অতীতের পণ্ডিতগণ ধারণা করতেন, এই বাণী রোমান্টিক কল্পকাহিনী মাত্র। এর পরও ১৯৭০ সালে খুব সতর্কতার সঙ্গে ইরান সরকার পাথরের স্তম্ভগুলো নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পায় কিছু লেখা রয়েছে। এটা পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের কিছু দর্শনতত্ত্ব। কিন্তু সাইরাসের কোনো মন্তব্য নেই। এখানে বলা হয়েছে, আত্তরা মাজদার স্বর্গের প্রতীক এই সমাধি ক্ষেত্র। এখানে স্বর্গীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন যেন তুলে ধরা হয়। পার্সেপোলিস এবং অন্য প্রাচীন নগরীর প্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়িত্ব সব কিছুই যেন এখানে মিলিত হয়েছে। বাস্তবিক অর্থে জরাথ্রুস্ট দর্শনের বিজয় হলো। এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, সাইরাস নিজেই জরাথ্রুস্ট আদর্শে বিশ্বাসী এবং অনুসারী ছিলেন। ইতিহাসবিদদের মধ্যে অনেকেই এ নিয়ে তর্ক করেন। তারা বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

আলেক্সান্ডার বহুবার এই সমাধিস্থলে এসেছেন। প্রতিবার তিনি নতুন করে রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার সাম্রাজ্যের শাসকদের

সুন্দরভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কিন্তু এটাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মেসিডোনিয়ার এই বীরের সঙ্গে পারস্যের সম্রাটের রাজপ্রাসাদ নির্মাণে বিরোধ হয়। এত বিরোধ সত্ত্বেও আলেক্সান্ডারের ব্যাপক সমর্থন এবং তার বিশাল বাহিনী কখনোই চেষ্টা করেনি আলেক্সান্ডারের গতিরোধ করতে। তিনি যখন যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন। মহান সাইরাসের ইতিহাস যেন মুছে গেল। তবে সবাই ভাবল, সুশাসক একদিন আসবেনই।

গ্রিক শাসকরা পরবর্তী সময়ে পারস্যবিরোধী অপপ্রচার শুরু করেন। ঐতিহ্য এবং স্বৈরশাসকের মধ্যে পাশ্চাত্যের স্টাইলে গণতন্ত্র চালুর চেষ্টা করেন। আরো অবাক করা বিষয় এই যে, সাইরাসকে আদর্শ রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাকে হেরোডোটাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গ্রিক সৈনিক এবং ঔপন্যাসিক জেনোফন খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তার উপন্যাস উৎসর্গ করেন আরেক ঔপন্যাসিকের প্রতি। তিনি সাইরাসের জীবন নিয়ে 'সাইরোপেডিয়া' বা 'সাইপ্রাসের শিক্ষা' নামে উপন্যাস লেখেন। তিনি পারস্যের এই সম্রাট এবং তার সাম্রাজ্যকে সকল শাসকের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

ধূসর পর্বতের ওপর দিয়ে ভোরে যখন সূর্য উদিত হয় তখন সমাধিস্থলের ছাদ পারস্যের গোলাপের পানি দিয়ে ধোয়া। এ সময় পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সেই পঙ্‌ক্তি মনে করার চেষ্টা করলাম। সাইরাস নিজে ঈশ্বরের প্রধান অস্ত্রশক্তি মনে করতেন এবং প্রবাদে আছে :

'হে আমার অনুগত মানুষ,
সে আমার দাস হতে পারে
যাকে আমি করুণা করি
আমিই ঠিক করি যাকে আমি আজ্ঞা দিয়ে উজ্জ্বল করি
আমি তার মধ্যে নবশক্তি দিই
ধর্মীয় শক্তি বিরাজ করে তার মধ্যে
সে পুরো দেশ-জাতির মাঝে সুবিচার করে।'

পারস্যের সাম্রাজ্যের এই বিশাল রাজপ্রাসাদ বাস্তবিক অর্থেই গ্রিক এবং ইহুদি গোষ্ঠী থেকে হুমকি এসেছিল, এমনকি সাইরাস রাজার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধী গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এটাই সাইরাস উপাখ্যানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। হেরোডোটাস থেকে বর্ণিত

হয়েছে যে, পারস্যের এই সম্রাটের মৃত্যুর পর তার জিহ্বা বের হয়ে গিয়েছিল।

রাজার এই মৃত্যুর প্রায় শত বছর পর গ্রিক ইতিহাসবিদরা সাইরাকে নিয়ে নানা ধরনের কল্পকাহিনী প্রচার করেন। বিখ্যাত গ্রিক ঔপন্যাসিক হোমার সাইরাসের কাহিনী নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।

পারস্যে মুসা, সারগন এবং জরাথুস্টের কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। এর সব কিছু শুরু হয়েছিল আশতাগিয়াস যুগেই। আশতাগিয়াস ছিলেন মেডেসের রাজা। পরে তিনি ইরানের শাসক হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। পুরো ইরান তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। শুধু তা-ই নয়, অ্যানাতোলিয়ার পুরো দায়িত্ব তার নখদর্পণে ছিল।

আশতাগিয়াসের কন্যা মেনডেন। কন্যা যখন বড় হলো তখন তাকে খুবই সাধারণ ঘরে বিয়ে দেন। হেরোডোটাসের তথ্য থেকে জানা যায়, আশতাগিয়াস কোনো মহান পরিবারের সন্তানকে বেছে নেননি কন্যার বিয়ের জন্য। তিনি প্রাচীন পারস্যের কাম্বুজার দরিদ্র পরিবারের এক ছেলের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন।

তারা সুখে-শান্তিতে বাস করছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হলেও তাকে পারস্যের রাজবংশের প্রধানরা শ্রদ্ধা করত। মেনডেনের গর্ভে সন্তান এলো। ঠিক এ সময় রাজা আশতাগিয়াস ভয়াবহ এক স্বপ্ন দেখলেন। তার কন্যার দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে একটি আঙুরগাছ উঠে যাচ্ছে এবং তার ছায়া পুরো এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন আশতাগিয়াস। তিনি সব গণক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদদের খবর দিলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

রাজা আশতাগিয়াসের স্বপ্নের কথা শুনে গণকরা বললেন, মেনডেনের সন্তান একদিন ইরানের সাম্রাজ্য শাসন করবে। সে আশতাগিয়াসের রাজপ্রাসাদ দখল করে নেবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজা আশতাগিয়াস। যখন মেনডেনের সন্তান জন্ম নিল রাজা ভালোই জানতেন তিনি একদিন এই ছেলের দ্বারা অপসারিত হবেন।

এই ছেলেই ইরানের সাম্রাজ্য দখল করবে। এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন আশতাগিয়াস। কাপুরুষের মতো আচরণ করলেন তিনি। তার নিরাপত্তারক্ষী এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাস হারপাগাসকে ডেকে পাঠালেন। হারপাগাস রাজার সব নির্দেশ পালন করতেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, এই শিশুকে গহিন

বনে নিয়ে হত্যা করো। হারপাগাস শিশু সন্তানকে তুলে নিয়ে গহিন বনে চলে গেলেন; কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারেননি।

যার শরীরে রাজ পরিবারের রক্ত, রাজবংশের শিশুকে হত্যা করেনই বা কীভাবে। একদিন এই শিশু বড় হয়ে সব কিছুর জবাব দেবে। তিনি এক গরিব রাখালের কাছে সন্তানটি দিয়ে দিলেন। তাকে গহিন বনের ভেতর পাহাড় থেকে অনেক দূরে চলে যেতে বললেন। সেইসঙ্গে এ নির্দেশও দিলেন, হিংস্র পশু যেন শিশুকে আক্রমণ না করে। তাকে যত্ন কোরো।

এর জন্য সময়মতো খরচ জোগাবেন তিনি। আর ঠিক ওই সময়ই রাখালের স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। রাখালের জোড়া সন্তান একই সঙ্গে বড় হতে থাকে। তা সত্ত্বেও মেনডেনের সন্তান, যাকে মৃত বলে জানেন রাজা আশতাগিয়াস,

সেই সন্তান ভিন্ন চিন্তাধারায় বড় হলো।

আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তার শরীরে রাজবংশের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। রাখালের পরিবারে শিশুটি বড় হলো। শারীরিক ও মানসিকভাবে সে ছিল খুবই শক্তিশালী।

যখন তার বয়স ১০ বছর সে সময় গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিল সে। বন্ধুরা তাকে খেলতে আহ্বান করে। তারা রাজা-প্রজার খেলা খেলছিল। তাকে রাজা বানাল। তার বন্ধুদের মধ্যে আয়তেখারসের সেই সন্তান ছিল মেডেনের সবচেয়ে সেরা। বাস্তবিক অর্থে সে রাজবংশের সন্তান।

এই ছোট্ট ছেলেটি একদিন সাইরাসের আদেশ অমান্য করল। রাজা সাইরাস ক্ষিপ্ত হলেন এবং তার বন্ধুদের নির্দেশ দিলেন ছেলেটিকে বন্দি করতে। রাজার নির্দেশে বন্ধুরা তাকে গ্রেপ্তার করল। ছেলেটির বাবা খুব ভয় পেলেন। রাজা আশতাগিয়াসের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে সাইরাস বন্দি করেছেন।'

ছেলেটিকে রাজা আশতাগিয়াসের কাছে নিয়ে আসা হলো। রাজা বললেন : তুমি সামান্য পরিবারের সন্তান, যদিও তুমি এমন একজনের নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখিয়েছ, যাকে আমি আমার সাম্রাজ্যের সেরা ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করি।

ছেলেটি উত্তর দিল : 'হে মহামান্য রাজা, আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় যা মনে হয়েছে তা-ই করেছি। আমরা গ্রামের ছেলেরা সবাই একসঙ্গে খেলা করছিলাম। বন্ধুরা আমাকে রাজা হতে বলল। তারা ভাবল, রাজা হওয়ার মতো

আমি উপযুক্ত। আমরা রাজা-প্রজার খেলা খেলছিলাম। রাজার সভাসদে যা হয় তাই নিয়েই আমাদের খেলা। যেহেতু আমাকে রাজা বানানো হলো এবং আমার বন্ধুরা হলো প্রজা তাই তাদের আমি যে নির্দেশ দিই তা তারা পালন করে। কিন্তু এই সাইরাস কে? তাকে আমি চিনি না। তার নির্দেশ আমি মানতে বাধ্য নই। এটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে যেকোনো শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। আমি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব।' রাজা আশতাগিয়াস এ উত্তর শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। ছেলেটি এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে, যেন সত্যিই সে কোনো রাজবংশের ছেলে। আশতাগিয়াসও যেন তার অতীত স্মৃতির কথা ভুলে গেছেন। তিনি যে এই ছেলেটিকেই একেবারে একদিনের শিশু অবস্থায় থাকার সময় তার নিরাপত্তারক্ষীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা মনেই করতে পারেননি। এ সময় রাজা তার নিরাপত্তারক্ষীকে বাধ্য করলেন কে এই সন্তান তা বলতে। নিরাপত্তাকর্মী বাধ্য হয়ে সব সত্য প্রকাশ করলেন। ছেলেটির প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরলেন রাজার কাছে। পুরো কাহিনী প্রকাশ পেল। মেডেন রাজা ভীত হয়ে পড়লেন। তবে খুশি হলেন। তার রাগ প্রশমিত হলো। নাতিকে ফিরে পেয়ে তিনি খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন : এটা কোনো সামান্য ঘটনা নয়। এমনকি আমার কন্যার জীবনেও অনেক দুঃখ-কষ্ট এসেছে। এখন সব কিছু পাল্টে যাবে। ভালো কিছুর সূচনা হতে যাচ্ছে। জামাই হারপাগাসকে বললেন, তোমার সন্তানকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসো। নতুন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে নৈশভোজে যোগদান করো। আমি এই উৎসব ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করব। তাকে সম্মানিত করব, যিনি আমার নাতনিকে বাঁচিয়েছেন, তার জীবন রক্ষা করেছে।

হারপাগাসের ১৩ বছরের ছেলে রাজপ্রাসাদে পৌঁছালে তাকে রাজা বন্দি করেন। তার ঠোঁট কেটে ফেলেন। শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে রোস্ট বানালেন। হত্যা করলেন ছেলেটিকে। শুধু তার মাথা, হাত এবং পা বিচ্ছিন্ন করে একটি সুন্দর ঝুড়িতে রেখে দিলেন।

রাজার অনুরোধে হারপাগাস নৈশভোজে এলেন। নৈশভোজে রাজা, সভাসদবৃন্দ এবং হারপাগাস যোগ দিলেন। রাজা এবং তার সভাসদবৃন্দ রুটি-মাখন খাচ্ছিলেন। হারপাগাসকে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হলো। রাজা নিজে তার জন্য এই বিশেষ খাবার তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হারপাগাস মাংস ভোগ করছেন। এ সময় রাজা আশতাগিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে এ নৈশভোজের খাবার?' হারপাগাস বললেন : 'খুবই উপভোগ্য।' রাজা তার নিষ্ঠুরতার চরম পরিণতি প্রদর্শন করলেন। বাবুর্চিদের বললেন : মৃত ছেলেটির মাথা, পা এবং হাত নিয়ে আসতে।

বাবুর্চিরা ঝুড়ি নিয়ে এলো। তারা হারপাগাসের সামনে রাখল ঝুড়িটা। রাজা তাকে ঝুড়ির ঢাকনা খুলতে নির্দেশ দিলেন। হারপাগাস ঢাকনা খুললেন। তিনি দেখলেন তার মৃত সন্তানের মাথা, হাত এবং পা। তিনি বুঝতে পারলেন তাকে তার সন্তানের মাংস পুড়িয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এত কিছুর পরও কোনোভাবেই উত্তেজিত হননি হারপাগাস। বরং শান্ত থাকলেন। আশতাগিয়াস তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যদি জানতে কোনো বন্য মানুষ হত্যা করে তোমাকে তার মাংস ভক্ষণের জন্য দেয়া হচ্ছে তুমি তখন কী করতে?' হারপাগাস দুঃখ চেপে বললেন : 'রাজার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতাম।' এ কথা বলার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সব মাংস নিয়ে বাড়িতে এলেন। সব একত্র করে পুড়িয়ে ফেললেন।

> *আশতাগিয়াস যদি ভেবে থাকেন যে তার নিষ্ঠুর কাজের জন্য তিনি খুশি এবং তার আদেশ অমান্য করার দায়ে হারপাগাসকে শাস্তি দিতে পেরেছেন তাহলে তা হবে সবচেয়ে বড় ভুল। সন্তান হারানোর জ্বালা কত নির্মম হতে পারে তা হারপাগাসই জানেন। তিনি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তবে তিনি অন্য দশজনের মতো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রতিশোধের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন না। রাজাকে অন্ধ করে দেয়া বা টুকরো টুকরো করার চিন্তাও তিনি করেননি। প্রতিশোধের চিন্তা মনের ভেতরে পোষণ করেই বরং রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতি এর প্রতিশোধ নিক। সর্বশক্তিমানের কাছে সে প্রার্থনাই করতেন। তার সন্তানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে রাজা আশতাগিয়াস একদিন ঠিকই শাস্তি পাবেন এই বিশ্বাস হারপাগাসের ছিল। সন্তানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য হারপাগাস দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং অপেক্ষা করেছিলেন।*

সাইরাস যখন পরিপূর্ণ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন থেকে চেষ্টা করতে থাকেন ইরানের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বৈষম্য, রক্তপাত, হানাহানি তা বন্ধ করে তাদের এক কাতারে নিয়ে আসতে। ৪০ বছর বয়সে পারস্যের সব জাতি-গোষ্ঠীকে একত্র করেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তার একক শাসন এবং শক্তি ও ক্ষমতার কারণেই। হারপাগাস তার ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি সাইরাস তাকে পরিপূর্ণ সমর্থন করেন তাহলে পারস্যের তরুণদের মহানুভবতা শেখাবেন এবং রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপণ করবেন। ছড়িয়ে দেবেন সাম্রাজ্যজুড়ে বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য একটাই–আশতাগিয়াসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া। সাইরাসও বুঝতে পারলেন তার ক্ষমতা দখলে প্রধান সুযোগ রাজধানী মেডেনে পারস্যের

সেনাদের নিয়ে বিদ্রোহ করা। উপরন্তু তার সৈন্যরা বেশি দক্ষ নয়। অস্ত্র বলতে তলোয়ার এবং বর্শা। বাস্তবিক অর্থে আশতাগিয়াসের বিশাল সৈন্য এবং অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে এটা কিছুই নয়। ফলে যা কিছু করতে হবে তা হচ্ছে আশতাগিয়াসের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা এবং তার বিরুদ্ধে সৈন্যদের লেলিয়ে দেয়া। তিনি যখন জানতে পারলেন পারস্যের সৈন্যদের মধ্যে নবচেতার সৃষ্টি হয়েছে এবং আশতাগিয়াসের নিষ্ঠুর চরিত্রের কাছে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে তখন মেডেনের সেনাপ্রধান হিসেবে হারপাগাসকেই নিয়োগ দেয়া হলো। এখানেই প্রচণ্ড ভুল করলেন আশতাগিয়াস। এতে সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন হারপাগাস। সাইরাসের জন্য বড় সুযোগ এসে গেল পারস্যে ক্ষমতা দখলের। পারস্যের যুব ও বৃদ্ধ সবাই একে অপরের মধ্যে রক্তপাত শুরু করল। এক পর্যায়ে সৈন্যদের মধ্যে রক্তপাত শুরু হলো। তাকে আটক করা হলো। প্রহার করল সৈন্যরা। এক পর্যায়ে মহান দ্বিতীয় সাইরাস ইরানের আকামেনিদের সম্রাট হন। এ সবই খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ শতাব্দীতে।

ব্যাবিলন বিজয়

সাইরাসের জীবন কাহিনী, তার সাম্রাজ্য এবং বিশাল ক্ষমতা সম্পর্কে হেরোডোটাসের বর্ণিত কাহিনী মানুষকে প্রলুব্ধ করে বটে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তা মানুষ নিজের মতো গ্রহণ করেছে। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্বের বর্তমান অবস্থা আর প্রাক খ্রিষ্টযুগের ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুটি সময় এবং রাজনৈতিক এবং সামাজিক মূল্যায়ন ভিন্ন। সাইরাস সম্পর্কে ১৮৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক চার্লস কিংসলে বিশাল তথ্য হাজির করেন। তিনি শিশুদের নিয়ে 'ক্ল্যাসিক দ্য ওয়াটার বেবি' রচনা করেন। হেরোডোটাস সম্পর্কেও তার বিরূপ ধারণা ছিল। হেরেডোটাসকে ইতিহাসের জনক না বলে মিথ্যার জনক বলা যায়। তার সম্পর্কে বই পড়ে থাকলে আর নতুন করে কিছু বলার নেই; আর যদি না পড়েন তাহলে বলব আপনাদের পড়া উচিত—এটাই তার বক্তব্য। ধর্মযাজক হোয়াটলের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের সম্পর্কে ঐতিহাসিক সংকট এবং সন্দেহ এই গ্রন্থে সব কিছু উল্লেখ আছে।

ধর্মযাজক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন মহান সম্রাট নেপোলিয়ন জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু এ সবই কাল্পনিক এবং রোমান্সে ভরপুর। বাস্তবিক অর্থে তার জ্ঞানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার সাফল্য যেমন বড় করে দেখানো হয়েছে, নানা কল্পকাহিনী প্রচার হয়েছে; আবার তার ব্যর্থতার কাহিনী ইংরেজরা প্রচার

করেছে। একইভাবে গ্রিক ইতিহাসবিদদের কাহিনী কতটা সত্য তা নিয়ে ও ব্যাপক সংশয় রয়েছে। সাইরাস ইরান জয় করলেন, একত্র করলেন। ইরানের পার্বত্য এলাকা এবং মরু এলাকার জনগোষ্ঠী যেভাবে তাকে স্মরণ করে এবং এই কাহিনী বিশ্বাস করে তা শুধু কাল্পনিকই বটে। পরবর্তীকালে আনাতোলিয়ায় লিডিয়ান সাম্রাজ্য দখল করেন। সর্বশেষ সবার জন্য সেরা উপহার হিসেবে ঈশ্বরকে পাওয়ার দরজা এই ব্যাবিলন সৃষ্টি করেন। মেসোপটেমিয়ার অসাধারণ নগরী এই ব্যাবিলন। সে সময় পাশ্চাত্যের চেয়ে এই ব্যাবিলন সবচেয়ে সুন্দর এবং সম্পদশালী নগরী ছিল। সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন, সেইসঙ্গে বসবাসের উপযোগ্য ছিল ব্যাবিলন। আরজ মাসের তিন তারিখে সাইরাস ব্যাবিলনে প্রবেশ করলেন। এ সময় নগরবাসী তার সামনে সুশীতল গাছের ছায়া দিয়ে তাকে একদম ঢেকে দেয়। রাজার শান্তির জন্য পুরো নগরীতে এ আয়োজন করা হয়। সাইরাসের প্রচার এবং বীরত্বের কাহিনী ব্যাবিলনবাসী পরে শুনত। এ সবই খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ শতাব্দীর সময়ের কথা। ব্যাবিলন প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। মাটির তৈরি নগরী। সঙ্গে ইটও ছিল। বহুতলবিশিষ্ট ভবন। সড়ক সুপ্রশস্ত। প্রধান সড়ক মিশেছে ইউফ্রেতিস নদীর কূলে। ইউফ্রেতিস নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতু দিয়ে শুধু মানুষ পারাপারের জন্য, পরিবহন চলে না। কোনো পণ্য পার করা হয় না। নদী শুকিয়ে যেন খালে পরিণত হয়েছে। তবু এই সেতু আজও মানুষকে আকর্ষণ করে। ইউফ্রেতিসকে রক্ষার জন্য খাল কাটা হয়েছে এর চারধারে। পাশে রয়েছে জোড় দেয়াল। ইউফ্রেতিস নদী অববাহিকার ১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাগান তৈরি করা হয়েছিল। এটা ছিল ব্যাবিলন নগরীর বাইরের অংশ। মেসোপটেমিয়ার মানুষ জানতেই পারত না ব্যাবিলনে কী হচ্ছে বা ঘটছে। যখন তারা উৎসবে যোগ দিত তারা নাচে-গানে মুখরিত হতো। পুরো ব্যাবিলনে চলত উচ্ছৃঙ্খলতা। এমনকি পারস্যের সৈনিকরা অন্য উপজাতি-গোষ্ঠীর নারীদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করত। নারীরা গণধর্ষণের শিকার হতো। এসব কিছুতে পরিবর্তন হতে থাকে। পুরো সড়কজুড়ে সাধারণ মানুষ ভিড় করে। নবাগত অতিথিকে দেখার জন্য। তারা উপলব্ধি করেছে, সাইরাস তাদের মুক্তিদাতা। নতুন শাসকের ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন ছিল। তার আচরণ কেমন হতে পারে, তিনি সাধারণের প্রতি কতটা দয়াবান হবেন সে ভাবনায় সবাই ব্যস্ত ছিল। মহান রাজা ময়ূরের পোশাক পরিধান করেছেন। তিনি দেখতে অনেকটা জাদুকরের মতো। ইতিহাসবিদ জেনোফেন বর্ণনা করেন, তার পোশাক ছিল

ঢিলেঢালা এবং রাজকীয়। পোশাকে নানা রঙের বাহার। স্বর্ণখচিত রয়েছে তাতে। পোশাকে রেশমির আবরণ। পায়ে চামড়ার মনোহারী জুতা। মাথায় নীল এবং সাদা রিবন প্যাঁচানো টুপি। পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়েছেন। সেই সেন্টের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্বর্ণ ও হীরার আংটি পরেছেন সাইরাস। ঐতিহাসিক প্লুটাসের তথ্য থেকে জানা যায়, সাইরাস তার সর্বাঙ্গে সে সময়ের মূল্যে ৩০ লাখ পাউন্ডের স্বর্ণ ও হীরার সামগ্রী পরিধান করতেন। নগরীর দেবতারূপে আবির্ভূত আকামেনি সাম্রাজ্যের শাসককে সবাই সংবর্ধনা দিতে আসছে। ঈশ্বরের কাছে তারা প্রার্থনা করতে এসেছে। সাইরাসের ধর্ম উপাসনালয়ে ভয়ভীতি নিয়ে সাধারণ মানুষও এসেছে। একে একে ধর্মপ্রচারকরাও এসেছেন। প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছেন তারা। এখানে একে একে ভিড় করেছে রাজপ্রাসাদে সবাই। এমনকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মন্দির সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। মন্দিরের সামনে সড়ক আলোয় সজ্জিত করা হয়েছে। ব্যাবিলনের 'ই-তেমেন আন কি' স্বর্গ এবং নরকের ঘরের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত ৩০ ফুট উচ্চ টাওয়ার সাজানো হয়েছে স্বর্ণ ও হীরা দিয়ে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে জানা যায়, ঈশ্বরের দরজাখ্যাত বাবেল টাওয়ার, যা পৃথিবী বিখ্যাত। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানে রয়েছে এখানেই। এই ঝুলন্ত উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন সাবেক শাসক তার স্ত্রীর জন্য। স্ত্রী মেডেন ছিলেন ঘরমুখী। বাইরে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন না। তার ভালো-মন্দ ও সুখের জন্য ঝুলন্ত উদ্যান নির্মাণ করেন। উদ্যানের ৬০ ফুট উচ্চে রয়েছে ঈশতার ফটক। দরজার দুই পাশে রয়েছে ষাঁড় এবং ড্রাগনের মূর্তি। একটি সাদা, অন্যটি কমলা।

ব্যাবিলনের ধর্মপ্রচারক নাবু কুদারি এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, ব্যাবিলনের রাজা, রাজপুত্র তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তারা ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন নাবুকে। তিনি জ্ঞানী এবং ধর্মপ্রচারকদের শ্রদ্ধা করতেন।

ব্যাবিলনের এই ঝুলন্ত উদ্যান এবং মন্দিরের সামনে সড়ক দেখে যাচ্ছিল। প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। রাজপ্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর এবং দেয়ালগুলোর ইট যেন ভেঙে পড়েছে। রাজপ্রাসাদ পুনর্নির্মাণের জন্য নীল পাথর তৈরি করা হলো। সেই পাথর দিয়ে মন্দিরের ফটকের সামনে ষাঁড় এবং ড্রাগন তৈরি হলো। একেবারে প্রাচীন যুগের ছোঁয়া নিয়ে আসা হলো। মনে হলো আড়াই হাজার বছর আগে ফিরে গেলাম। মন্দির এবং রাজপ্রাসাদের ছাদ চিরহরিৎ কাঠ দিয়ে ঢেকে দেয়া। প্রতিটি দরজায় রুপা বসানো হয়েছে।

আড়াই হাজার বছর পরও যে কেউ অবাক হতে পারে সাইরাস কীভাবে এই পারস্য সাম্রাজ্য বিজয় করেছিলেন। আরো একটি বিষয় আজ চিন্তা করার মতো, তা হচ্ছে–ব্যাবিলনে এবং মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও আজ আর তার অস্তিত্ব নেই। এর সব কিছুই ব্যাবিলনের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সিংহ, মুকুট, রাজপ্রাসাদের মূল্যবান জিনিসপত্র, হীরা-জহরত সবই ব্যাবিলনের জাদুঘরে রয়েছে। সুসজ্জিত হীরা, জহরত এবং স্বর্ণ দিয়ে তৈরি সিংহের পাল, গাছপালা এবং ফুল সবই স্মৃতি। এক অর্থে বলা যায়, জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদরা সব চুরি করেছেন। অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই এ কাজ শুরু হয়। গত শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। রাজধানীর বাইরে জাদুঘর পুনর্নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। এই জাদুঘরে পারস্যের সব ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যাবিলনের এই ঝুলন্ত উদ্যান, এই রাজপ্রাসাদ এখনো যেন জীবন্ত মনে হয়। প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া যায়। সিংহ, ষাঁড় এবং ড্রাগনের মূর্তিগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হতে পারে এক সময় এখানে কত বীরের আগমন ঘটেছিল এবং সৈন্যরা প্যারেড করত। এই মন্দিরের ফটকের সামনে দাঁড়ালে বহু চিৎকার এবং মানুষের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। এ সময় গ্রিক মন্দিরের সন্নিকটে আরেকটি মন্দিরের গ্যালারি বিদেশি স্কুলের ছাত্ররা পরিদর্শন করছিল। তারাও সাইরাসের মন্দির এবং বীরত্বের কাহিনী শুনেছিল নির্দেশকের কাছ থেকে। এ সবই আজ ইতিহাস। ব্যাবিলনীয়দের নীতি, যা আসিরীয়দের থেকে প্রতিষ্ঠিত, তাদের কাজ ছিল জনতার হৃদয় জয় করা। যেমন তারা উচ্ছেদ হয়েছিল নিজ নগর থেকে, পুনরায় সে নগরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। আরো মৌলিক দায়িত্ব ছিল ব্যাবিলনীয়দের। ঐতিহাসিক দিনে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধির মিলন মেলা হতো। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কাহিনী থেকে জানা যায়, অধিকাংশ জাতি সাইরাসের এই সুন্দর কাজকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে আগত হয়েছেন সাইরাস। তার নতুন দর্শন এবং চিন্তাধারা সাধারণকে উজ্জীবিত করেছিল।

নতুন সাম্রাজ্য যে ইহুদি দর্শনের সূচনা করেছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না কারো। ইতিহাসের গতিপথ যেন সেভাবেই পরিচালিত হলো। এর পেছনে সাইরাস এবং পারস্যবাসী পালন করেছিল অনন্য ভূমিকা। ইহুদিবাদীরা ব্যাবিলনে তাদের বসতবাড়ি গড়ে তুলেছিল। এখান থেকে ৬০ বছর আগে নেবুশাদনেজার কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিল তারা। অনেকেই তাদের বিধ্বস্ত নগরীতে জোর করে বাস করছিল। তারা তাদের দুঃখের দিনগুলোর প্রত্যক্ষ

সাক্ষী ছিল। তারা চোখের সামনে দেখল কীভাবে তাদের পবিত্র ভূমি এবং উপাসনালয় ধ্বংস করা হলো। যদিও তারা জেরেমির উপদেশ গ্রহণ করেছিল। তার উপদেশমতো ইউফ্রেতিস নদীর কূল ঘেঁষে ইহুদিরা বসত গড়ে তোলে এবং সেখানে অনেক নিরাপদে বাস করতে থাকে। পারস্যের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সাইরাস বহু আইন-কানুন প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল কোনো ইহুদিকে তার বাসভবন থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। এজরার গ্রন্থ থেকে জানা যায় :

পারস্যের রাজা সাইরাস বলেন, এই পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্যের স্বর্গীয় দেবতা আমাকে জেরুজালেমে একটি পবিত্র ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেটা হবে ইহুদিদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যে যেই অংশের বা দেশের মানুষ হোক না কেন, তাকে নিয়ে জেরুজালেমে আসো এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করো। যে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তারা যেন জেরুজালেমে চলে আসে। জেরুজালেমে ঈশ্বরের ঘরে স্বর্ণ, রৌপ্য, পণ্য সবই রয়েছে।

এজরা গ্রন্থের লেখক ভেবেছিলেন জেরুজালেমে ঈশ্বরের ঘর সম্পর্কে এবং সাইরাসের চিন্তাধারা নিয়ে কিছু বলার থেকে নীরব থাকা শ্রেয়। এমনও হতে পারে, তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তার সমস্ত কাজকর্ম এবং গবেষণা বহু বছর পর আবার নতুন করে লেখা হলো। নতুন করে গবেষণালব্ধ তথ্যে জানা যায়, সাইরাস ইহুদিদের শুধু একত্র করারই চেষ্টা করেননি, একই সঙ্গে ব্যাবিলন থেকে বিতাড়িতদের এক স্থানে নিয়ে আসেন এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। শুধু তা-ই নয়, ব্যাবিলন থেকে উচ্ছেদকৃত ইহুদিদের মধ্যে ঐক্য এবং সাম্য প্রদর্শনের নমুনা দেখান। এক সময়ের বিধ্বস্ত নগরী যেন পুনর্জীবন ফিরে পেল। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর সব ঐতিহ্য এখন ব্রিটিশ জাদুঘরে। কাচের বিশাল আবদ্ধ মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে সাইরাসের। সেখানে লেখা রয়েছে : 'আমি সাইরাস বিশ্বের সর্বশক্তিমান রাজা, মহান রাজা, ব্যাবিলনের রাজা। যখন আমি ব্যাবিলনে বন্ধু হয়ে হাজির হলাম এবং যখন শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হলাম, ব্যাবিলনের অধিবাসীরা ভালোবেসে আমাকে গ্রহণ করল। এ জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং প্রতিনিয়ত তার কাছে প্রার্থনা করি। তাইগ্রিস নদীর আরেক প্রান্তে পবিত্র নগরীতে আমি ফিরে গেলাম, সেখানে বহু বছর ধরে বিধ্বস্ত অবস্থায় তারা পড়ে আছে। আমি সেখানকার সব মানুষকে একত্র করলাম এবং তাদেরকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনালাম।'

বিজয়ী সাইরাস পারস্যের জনতার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললেন। তার দয়া-দাক্ষিণ্য সবার কাছে বিশেষভাবে মর্যাদা পেল। গ্রিক ঐতিহাসিকদের মতে, সাইরাস কখনোই চাননি বিতাড়িত ইহুদিরা নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করুক। বরং তাদের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যতটা সম্ভব সাহায্য করেছিলেন। এমনকি ইহুদিদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিত তিনি তাদের তার উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের পিতৃভূমিতে ফিরে আসার সুযোগ পেল। তবে ব্যাবিলনের শেষ সম্রাটের ভাগ্য কী হয়েছিল তা জানা যায়নি। লিডিয়ার রাজা ক্রেশাসের পরিণতি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচারিত হতে থাকে। ইতিহাসে নানা কাহিনী রয়েছে তাকে নিয়ে। অনেকের মতে, রাজা নবনিডাস আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। বহু ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন, রাজা নবনিডাস নিজের রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসসহ আরেক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে, নবনিডাস এবং ক্রেশাস এই দুই রাজা সাইরাসের অধীনে তার রাজপ্রাসাদে জীবন অতিবাহিত করতেন। তাদের সম্মান করতেন সাইরাস; কিন্তু কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, সাইরাস তার দাদা আশতাগিয়াসকে তার পাশেই রেখেছিলেন। তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন সাইরাসের সেবা ও পরিচর্যায় বেঁচে ছিলেন। এ কথা বহুল প্রচলিত যে, বৃদ্ধ আশতাগিয়াস সাইরাসকে হত্যার চেষ্টা করেন। তিনি পদক্ষেপও নিয়েছিলেন।

সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাইরাস তার কাজেকর্মে বিখ্যাত ছিলেন, তাই পারস্যে বসবাসরত গ্রিক এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সবাই তাকে সেরা মনে করত। তার সুবিচার, আইন, তার দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা, শাসন করার ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। পারস্যের জনতা তাকে জাতির পিতা বলত।

সাইরাসের দৃষ্টান্তমূলক মহান আচরণ মূলত জরাথুস্ট ধর্মের এবং আদর্শের বিশ্বাসের কারণেই হয়েছে। সব সময় চেষ্টা ছিল তার সাম্রাজ্যের সবাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে। এটাই তার নীতি। তারা ঈশ্বর আহুরা মাজদার আদর্শে বিশ্বাসী হবে। শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকবে। মিথ্যা বর্জন করবে। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না বা কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে, সাইরাস জরাথুস্ট-ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই ধর্মের অনুসারী তিনি নন। আর

সাইরাস কখনোই কোনো স্থানে লিপিবদ্ধ করে যাননি যে, আহুরা মাজদা একমাত্র ঈশ্বর। এমনকি সেভাবে স্বীকৃতিও দেননি। আকামেনীয় অন্য শাসকরা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস যখন পালন করতেন সে সময় সাইরাস নীরব থাকতেন। তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারত না। এমনও দেখা গেছে, তার আদর্শের মানুষেরা যখন অন্য ধর্মের মন্দির এবং মূর্তি ভেঙেছে তখনো তিনি কিছু বলেননি। তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিন্তাধারার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় নীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আরেকটি বিষয়ে সাইরাস ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কোনো বিদেশি এবং সে ক্ষেত্রে তিনি যদি ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তার সঙ্গে সাইরাস চুক্তি করতেন। সেবা নিশ্চিত করতেন। এমনকি ইহুদি ধর্মের লোকদের প্রতিও তার বিশেষ ভালোবাসা ছিল। সাইরাসের শাসনামলের ইতিবাচক দিক হচ্ছে, মানুষকে ধর্ম ও নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান। মানুষকে নিজের মতো করে ভাবতে দেয়া। পারস্যবাসীদের ধর্মের প্রতি যে বিশ্বাস এবং তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা–এ সব কিছুই তারা তাদের নৈতিক দর্শন থেকে পালন করত। কেউ তা চাপিয়ে দিত না। হেরোডটাস বলেন : 'পারস্যবাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো প্রভাব ছিল না। তারা কোনো দেব-দেবীর পূজা করত না। কোনো মন্দির ছিল না। পারস্যবাসীদের মধ্যে দেব-দেবী বিশ্বাস না করা এ যেন গ্রিক কল্পনার মতোই সত্য।' হেরোডটাসের মতে, পারস্যবাসীরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে ইহুদিদের থেকেও বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল। ফলে তারা অন্য ধর্মের ও পৌত্তলিকদের মন্দির, মূর্তি ধ্বংস করতে দিতে দ্বিধা করত না। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তারা। তারা বিশ্বাস করত আহুরা মাজদা ঈশ্বরকে। তাওরাতে উল্লেখ আছে, আহুরা মাজদা প্রবল হিংসাপরায়ণ ঈশ্বর। তিনি তার অনুসারীদের অন্য ধর্মের সব কিছু ধ্বংসের নির্দেশ দেন। এর বিপরীতে সাইরাস অন্য জাতি-ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি বড় ধরনের অবিচার করেননি। তবে তিনি যেটা করেছেন তা হচ্ছে, সূর্য দেবতা, পাপ দেবতা কাউকে তিনি মহান মনে করতেন না। আবার কখনো জ্ঞানের প্রভুকে তিনি সত্য এবং একমাত্র ক্ষমতাবান মনে করতেন। সাইরাস বিশ্বাস করতেন, জ্ঞানের প্রভু হচ্ছেন সকল সৃষ্টির উৎস। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পারস্যবাসীরা দীর্ঘ সময় ধরে অন্যদের সঙ্গে বিভক্ত ছিল। যারা পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাস করত তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি তারা। এমনও অবস্থা ছিল যে, অন্য ধর্মের লোকেরা যদি দেব-দেবীর পূজা করত তবে তাদের শত্রু ভাবত। তারা

একটাই শুধু বিশ্বাস করত, সর্বশক্তিমান নিরাকার। ফলে তার পূজা করা যাবে না কোনো আকৃতি দিয়ে।

সাইরাসের সময়কালে দ্বিতীয় ঈসাই সালে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা হয় : আমিই প্রভু। আমার পরে আর কেউ নেই। আমার পাশে আর কোনো ঈশ্বর নেই।

সব কিছুর পর জরাথ্রুস্ট আরো একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে–শয়তানের ক্ষমতা। ঈশ্বরের প্রধান শত্রু। তারও অনেক ক্ষমতা। আবার এটাও সত্য, যে একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ঈসা সবই জানতেন। সৃষ্টির রহস্য এবং পারস্যবাসীদের বিশ্বাস–সব কিছু তার জানা ছিল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন–সঠিক পথে ধর্ম প্রচার করো। তার নিকট ঐশী বাণী এসেছিল 'আমি আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছি। আমি শান্তি দিয়েছি এবং আবার একই সময়ে শয়তান সৃষ্টি করেছি।' অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এবং দার্শনিক মনে করেন, পারস্যবাসী এবং ধর্মপ্রচারকরা এটা প্রচার করেছেন, যাতে ইহুদিরা বহু পৌত্তলিকতাবাদ থেকে ফিরে আসে। এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে। পারস্যবাসীরা একেবারে সৃষ্টির শুরুতেই ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করত। কারণ তারা বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের কোনো প্রতিনিধি নেই। তার কোনো অংশীদার থাকতে পারে না। তারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করত, যারা একেশ্বরবাদী ছিল। তাদের সাহায্য করত। মূল লক্ষ্য ছিল পৌত্তলিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া এবং মানসিক এবং শারীরিক সব দিক থেকেই শক্তিশালী হওয়া। সাইরাস নিজেকে প্রভু ভেবে নিজের মৃত্যুই ত্বরান্বিত করলেন। ইহুদি ধর্মপ্রচারক জেনেফেন বর্ণনা করেন, ঈশ্বরের শক্তি অসীম। তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। সব ক্ষমতার মালিক তিনি, যিনি এই বিশ্ব চরাচরে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সব কিছুই তার দান। হে, আমার সন্তান, তাকে ভয় করো। কখনো কোনো পাপ কোরো না। বাজে কাজে মন দিও না। চিন্তা-চেতনা বা কারো সঙ্গে পাপাচারে লিপ্ত হয়ো না। মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার জন্য। পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে। মানুষ পরলোকে যাবে। তাকে আবার জীবিত করা হবে। অনন্তকাল সে তার ফল ভোগ করবে। অন্ধকারে চিরকাল লুকিয়ে রাখবেন না ঈশ্বর। মানুষের প্রতিটি কর্ম তার চোখের সামনে তুলে ধরা হবে। যে এই পৃথিবীতে ভালো করবে ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করবেন। এর বিপরীত হলেই শাস্তি।

দারিউসের ঘর

সাইরাসের ধর্ম এবং বিশ্বাস নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তা কখনো পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। কিন্তু তার উত্তরসূরিদের সম্পর্কে এ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে রাজা দারিউস বলেন 'আহুরা মাজদা আমাকে রাজ্য শাসনের ভার দিয়েছেন। তিনি আমাকে করুণা করে শাসক বানিয়েছেন। আহুরা মাজদার দয়ায় আমি ক্ষমতারোহণ করেছি এবং শেষে দিন পর্যন্ত তার আদর্শে বিশ্বাসী থাকব।' সাইরাস-পরবর্তী যুগে ইরান সাম্রাজ্যে নতুন সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন দারিউস। তিনি শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর ইরানের সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ইরানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী, যার একটি থেকে অন্যটি ১০০ মিটার দূরে তাদের মধ্যে সড়ক স্থাপনা করে সুসম্পর্ক রচনা করেন। তার এই মহৎকর্মে ইরানবাসী শান্তির ছায়া পেল। তিনি রাজমুকুট চাপিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

আহুরা মাজদা, যাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর ভাবা হয়, তার ডানা প্রতীকী ডানা মেলে থাকে। সেই ডানার ওপর ভর করেই যেন ঈশ্বরের সেবা করতে চান দারিউস। তিনি তার এক পা পরাজিত বাহিনীর দিকে, অন্যটি শান্তির প্রতীক এবং যারা শান্তি চায় তাদের দিকে রাখলেন। দারিউস ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার সামনে পুরনো নয়জন স্বেচ্ছাচারী রাজাকে বন্দি করা হলো। তাদের হাত খুব শক্ত করে বেঁধে পেছনে রেখে দেয়া হলো। তাদের পর্বতমালায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সর্বশেষ যুদ্ধ হয়েছিল এই পর্বতমালায়। পাসরাগার্ড এবং পার্সেপোলিসের থেকে উত্তর-পশ্চিমে এই পর্বতমালা অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, এই স্থানের নাম বেহিস্তান।

বেহিস্তান পর্বতমালায় অনেক ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এখানকার ঘটনাপঞ্জির ফল এশিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে। রাজা দারিউস নিজেই বলেছেন, কীভাবে তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এবং সিংহাসনে বসেছেন। ব্যাবিলনীয়, প্রাচীন পারস্য এবং ইলামিতি–এই তিনটি ভাষায় আড়াই হাজার বছর আগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দারিউস নিজেই উপলব্ধি করলেন ইতিহাস তাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে। সে জন্য নিজের ভাষায় রচিত কাহিনী এবং তার উপাখ্যানে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিলেন। বাস্তবিক অর্থে এগুলো শাসকগোষ্ঠীর একান্ত ধ্যান-ধারণা। তাদের বানানো কল্পকাহিনী হতে পারে।

তারা চাইত শাসক দারিউসকে মহান করতে। এমন প্রশ্ন অনেকের মধ্যে জাগে, প্রাক শিক্ষা যুগে কে বা কারা এ তিনটি ভাষায় গ্রন্থ লিখেছিল আর এই মূল বই কে পাঠ করেছিল, এর কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। বরং ধারণা করা হয়, একে অন্যের কাছে গল্প করতে করতেই এ কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। আর এমনও তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দারিউসের পরবর্তী যুগে তার গ্রন্থে বহু নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন পুরো গ্রন্থের কাজ শেষ হলো তখন প্রস্তর বিশিষ্ট এবং খোদাই লিপিকারককে ডেকে তা লিপিবদ্ধ করা হলো। পাহাড় কেটে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় পাথরের গায়ে কী লিপিবদ্ধ করা আছে। কেউ পড়তেও পারে না। আকামেনীয় যুগে শিক্ষিত শ্রেণী খোদাই করে লিখে রাখত। তবে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার যে, মহাসড়ক থেকে রাজা দারিউসের ঐতিহ্য এবং তার শত্রুদের স্মৃতিবিজারিত সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়।

ঈশ্বরের ভূমি হিসেবে পরিচিত বাগেস্তাগায় খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দীতে ভ্রমণে এসেছিলেন গ্রিক পদার্থবিদ সিসিয়াস। তিনি এখানে এসে দেখতে পান, ছোট্ট একটি সেতু এবং একটি বাগান। এই বাগান নির্মাণ করেছিলেন আসিরীয় রানি সেমিরা। তিনি যিশুর প্রতি বাগানটি উৎসর্গ করেছিলেন। আড়াই হাজার বছর পর নাম কিছুটা পরিবর্তন হয়ে বিসোতান অথবা বেহিস্তান রাখা হয়েছে। তবে ছোট্ট সেতু এবং বাগান অরক্ষিত রয়েছে। ইরানে সরকারি ছুটির দিনে মানুষ এখানে এসে সময় কাটায়। তাদের ছেলেমেয়েরাও আসে। আইসক্রিম খায়। সুন্দর সময় কাটায়। শিশুরা পাহাড়ে ওঠে। সিসিয়াসের ৫০০ বছর পর রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস হারকিউলিসকে উৎসর্গ করে এক দেবীর সন্ধান পেলেন। তিনি সড়কের পাশে বালি দিয়ে সাদা মূর্তি তৈরি করলেন। এ যেন স্বর্গীয় কোনো শক্তিশালী দেবতা। এটা ছিল প্রকৃত অর্থে দারিউসের মূর্তি। তার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথাই মনে হয়, তিনি কী সত্যি এ রকম ছিলেন? নাকি কল্পনায় চেহারা তৈরি হয়েছে? এসব চিন্তা করতে করতে ইরানের উত্তর-পশ্চিমে কারমানশা শহর পার হয়ে গেলাম। এ সময় সড়কের পাশে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। পর্বতমালায় পা রাখতেই দেখা গেল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলপত্র। পুরো পর্বতমালা জুড়ে দারিউসের যে গল্প-কাহিনীর কথা বললাম তা লিপিবদ্ধ করা আছে। আর তা রয়েছে ইঁদুরের গর্তে। পর্বতমালার ওপরে কাঠ দিয়ে সব কাহিনী লেখা ছিল। ইঁদুরে তা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। খুব হতাশ হতে হলো।

লোহার দরজার কাছে দাঁড়ালাম। এখানে বিড়ালরা বাসা বানিয়েছে। এখনো অক্ষত রয়েছে লোহার দরজা। হাজার হাজার বছর পরে উদাসীনতার কারণে সবখানে ধুলা জমেছে। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের কাজ করছে। এ সময় পাহাড়ের নিচে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সম্ভবত পুলিশ। তিনি আমাকে লক্ষ করছিলেন। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যতটা সম্ভব দারিউসের এই প্রাচীন সমাধিস্থল দ্রুত পরিদর্শনের চেষ্টা করলাম। সিসিয়াস পুলের দিকে তাকালাম। অনেকটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। পাশেই ছিল উপত্যকা। পুরো উপত্যকাজুড়ে ভেড়ার পাল। ঘাস চিবোচ্ছে ভেড়াগুলো। ধূসর রঙের জাগরোস পর্বতমালা মেঘমুক্ত আকাশে যেন টুকরো কাগজ ছড়িয়ে আছে। এই সুন্দর দৃশ্য দারিউসের সময় হয়তো আরো নান্দনিক ছিল। এত বছর পরও যখন এত অমলিন রয়েছে, তাহলে ভেবে নেয়া যেতেই পারে দারিউসের সময় আরো সুন্দর ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই নগরী কতটা সুন্দর ছিল তা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। এটা ছিল সে সময় প্রধান সড়ক। সম্রাটের দ্বিতীয় নগরী ব্যাবিলন থেকে প্রাচীন মেডেন রাজধানীতে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল টারম্যাক সড়ক। ঐতিহাসিক তোবিতের গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই সড়ক হচ্ছে রাজেসের সঙ্গে যুক্ত। নিনেভের মানুষ তোবিতকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রাজেসে যাবে? এই সড়ককে ফেরেশতাদের রাস্তা বলা হয়। তা তার জানা ছিল না। এলবুর্জ পর্বতমালার খুব সন্নিকটে রাজেসে প্রাচীন একটি শহর। এটা এখন তেহরানসংলগ্ন। এ সময় দুজন পথচারী কথা বলছিল। একজন প্রশ্ন করল, তুমি কি রাজেস এলাকা চেন? আরেকজন উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি চিনি।

আমি ভালো চিনি না বলেই বসে আছি আমার ভাই জিবরাইলের সঙ্গে। আমি যেখানে বসে ছিলাম, ঠিক তার পাশেই তারা কথা বলছিল। তারা আসলে মানুষ ছিল না, ছিল ফেরেশতা। অলৌকিক ঘটনা দেখে নিজেও অভিভূত হলাম। এখনো এমন সব ঘটনা ঘটে, যা বর্ণনা করার মতো নয়।

পারস্যের রাস্তাগুলো খুবই চমৎকার আর রাস্তার পাশ দিয়ে প্রাচীন যুগের বিখ্যাত সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। উপরন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো। হেরোডোটাস থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যের প্রতিটি সড়ক যেন রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়। খুবই সুন্দর এবং সাজানো-গোছানো।

পর্বতে বসে ছিলাম। সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালাম। এ সময় মনে হলো উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে দারিউস শাসনামল এবং খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী কেমন ছিল তা ভাবাই যায় না। দুই সেরা নগরীকে যে প্রধান সড়ক

সংযুক্ত করেছে তা বর্তমানে ধুলায় ধূসরিত। আজ সবই স্মৃতি। উপত্যকার পাশ দিয়ে ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। ইরানও বর্তমানে কোনো ধনী রাষ্ট্র নয়। তার বিশাল সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। পকেট থেকে নির্দেশিকা বইটি বের করলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র আঁকা রয়েছে। যেখানে পুলের এবং পর্বতমালার মাঝখানে ঘোড়ার চালকের ছবি আঁকা রয়েছে। এভাবেই অতীতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮৩৫ সালে ইংল্যান্ডের এক সৈনিক তার প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে পারস্য ভ্রমণ করেন। হেনরি রলিনসন পারস্যের এই নগরী ঘুরে দারিউসের নগরীর চিত্রপট তুলে নেন।

জার্মানির স্কুলমাস্টার গ্রোফেন্ট, পার্সি ভাষা সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান ছিল না, তিনিও পার্সেপোলিস নগরী থেকে দারিউসের গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। হেনরি রলিনসন চেষ্টা করেন প্রাচীন পারস্যের গ্রন্থ থেকে প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ উপলব্ধির। তিনি এ বিষয়ে পারস্যের পণ্ডিতদের সাহায্য নেন। তিনি বহু কষ্টে প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ বুঝতে সক্ষম হন। তাতে লেখা ছিল :

'আমি রাজা দারিউস ভিশপ্পার সন্তান। হাকামানিশা বংশ থেকে আগত। তারা হচ্ছে রাজাদের রাজা। আমি পারস্যের রাজা। আমার বাবা বিশপ্পা। তার বাবা আরশামা। আরশামার বাবা আর্যারামা, আর্যারামার বাবা চিশফিশ এবং তার বাবা হাকামানিশা।' হেনরি রলিনসন পুনরায় দারিউসের পারস্য নগরীতে এলেন। এবার তিনি কুর্দিশ তরুণের কাছ থেকে সাহায্য নিলেন। তিনি পারস্যের দারিউসের লিখিত তথ্য বুঝতে এক বছর সময় নিলেন। দারিউসের বহু বীরত্বের কাহিনী তিনি জানতে পেরেছেন। এ সবই আজ ইতিহাস।'

যুগ, কাল এবং সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মহান রাজা সাইরাস ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মারা যান খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮০ শতাব্দীতে। মধ্য এশিয়ায় যাযাবর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েই তার মৃত্যু ঘটে। তার দুই সন্তান কাম্বুজিয়া এবং বারদিয়া। শাসনক্ষমতায় আরোহণ করেন কাম্বুজিয়া। তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা আর অত্যাচারে তার জুড়ি মেলা ভার। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বছরেই তিনি মিসর দখল করে নেন। চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন মিসরীয়দের ওপর। হেরোডটাসের তথ্য থেকে জানা যায়, বাস্তবিক অর্থে কামুজিয়া ছিলেন পাগল প্রকৃতির। বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ। একবার তিনি বিড়ালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেন। পরাজিত হতে পারেন এই ভয়ে এবং আশঙ্কায় কাম্বুজিয়া তার বাহিনীকে বিড়াল ধরার নির্দেশ দেন। কত বিকৃত রুচির হলে সামান্য বিড়াল ধরে আনার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন—এ থেকেই তার প্রমাণ মেলে। এক পর্যায়ে মিসরবাসী পবিত্র এই সৃষ্টিশীল প্রাণী ধরতে অপারগতা প্রকাশ করলে কাম্বুজিয়া একের পর এক প্রহার করলেন। এমনকি তার ভাই বারদিয়াকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। তার ভয় ছিল, ছোট ভাই বারদিয়া শাসনক্ষমতা দখল করতে পারেন। সে জন্য তিনি গোপনে ভাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন, যাতে সাধারণ মানুষের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ না জাগে। কাম্বুজিয়া যখন মিসর দখল করেন তখন তার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা একবার ঘোষণা করেছিলেন : মানুষ শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই পার্সীয়া, মেডেন এবং অন্যান্য প্রদেশে মিথ্যার ফুলঝুরি চলছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জরাথুস্ট ধর্মতত্ত্বে শয়তানের ক্ষমতার কথাও বলা আছে। এই শয়তানের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের পথে পরিচালিত মানুষকে বিচ্যুত করা এবং শান্তি নষ্ট করা। সুশাসন ধ্বংস করে দেয়া।

দারিউস রাজা বলেন : ঐশী প্রচারক গৌমাতা নামের একজন হঠাৎ করেই পৃথিবীতে এলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেলেন। প্রচার করলেন 'আমি বারদিয়া। সাইরাসের সন্তান। কাম্বুজিয়ার ভাই।' এটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল মাত্র। কিন্তু এটাই সত্যে পরিণত হলো। একদিন কাম্বুজিয়ার বিরুদ্ধে দেশের জনতা বিদ্রোহ করল। পারস্য, মেডিয়া এবং অন্য প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হলো এবং তারা বারদিয়ার পক্ষে চলে গেল। এক পর্যায়ে তিনি রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। এ ঘটনার পর কাম্বুজিয়া মৃত্যুবরণ করেন। অনেকের মতে তিনি আত্মহত্যা করেন। হেরোডোটাসের মতো কাম্বুজিয়া নিজে অস্ত্র পিঠে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেন।

বেহিস্তান থেকে বর্ণিত আছে, কেউই বারদিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলত না। মানুষ তাকে ভয় করত। বারদিয়া বহু মানুষকে জবাই করেছেন, যারা নিজেদের বারদিয়া বলে প্রচার করত। তিনি বলতেন, 'আমি প্রকৃত বারদিয়া নই। সাইরাসের সন্তান নই।' কেউই এ ব্যাপারে কোনো কথা বলত না। দারিউস বলতে থাকেন, 'আমার ক্ষমতা গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমি আহুরা মাজদার সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আহুরা মাজদা আমাকে সাহায্য করলেন। বাগাজোরি মাসের ১০ তারিখে যখন ঐশী প্রচারক গৌমাতা এবং তার

অনুসারীদের হত্যা করলাম, তারপর আমি রাজ্য দখল করলাম। আহুরা মাজদার দয়ায় আমি রাজা হলাম। তিনি আমার প্রতি দয়া করেছেন।'

দারিউস ছিলেন আকামেনিদীয় সাম্রাজ্যের অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফলে তিনি রাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তবে তিনি যদি মনে করেন তার সমস্যা কেটে গেছে তাহলেই ভুল করবেন। রাজ্য পরিচালনায় তিনি অনেক ভুল করেছেন। পারস্য সাম্রাজ্যে বহু বিক্ষোভ হলো। তাকে কঠোর হস্তে তা দমন করতে হয়েছিল।

রাজা দারিউস বলেন : রাজা হওয়ার পর রাজ্য শাসন করতে আহুরা মাজদার দয়ায় আমি সব কিছু করেছি। নয়বার যুদ্ধ করেছি। আহুরা মাজদার আশীর্বাদে প্রতিপক্ষ নয়জন রাজাকে কারাগারে পাঠাতে পেরেছি। তাদের মধ্যে একজনের নাম গৌমতী। তিনি ঐশী বাণী বাহক। তিনি বলেছিলেন, 'আমি বারদিয়া এবং সাইরাসের সন্তান।' বাস্তবিক অর্থে পারস্যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন দারিউস নিজেই। আম্মিনা রাজাকে তিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন। ইলামিতি রাজ্যের এই রাজা বলেছিলেন, 'আমি ইলামের রাজা।' দারিউস এই রাজ্যও দখল করে নেন। এক পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ব্যাবিলনের রাজা নিদিনতু। তিনি বলেন, 'আমি নেবুশাদনেজার। নবনিডাসের সন্তান।' ব্যাবিলনও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পারস্যের এক রাজা মার্তিয়া। তিনি বলেন, 'আমি ইমানিশ। ইলামের রাজা।' এভাবে ইলাম রাজা দারিউসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেডের রাজা ফারাও বলেন, 'আমি কাশতোরিয়া। সিয়াজেরেক্স পরিবারের সন্তান।' মেডেও বিদ্রোহ করে দারিউসের বিরুদ্ধে। সাগারতিয়ান রাজ্যের রাজা সিমানতাখামা বলেন, 'আমি সাগারতিয়ার রাজা। দারিউস আমাকে বন্দি করেছেন।' সাগারতিয়া রাজ্য বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধে। মার্জিয়ানের রাজা ফার্দায় বলেন, 'আমি মার্জিয়ানের রাজা।' তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করে। পারস্যের নেতা বরজদাতা বলেন, 'আমি বারদিয়া। সাইরাসের সন্তান।' পারস্যে দারিউসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আর্মেনিয়ার রাজা আরকা বলেন, 'আমি নেবুশাদনেজার। নবনিডাসের সন্তান।' এভাবেই ব্যাবিলনে বিদ্রোহর সূচনা হয়। অবাক করা বিষয় হলো, সাবেক এই রাজাদের নামে একাবাতানা থেকে ব্যাবিলনমুখী প্রধান সড়ক চলে গেছে। প্রতিটি সড়ক যেন এক কাতারে মিশেছে। আম্মিনা সড়ক ইলামিতে, নিদিনতু বেল ব্যাবিলনে, মার্তিয়া পারস্য, ফারাও মেডেসে, সিমানতাখামা সাগারতিয়ানে, ফার্দা মার্যিয়ানায়, বরজদাতা পারস্য সংযুক্ত, আরকা আর্মেনিয়ায়। আর এই

সড়কগুলোর লক্ষ্য পথ কেন্দ্রের দিকে। এটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যেন এই রাজারা দারিউসের পদতলে ছিলেন। সড়কও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যে যুগে ছবির প্রচলন ছিল না বা প্রতিকৃত রাখার ব্যবস্থা ছিল না সে সময় অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, নিষ্ঠুর রাজা তার মুদ্রায় নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরেছেন। মুদ্রার দুই পিঠে রাজার ছবি এবং তার বীরত্বের কাহিনী-সংবলিত ছবি থাকত। রাজার এই অত্যাচারের অধিকার রয়েছে, কারণ তারাই রাজ শাসনে বসবেন। এটা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। ক্ষমতা দখলের সহজ পথ তাদের জানা ছিল। বাস্তবিক অর্থে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল, অন্যের রাজ্য করতলে নেয়া বা রাজাকে গ্রেপ্তার করে তার রাজ্য শাসন করা, সাধ্যমতো হরণ করা-এসব কতকাল চলতে পারে। এটা ভাবলে অবাক লাগে, বিশ শতকেও সাম্রাজ্য ও দেশ দখলের জন্য শক্তিধরের কী নির্লজ্জ প্রচেষ্টা ছিল। আনাস্তাশিয়া রাজ্যের প্রতি রাশিয়ার মিথ্যা দাম্ভিকতা এবং সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর ঐতিহ্য দাবি করা-এ যেন ক্ষমতার দাম্ভিকতার প্রকাশ।

এ কথা ঠিক, দারিউসের বিবৃতি সঠিকভাবে জানার কোনো পথ নেই। দারিউস যা প্রচার করেছেন তা সত্য না মিথ্যা তা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই। বহু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, বেহিস্তানের পাহাড়ে তিনি তার শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তিনি প্রকৃতভাবেই বারদিয়ার বিরুদ্ধে ক্যু করেন।

মহান রাজা দারিউস কি সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক বিরোধিতা করেছিলেন?

মহান রাজা দারিউস কি সত্যিকার অর্থে হত্যার বিরোধিতা করেছিলেন, নাকি শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন? তিনি বারবার বলতেন, রাজা শাসক এবং প্রশাসনের কাজ সত্য প্রতিষ্ঠা করা। আমার চিন্তা-চেতনা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে আন্দোলিত করা। ভেব না, আমি মিথ্যা বলছি। রাজা দারিউস আরো বলেলন : 'আমি নিজেই খুব দ্রুত গতিতে আহুরা মাজদায় রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করি। এটা সত্য, কোনো বানানো কাহিনী নয়। আমি তা হতে পেরেছি একবার। বাস্তবে আহুরা মাজদার প্রতি আমার উজাড় করে দেয়া সব প্রার্থনার কারণে তিনি যেন আমার ওপর ভর করলেন। আমরা শরীরের শিরা-উপশিরায় আহুরা মাজদার অস্তিত্ব বিরাজ করছিল।'

দারিউসের সব কথাই ছিল মিথ্যা এবং কাল্পনিক। তিনি শত্রুকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করতেন। এ শাসকই আবার বলেছেন, যে মিথ্যা বলে তাকে শাস্তি দাও। আমার দেশকে নিরাপদে রাখো।

দারিউস সত্য বলতেন কিনা এবং চারদিক তার শত্রু ছিল কিনা তা নিয়েও সংশয় ছিল। দুই শক্তিধরের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হলো। আহুরা মাজদার মিথ্যার অনুসারীদের মধ্যে লড়াই সব কিছুরই একটা পরিণতির দিকে ধাবিত হলো।

ঐশীবাণী বাহক প্রকৃত অর্থে তারা ছিল মেডেস জাতি-গোষ্ঠীর ধর্মপ্রচারক। সম্ভবত তারা ইহুদি অথবা হিন্দু ব্রাহ্মণ। তারা সব ধরনের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। ইংল্যান্ডে এবং পারস্য মেডেসবাসীদের মধ্যে ঐশীবাণী প্রচারকদের মূল স্রোতধারা ইহুদি ধর্মেরও বহু আগে থেকে শুরু। জরাথ্রুস্ট যখন ইরানে প্রাচীন পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংস্কারের ডাক দেন এবং ঈশ্বরবাদের শিক্ষা দেন তখন থেকেই এর যাত্রা শুরু। তার বার্তা অনুসারীদের মাঝে সংস্করণবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। আবার তার বিরুদ্ধবাদীরা জরাথ্রুস্টের ধর্ম, দর্শনের বিরোধিতা করে। বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা মনে করে, এটা মানুষের নৈতিক আচরণে বাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

হিন্দু ধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মণরা বৈদিক যুগে মাদক ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। কিন্তু নেশাযুক্ত পানীয় এবং তা থেকে তৈরি রস ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন জরাথ্রুস্ট। যদিও জরাথ্রুস্টে সংস্কার এবং ধর্মীয় প্রচার বহুকাল পার হয়েছে। বরং ঐশী প্রচারকরা যেন তাদের পুরাতন মতবাদে ফিরে যাচ্ছে ক্রমেই। জরাথ্রুস্ট ধর্মে যা কিছু আছে আর তাদের পুরাতন বিশ্বাস একত্রে করে নতুন দর্শনের উদ্ভব ঘটলে এ ক্ষেত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণরা নিজেদের ধর্মকেই যেন লুট করল। এর ১৫০ বছর পর দারিউস, তার ছেলে, নাতি এবং নাতির নাতিরাই শুধু আহুরা মাজদায় প্রতি আকৃষ্ট ছিল না, তার মত ও দর্শন মেনে চলত। মহান রাজা আরতাজেরেক্স বলেন, 'প্রাশস্ত পাথর দিয়ে চারটি স্তম্ভ দিয়ে ঘর তৈরি করো। আহুরা মাজদা আনহিতা এবং মিথরা আমাকে শয়তানের সকল অপশক্তি থেকে রক্ষা করবে।' জরাথ্রুস্ট ধর্মের পূর্ববর্তী ধর্মপ্রচারকরা আনহিতার স্বর্ণের মূর্তি বানিয়ে রাখত। আনাহিতা ছিল পানির দেবী।

সাইরাসের মৃত্যুর পর ঐশীবাণী প্রচারকরা বলা শুরু করল, রাজসিংহাসন তার ভাগ্যেই জোটে, যার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা রয়েছে। শাসক নিজেই তার জাতি-গোষ্ঠীর কাছে প্রভু সেজে বসেন। তবে এ ক্ষেত্রে আহুরা মাজদার ব্যতিক্রম। দারিউস তাকে সর্বশক্তিমান মনে করতেন। দারিউস

বলতেন, 'তা তুমি যখন রাজা হবে তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে, যারা মিথ্যা এবং ভুল পথের অনুসারী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। তাদের ধ্বংস করো। শাস্তি প্রদান করো।'

ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনা বা বিশ্বাস এ সব কিছু সাইরাস সম্পর্কে জানা যায়নি। কোনো স্বর্গীয় দেব-দেবীর প্রতি তার কোনো আগ্রহ, উচ্ছ্বাস ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল না। একটা বিষয় ছিল খুবই পরিষ্কার, তার নিজস্ব দর্শন ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে কখনো পিছপা হতেন না। অন্য ধর্মের প্রতি কখনো কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। এর ঠিক বিপরীত অবস্থানে ছিলেন দারিউস। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তা প্রমাণের জন্য তিনি সর্বদাই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

স্বর্গ, নরক এবং শয়তান

দারিউসের চিন্তা-চেতনায় জরাথ্রুস্টের প্রভাব ছিল এবং সেই ধর্মের আদর্শের প্রতি এবং তা পালনে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। রহস্যের বিষয় এই যে, জরাথ্রুস্ট ধর্মের মৌলিক দর্শন এবং ধ্যান-ধারণা বহু পূর্বে ইহুদিবাদীরা বিশ্বাস করত। তারা এটা ভালো করেই বিশ্বাস করত, পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে। আরেকজন ঐশী বার্তাবাহক আসবেন। রোমানদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবেন তিনি।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বিতাড়িত ইহুদি এবং আকামেনিদ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল এর কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন ইতিহাসবিদরা। এজরা এবং নেহেমিয়ার প্রবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। জেরুজালেমে ইহুদিদের মাতৃভূমি পুনঃ স্থাপনে তারা যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাও পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়।

একটা বিষয়ে যুগের পর যুগ পণ্ডিত ব্যক্তিরা তর্কে লিপ্ত হয়েছেন যে, এজরা এবং নেহেমিয়ার মধ্যে কে প্রথম জেরুজালেমে এসেছিলেন? কখন এবং কীভাবে জেরুজালেমের দেয়াল এবং মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল? এ বিষয়ে বাস্তবিক অর্থেই আজীবন সন্দেহ থেকে গেছে।

এ কথা সত্য এবং পরিষ্কার যে, এজরা এবং নেহেমিয়া খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন।

নেহেমিয়া ছিলেন রাজপ্রাসাদে রাজার প্রধান অনুগত সদস্য। আর এজরা ছিলেন হিব্রু ভাষায় পবিত্র বাইবেলের সংগ্রাহক এবং লেখক।

যাই হোক, পারস্যের রাজা তাদের পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এমনকি তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। এটা করা হয় ইহুদি ধর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে।

তারা ইহুদিবাদের সত্য কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন। এর ফলে মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে। তারা বলেন, যারা নিজভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারাই প্রকৃত ইহুদি। আর তারা যদি ইহুদি না হয় তাহলে তারা হবে ইরানি চিন্তা-চেতনার মানুষ। তারা তাদের পারস্যের প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করবে।

অতীতের এই ধর্মীয় দর্শনচিন্তার কথা ভাবছিলাম আর ইরানি বন্ধুকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তার ঘড়ির দিকে তাকালাম। দিনের একেবারে শুরুতে অর্থাৎ সকালের দিকে আমরা গাড়িতে করে রওনা দিয়েছিলাম। এখন দুপুর পার হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ধূলিঝড় হয়েছে।

পুরো নগরী বালুতে ভরে গেছে। বৈদ্যুতিক তারের খুঁটিগুলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ইরানের মানুষের কাছে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের যে জাদুর ছোঁয়া, তা যেন নিয়মিত চর্চা করছে। সত্যি, একটা বিষয় ভাবলে অবাক হতে হয় যে, ইতিহাসের গতিধারা কত পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বারদিয়া এবং গোমাতা, বাস্তবিক অর্থে তারা যতই ক্ষমতাবান হন না কেন, আজ ইতিহাসের অতলে হারিয়ে গেছেন। তারা সময়ের পথ ও দর্শন অতিক্রম করতে পারেননি। আরেকটি বিষয় ভাবলে অবাক লাগে, ঐশীবাণী প্রচারকদের বিরুদ্ধে দারিউসের বিজয় বহুদিন ধরে যেন সমাজে ছায়ার মতো আবৃত ছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হলো জরাথুস্টের শিক্ষা, যা প্রাচীন পারস্যের কেন্দ্রস্থল থেকে পরিচালিত হতো। পারস্যে জরাথুস্ট দর্শন এবং তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ করা হবে। পারস্যের মানুষদের ওপর জরাথুস্টের ধর্ম সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হলো।

এই ধর্ম প্রচারে সময় প্রথমে ইহুদিদের ওপর প্রচলন করা হলো। এরপর প্রয়োগ করা হলো খ্রিষ্টীয় মতাদর্শের প্রতি। জরাথুস্ট দর্শনের অংশবিশেষ পাশ্চাত্য এবং ইসলামিক বিশ্বে প্রয়োগ করা হলো।

আমরা এমন এক স্থানে গাড়ি থামালাম, যেখানে দেখা গেল আকামেনিয়া যুগের নিদর্শন।

সে এমন এক যুগ, যখন দারিউস এবং ইহুদিদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। প্রধান সড়কের একেবারে শেষ প্রান্তে বর্তমানে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

আধুনিক হামাদান নগরী বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছেয়ে গেছে। একাবাতানা শহর থেকে হামাদান খুব বেশি দূরে নয়। একাবাতানার পেছনে রয়েছে লৌহ নির্মিত বিশাল দরজা।

এখানে পাহারাদার রয়েছে। একাবাতানা শহরে প্রবেশ করতে হলে এই নিরাপত্তারক্ষীর অনুমতি নিতে হয়। বিদেশি পর্যটক হলে তিনি শীর্ষ কর্মকর্তার কাছে ফোন করেন। তার সঙ্গে রয়েছে টেবিল ফোন। এই নগরীতে রয়েছে দুই মহামতির সমাধি ক্ষেত্র।

ইশতার এবং মর্ডেকার সমাধি ক্ষেত্র। দারিউসের সন্তান জেরেক্সের পবিত্র কবরস্থান এখানেই। সুস নগরীতে দানিয়েলের সমাধিস্থলের মতো আকামেনিয়াতে আর কিছুই নেই। তবে ইসলামিক যত ঐতিহ্য, এর নমুনা ঠিকই পাওয়া যাবে। এ সবই মধ্যযুগের ঐতিহ্যের চিন্তা-চেতনাকে আঁকড়ে থাকার মতো বদ্ধ ধারণা।

বর্তমান সময়ে বিদেশি ইহুদিরা ছাড়া কেউই দারিউসের সমাধিতে যায় না বা ভ্রমণ করে না। তবে এটা ঠিক, দারিউসের সমাধি ক্ষেত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবার প্রিয় ছিল। আর এ কারণেই বহু ইতিহাসবিদ এবং চিন্তাবিদ নীতিগতভাবে একমত হন যে, মুসার পাঁচটি পবিত্র বাইবেল ধর্মগ্রন্থের পর ইশতারের পবিত্র গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বাদশ শতাব্দীর দার্শনিক মাইমোনিডস এ তথ্যই সবার সামনে তুলে ধরেন।

অধিকাংশ পণ্ডিত এ কথা বিশ্বাস করেন, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ একই ঐতিহ্য দেখতে পাওয়া যায়-পারস্যের যুবরাজ শেহেরজাদের হাজার এক রাত্রির কাহিনীর মতোই বর্ণনা হয়েছে। এই গ্রন্থে ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব পুরিমের কথা বলা হয়েছে। এতে ব্যাবিলনীয়দের প্রভাব ছিল। ব্যাবিলনীয় ঈশ্বর ইশতারের পরই ইহুদি খলনায়কদের বর্ণনা করা হয়েছে।

ইশতার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পারস্য এবং ইহুদিদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা অব্যাহত ছিল উল্লেখ হয়েছে। হিব্রু ধর্মে ইশতারের আসল নাম হামাদাহ। যার অর্থ চিরহরিৎ গুল্মবিশেষ। জরাথ্রুস্টবাদী ইহুদি ধর্মবিশ্বাসীরা বহু শতাব্দী ধরে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। এমনকি ইরানে ইসলামিক বিজয়ের পরও জরাথ্রুস্ট এবং ইহুদি দর্শন ও মতবাদীদের মিল ছিল। ইশতার এবং মারদুকের সমাধিস্থলে হিব্রু ভাষায় সাদা চুনকামের দেয়ালে তাদের আদর্শ

এবং দর্শনের কথা লেখা রয়েছে। ইহুদিরা দুর্নীতি করেছে। ইহুদিরা শত শত বছর ধরে ইশতার এবং মারদুকের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে ব্যর্থ হয়। এই সমাধিস্থলে আগত অতিথিদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বাস্তবিক অর্থে এ ব্যাপারে কী বলে? এক পর্যটক অবাক হয়ে আমার ইরানি সতীর্থ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, ইহুদিরা দুর্নীতি করেছিল। তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিচার হয়েছিল নগরীর দক্ষিণে শাইরাজ প্রান্তে।

দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ইহুদি অপরাধীদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইহুদিদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল যে, তারা ইশতার এবং মারদুকের কবর লুকিয়ে অন্যত্র স্থাপন করতে চেয়েছিল।

পর্যটক ফরাসি ভাষায় বলল : এগুলো হচ্ছে জাদুমন্ত্রের প্রতীক। প্রাচীন ধর্ম উপাসকরা এগুলো বুঝতে পারে। এটা কোনো জীবন্ত মানুষ বা সাধারণের কাজ নয়। এই কবরের পাশে দুটো কফিন রয়েছে। কফিন দুটো আজও অরক্ষিত। নষ্ট হয়নি।

আড়াই হাজার বছরের পুরনো কফিন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

অতীতের স্মৃতি থেকে বর্তমানে ফিরে আসি। আধুনিক ইরানের সড়কের দিকে দৃষ্টি পড়ল। ব্যাপক কোলাহল, চারদিকে ছোট ছোট যান এবং মোটর-স্কুটার। একটা দর্শনার্থী স্থানে পৌঁছালাম।

সেখানে নিরাপত্তাকর্মী আমার কাছে কলম উপহার চাইল। তাকে পকেট থেকে কলম উপহার দিলাম। বিশাল লোহার দরজা খুলে দেয়া হলো।

এ সময় ভাবছিলাম ইরানি এবং ইহুদিদের মধ্যে শত বছর ধরে যে নিবিড় সম্পর্ক তা কীভাবে ভেঙে গেল, নষ্ট হলো। খুব বাজেভাবেই সম্পর্ক ছেদ হয়েছে।

ইরানে ইসলাম বিজয়ে পূর্বে হাজার বছর ধরে ফরাসি এবং ইহুদিদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। জরাথ্রুস্টবাদ ও ধর্ম দর্শন এবং এর প্রচার বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় চিন্তায় মূল স্রোতধারা হিসেবে কাজ করেছে।

জরাথ্রুস্টের কথা, তার ধর্ম প্রচার, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস—এ সব কিছুই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যখন ব্যাবিলন থেকে ইহুদিরা বিতাড়িত হয় আবার পাল্টা আঘাত আসে ইরান থেকেও।

এ সবই ঘটেছে প্রাক ইসলাম যুগে। মুসার পঞ্চম গ্রন্থ তাওরাতে এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে এ কথা বর্ণিত আছে—পুণ্যবান এবং পাপী যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে।

এই মৃত্যু বলতে আত্মার মৃত্যু নয়, শারীরিক মৃত্যু। আত্মা অমর। তাই পার্থিব জগৎ থেকে পরলোকে যাওয়ার পর পুনর্জীবন শুরু হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হবে।

পাপীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পুণ্যবান ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে। স্বর্গ যেন সুন্দর বাগান। এ সবই জরথুস্ট এবং তার অনুসারীরা বহু শতাব্দী আগে মানুষকে বলে গেছে।

ইহুদিবাদের মূল স্রোতধারার অনুসারীরা একই কথা বলেছে। খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা এদের পেছনে ছিল। তাদের এ উপলব্ধি আসে দেরিতে। যদিও নিউ টেস্টামেন্টে স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

স্বর্গ যেমন সৃষ্টিকর্তার দান, তেমনি নরক হচ্ছে শয়তানের রাজ্যের মতো।

শয়তান যেমন মানুষকে প্ররোচিত করে বিপথে পরিচালিত করে, তেমনি সে হবে নরকের শাসক।

ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করে শয়তানের নিজস্ব স্বাধীন কোনো শক্তি ও সত্তা নেই। জরথুস্ট দর্শনেও বলা হয়েছে, প্রতিটি নর-নারী তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হবে। খারাপের জন্য প্রবল শাস্তি ভোগ করবে। তবে শয়তানের নিজস্ব ক্ষমতা নেই–এই যে দ্বিতীয় চিন্তা, এটা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

পারস্য বিজয়ের পর ওই সাম্রাজ্যের শীর্ষ ব্যক্তিরা এবং প্রাচীন পর্যবেক্ষকরা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস এবং ক্ষমতার রাজনীতির নতুন বাতাবরণ খুলে দিল এবং নতুন করে ইহুদি ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটাতে থাকেন।

ঈশ্বরের আদালতে থাকবেন স্বর্গীয় দেবদূত। তিনি কৌঁসুলি হিসেবে কাজ করবেন। ঈশ্বরের আদালতে বিচারে দোষীদের, অপরাধীদের শাস্তি হবে। পাহারায় থাকবে পুলিশ, কাল্পনিক অর্থে এ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। হিব্রু ভাষায় শয়তান।

ইহুদিদের মধ্যে অনেকেই পরলোকে নতুন জীবন, স্বর্গ, নরক, শয়তান বিশ্বাস করে না এবং এসবের চরম বিরোধিতা করে। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব দর্শনতত্ত্ব নিয়েই নিজেদের মধ্যে বিভক্তি রয়েছে।

অ্যাপস্টোল বলেন, 'আদুসের মতে পুনর্জীবন বলতে কিছুই নেই। কোনো দেবতা নেই, নেই কোনো ধর্ম। কিন্তু ফারিসের মতে এ সব কিছুই রয়েছে।'

ফারিসের এই চিন্তা-চেতনা রোমানদের সংখ্যালঘুরা বিশ্বাস করল এবং

ইহুদি ধর্মের মূল স্রোতধারা টিকে থাকল। পরিশেষে এ কথা বলাই যায়, ইহুদিরা কখনোই স্বর্গ-নরকের ব্যাপারটি হৃদয়গ্রাহী করতে চায়নি। এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান এবং মুসলিমরা পারস্যের ভিত্তির মূল রূপকার। তারা বিশ্বাস করে শয়তানের প্রতীক ডেভিল এবং তা মিথ্যার আবরণে পরিপূর্ণ।

প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত শয়তান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাজার বছর পর শয়তানকে কয়েদখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। সে চেষ্টা করবে পৃথিবীর মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে। পৃথিবীতে আসবে ইয়াজুজ, মাজুজ। তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের নাম শুনলে সাগরের পানি শুকিয়ে যাবে।

সপ্তম শতাব্দীতে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র কোরআন শরিফে স্বর্গের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাতে যেন পারস্যের চিত্রই ফুটে ওঠে।

স্বর্গ হবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসীদের চূড়ান্ত ঠিকানা। তিনি বলেন : স্বর্গে ফলের সমারোহ ঘটবে। এ যেন সুন্দর বাগান। তারা বাগানে বসে ফল ভোগ করবে। পাশে বয়ে যাবে ঝরনাধারা। তারা পানীয় পান করবে। তাদের পাশে থাকবে সুন্দরী কুমারী। থাকবে উটের সমারোহ।

মহানবী হজরত মোহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সৃষ্টিকর্তার সর্বকালের সেরা বার্তাবাহক। জরাথ্রুস্টের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করে অবহিত করেন। জরাথ্রুস্টই প্রথম নবী।

দীর্ঘ ইরান বা প্রাচীন পারস্য সম্পর্কে এত অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মের জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম। আড়াই বছর ধরে ইহুদি, সাইরাস, আকামেনিয়া সব ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ইরানের ইতিহাসে বলা হয়েছে—জরাথ্রুস্ট প্রথম পারস্যের নবী।

৮.
প্রথম নবী

নোরুজ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৈববাণী হচ্ছে : নোরুজের প্রথম দশ দিন এবং পরের দিন ইরানের জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সতর্কভাবে এড়িয়ে চলো। ইরানে নতুন বর্ষ শুরু হবে সব সময় ২১ মার্চ থেকে।

এই লিখিত দৈববাণী দেখে নিজের মধ্যেই প্রশ্ন জেগে ওঠে। আর এর মাধ্যমেই আমি পারস্যের নবী জরাথুস্ট ধর্মের দর্শনের এবং আদর্শের আর সত্তা বুঝতে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেছি।

নোরুজ মুসলমান ছিলেন না। সাইরাসের আমল থেকেই ইরানে নোরুজকে নিয়ে শুভ নববর্ষের উৎসব হতো। সরকারি ছুটি থাকত এই দিনে। ইরানে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসার এবং বিজয় হওয়া সত্ত্বেও জরাথুস্ট ধর্মের এই উৎসবে আনন্দ করে। বছরের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এই দিনে। ইউরোপে যেমন বড় দিন বা খ্রিষ্টধর্ম উৎসব পালন করে, সারা দিন আনন্দ-উৎসব করে, ঠিক তেমনিভাবে ইরানের মানুষ ও জরাথুস্ট ধর্মের লোকেরা এই আনন্দ করে। তবে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেটা আদর্শগত। খ্রিষ্টানরা যেমন যিশুর জন্ম উৎসব পবিত্র দিন হিসেবে পালন করে, এটাই তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব; জার্মানির জুলি ধর্মেও ঠিক একই রকম উৎসব হতো। মানুষ সত্যিকার অর্থে এই ধর্ম সম্পর্কে জানত যে, এই ধর্মের উৎস পৌত্তলিকতাবাদ থেকে। ফলে ইরানের নোরুজ কখনোই ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন না।

ধারণা করা হয়, নোরুজ ধ্যান-ধারণা শিয়া সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান বোধ, আবার নিরাশা থেকেও তার আদর্শের কথা ভাবা হয়। নোরুজের জন্ম সময় থেকেই ইরানের বছরের যাত্রা শুরু। নতুন বছরের সূচনা হতে থাকে। আর এই

নববর্ষের প্রথম দিনে পুরো জাতি উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দে সময় কাটিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে নবচেতনার জন্ম হয়।

রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তরুণ-তরুণী। এই উৎসবের দিনে ইরানের প্রধান প্রধান সড়কে দিন-রাত গাড়ি চলাচল করে। এ সময় গাড়ি চালানোও কঠিন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় উৎসবের জন্য হোটেল, মোটেল, অবকাশকেন্দ্র আগে থেকেই ভাড়া হয়ে যায়।

দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসে। উৎসবে যোগ দিতে পরিবারের সবাই দূর-দূরান্ত থেকে মিলিত হয়। জরাথ্রুস্ট ধর্মের নববর্ষের এই উৎসবে বয়স্করা সতীর্থদের জন্য উপহার নিয়ে আসে। ছোট শিশুদের জন্য মিষ্টি, চকোলেট এবং কেক উপহার দেয়। অনেকে জরাথ্রুস্টের অনুসারী সাজে। এ যেন খ্রিষ্টধর্মের বৃদ্ধের আসনের মতোই ব্যাপার। এই ধর্মীয় উৎসবে তরুণ-তরুণীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে। দিনটিকে তারা পবিত্র মনে করে। সন্ধ্যায় পর্যটক নগরী শাইরাজে উৎসবের হৈহুল্লোড় হতে থাকে এবং বর-কনেদের নিয়ে চলতে থাকে সারা রাত উৎসবের আমেজ।

এ সময় কিছুটা শীতের আবহাওয়া বিরাজ করে। মহিলারা গায়ে কালো চাদর পরে। তারা নানা রং-বেরঙের ঝকমকে পোশাক পরিধান করে। নগরীজুড়ে ঘুরে বেড়ায়। বাদ্য বাজায়। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। গোপনে বহু বাসায় মদের সরবরাহ হয়।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে প্রকাশ্যে মদপান এবং কেনাবেচা শুধু গুরুতর অপরাধই নয়, পাপও বটে। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে জরাথ্রুস্ট ধর্মীয় উৎসবে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে। দোকান, রেস্তোরাঁয় গাছের ডালপালা বিছিয়ে রাখে।

বিশেষভাবে জরাথ্রুস্টের প্রচার করার কাজে এই গাছপালার ডাল প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ব্যবসা প্রাঙ্গণ এবং হোটেল লবিতে 'এস' অক্ষরসংবলিত টেবিল বিছানো থাকে।

ধার্মিক নেতা কিমের প্রচার চলতে থাকে। সেখানে সাত ধরনের পাপের কথা বলা হয়। প্রতিটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার হয়। প্রতীকগুলো খুবই রহস্যময়। এ সময় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন প্রদর্শিত হয়। কিন্তু কোরআনে পাপাচারের বর্ণনা কোথাও 'এস' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়নি, এবং সেভেন এস দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে তা কোরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

তেহরানে যে হোটেলে ছিলাম সেখানে সেভেন এস-সংবলিত টেবিল প্রদর্শনের কথা ভুলে যাইনি। হোটেলের পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম এর অর্থ কী? তার উত্তরে সে বলল, নোরুজ।

ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এ সময় হোটেলের লবিতে বসে থাকা এক তরুণ, যে তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে, সে জানালো এস দিয়ে প্রতীক অর্থে যা প্রকাশ করা হয়েছে, ইসলাম ধর্ম সে ব্যাপারে বিরোধ প্রকাশ করে।

তবে ইরানের প্রাচীন ঐতিহ্যের কারণেই এর বিরোধিতা করে না। সে এমন কিছু মত প্রকাশ করল, যা ইসলামপূর্ব যুগের কাহিনী এবং নোরুজের সময়ের।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নোরুজের সময়কালে খুবই আশ্চর্য রকম ঘটনা ঘটত। আর সে সময় বর্ষ উৎসব যেভাবে পালিত হতো তা এক প্রকার পূজা অর্চনাই বলা যায়।

আধুনিক যুগে নববর্ষের উৎসব যেভাবে পালিত হয়ে থাকে, সে সময়ও এতে আনন্দ কম হতো না। পার্থক্য তখন মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে জরাথ্রুস্টের পূজা করত। আর বর্তমান ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয়ভাবে নববর্ষ পালিত হয়।

দারিউসের পার্সেপোলিস নগরীতে পাথরের মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তারা উৎসব করত এবং এসব মূর্তির প্রতি নিজেকে সঁপে দিত। বর্তমান সময়ে সরকার সব ধর্মের লোকদের উৎসবে স্বাধীনতা ভোগ করতে কোনো বাধা প্রদান করে না।

স্বৈরশাসক আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালনে ব্যাপক বাধা দিয়েছেন। সম্ভবত এটা ছিল আকামেনীয় সময়ের মতোই। তবে তখনকার মতো দেয়ালে ছবি ঝুলিয়ে রাখা বর্তমান সময়ে সম্ভব নয়।

বাস্তবিক অর্থে সাইরাস এবং দারিউসের সময় জীবনব্যবস্থা একই পর্যায়ে ছিল। এটাও বলা যায়, সাসনিয়া যুগে আরদাশির এবং জাদেগার শাসনামলেও একই অবস্থা ছিল।

বর্তমান ইরানের লোকেরা, তা শ্রমিক থেকে শিক্ষিত শ্রেণী, ধনী-দরিদ্র সবাই গর্ববোধ করে তাদের প্রাক ইসলামি যুগের সভ্যতা নিয়ে। ইরানে তেরো শ বছরের বেশি সময় হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইয়াজদে আগুনের মন্দির এখনো বিদ্যমান। এখানে জরাথ্রুস্ট সম্প্রদায় মিলিত হয়।

এমনকি পর্যটকরা এখানে ভ্রমণে আসে। হাজার হাজার পর্যটক তাদের অবকাশের সময় যে পোশাক পরিধান করে, এই মন্দিরে এসে তা-ই পরিধান করে।

ইলামিতে, আকামেনি এবং সাসনীয় এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। এটা ঠিক, বর্তমান সময়ে পারস্যের প্রাচীন ধর্ম এবং সেই ধর্মের অনুসারীদের কথা স্মরণ করে না। এমনকি প্রাচীন সময়ে সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজা এবং তাদের মতানুসারে আগুরা মাজদাকে রক্ষাকর্তা ও ঈশ্বর বলে ভাবত, সে সবের স্থলে ইরানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবার এ কথাও সত্য, মহাকবি ফেরদৌসি তার 'শাহনামা' কাব্যগ্রন্থে পারস্যের যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তার সবই ইসলাম বিজয়ের পূর্বের কথা। তারা ইসলামের পথে নেই। তারা মক্কার দিকে ধাবিত হচ্ছে না।

বিদেশি পর্যটক এবং গবেষক হওয়ার কারণে হোটেল লবিতে শান্ত হয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু সামনেই দেখতে পেলাম পুরো ইরানের নাগরিক কতটা আনন্দ করছে। এর মাঝে এক তরুণকে দেখতে পেলাম, একাকিত্ব ঘুচে গেল।

নাচের জন্য হলরুম রয়েছে। নাচের রুমের পেছনে সেই তরুণকে ডাকলাম এবং কিছু জানার জন্যই তাকে আসতে বলা। তবে এই আনন্দঘন পরিবেশ আরো বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলল।

এ সবই আমার একান্ত নিজের ভাবনা। একটা বিষয় খুবই সতর্কভাবে লক্ষ করলাম, জরাথ্রুস্টের যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, তা আজও আধুনিক সমাজে বিদ্যমান। জরাথ্রুস্টের শিক্ষা ও আদর্শ এই উৎসবে কী ভূমিকা রাখে তা জানতে চাইলাম, সে ইচ্ছা পোষণ করলাম।

ধর্মীয় এই অনুষ্ঠানের মৌলিকত্ব সম্পর্কে যা জানলাম, বাস্তবে এর পুরোটা প্রদর্শিত হচ্ছে না। যুগের বাস্তবতাকে মেনে নিতে হচ্ছে সবাইকে।

নোরুজ সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না কখনোই। তবে তা আগমন প্রতিবেশী ব্যাবিলন থেকে–এটা সবার মতো। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈশ্বরের আদর্শ পালন করা।

ব্যাবিলনে মারদুকের মূর্তি মন্দির থেকে বের করে আনা হয় এবং সেই মূর্তি সঙ্গে নিয়ে পুরো নগরী প্রদক্ষিণ করা হয়।

সারা শহরে ঘুরিয়ে আনার সময় মারদুকের আদর্শে বিশ্বাসীরা প্রণাম করে। এটাও একধরনের পূজা। ভূমধ্যসাগরের চারপাশজুড়ে এবং মাল্টাতেও

একই ঘটনা ঘটে। মাল্টাতে কুমারী নারীরা গির্জা থেকে বের হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।

বর্তমান যুগের ইহুদি সম্প্রদায় তাদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শহর প্রদক্ষিণ করে বটে তবে তারা মূর্তি বহন করে না। তারা ঈশ্বরের আদর্শ প্রচার করে।

ব্যাবিলনের অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হবে তা হচ্ছে, ব্যাবিলনের শেষ রাজা নবনিডাসের পতনের কারণ ছিল রাজধানী থেকে তিনি অনেক দূরে ছিলেন এবং শাসনকাজে মনোযোগী ছিলেন না। রাজ্য পরিচালনায় অসংখ্য ভুল ছিল তার। সাইরাসের কাছে তিনি পরাস্ত হন। তার অনুপস্থিতির কারণে নববর্ষের উৎসব ব্যাপকভাবে আয়োজন করা হতো না।

এদিকে মারদুকও তার নিজের লোকদের বিজয় উৎসব যেন দমন করতে পারছিলেন না। সেটা বাস্তবিক অর্থে সম্ভব ছিল না। এ কাজটিই মূলত করেছিলেন সাইরাস। তিনি নিজের সিংহাসনে অবস্থান নিশ্চিত করতে এবং ক্ষমতা রক্ষা করতে বিদেশি শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সমগ্র ইরানে বিদেশি শক্তির ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রচলন করেছিলেন সাইরাস নিজেই।

নোরুজ যদি জরাথ্রুস্ট গোষ্ঠীর না হন তাহলে 'শাহনামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌস ইরান সম্পর্কে প্রাক ইসলামিক যুগের যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা কি আধুনিক ইরানবাসী মেনে নিয়েছে কখনো?

ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ফেরদৌস 'শাহনামা' কাব্যগন্থে শুধু পারস্যবাসীদের হৃদয়গ্রাহী নয়, বরং এ কথা বলা যায়, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তুরানেও এর প্রভাব পড়েছিল। পারস্যে আধুনিক স্কুলশিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা দেয়া হয়।

তুরান হচ্ছে তাদের পুরনো শত্রু তুরস্কের দখলে ছিল এবং পরবর্তীকালে বিজয় সূচিত হয়েছে তাদের এবং তুরান ইরানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তুরান দখলের পরও তুর্কি বাহিনী বহু শতাব্দী পর্যন্ত এই ভূমিতে পৌঁছাতে পারেনি। দখল নিতে পারেনি।

পারস্যে নবীর সন্ধানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। বহু অনুসন্ধান করে এবং গবেষণার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো, জরাথ্রুস্ট শুধু ইরানের নন, মধ্য এশিয়ার প্রথম নবী। শাহেনশাহের গল্পকাহিনীতে যে স্থানের উল্লেখ করা

হয়েছে এবং জরাথ্রুস্টের ধর্ম প্রচারের স্থান একই স্থান এবং সেখানে ভ্রমণ করার পর এটাই বুঝতে পারলাম, জরাথ্রুস্ট প্রথম পারস্যের এবং মধ্য এশিয়ার নবী।

পারস্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ইরানের এবং মধ্য এশিয়ার প্রথম নবীর সম্পর্কে সব তথ্য জানা হলো। এখন ফিরে যাওয়ার পালা। টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার গাড়িতে করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাচ্ছি। এক নদীর কাছে পৌছালাম। গাড়ি থামালাম। অবাক হলাম নদীর পানি দেখে। অদ্ভুত রঙের পানি। নীল এবং সবুজের যেন সমারোহ। প্রচুর বাতাস বইছে। ধুলা বইছে। গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সূর্যের প্রখর তাপ যেন সহ্য করার মতো নয়। গাড়ির চালক হঠাৎ করেই কাউকে কিছু না বলে টুল নিয়ে ধূলিঝড় থেকে রক্ষা পেতে গাড়ির তলে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা তার কার্যকলাপ দেখে অবাক হলাম। রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। এমন ভাব করল, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে কোনো প্রশ্ন করলাম না। ভাবলাম, বিশ্রাম নিক।

প্রাচীন এই নদীর নাম অক্সাস। বর্তমানে নামকরণ হয়েছে আমুদারিয়া। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হাজার মাইল দূরে পামির মালভূমি থেকে এই নদীর মূল স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে। আফগানিস্তানের সীমান্তে এই নদীর উৎপত্তিস্থল। আর শেষ হয়েছে আরব সাগরে মিশে। নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাকুম। কালো বালির বিশাল প্রান্তরজুড়ে মরুভূমি। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আফগান নগরী বালাক। রয়েছে মাজার শরিফ। ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলীর মাজার। উত্তর-পূর্বে রয়েছে কাজিলকুম বা লাল বালুকাময় সৈকত। এখানেই মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত দুই নগরী বোখারা এবং সমরকন্দ অবস্থিত। এ দুই নগরীর কোনো এক স্থানের থেকে ধারণা করা হয় মহামতি আলেকজান্ডার তার সৈন্য নিয়ে পাড়ি দিছিলেন এবং শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য খড়কুটো দিয়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছিলেন। অনেক সময় তারা গবাদিপশুর ঘরে লুকিয়ে থাকতেন।

ইতিহাসের সব ঘটনা এবং স্থানের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেকেই হতাশ হবেন। আর সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও। সর্বোচ্চ প্রত্যাশা করা এবং এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি অর্জন করা দুরূহ। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও নিশ্চিত ছিলাম না কী আমি খুঁজছিলাম এবং তা ঠিকমতো পেয়েছিলাম কি না তা জানি না। আমার কল্পনার সঙ্গে পারস্যের প্রথম নবী সন্ধানের উৎসস্থল এসে মিশেছে। আমুদারিয়ার নদীর পানি যেমন দুই মরুভূমির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত

হচ্ছে, তেমনি আমার চিন্তাগুলো যেন সমগ্র পারস্যজুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এটাই সর্বশেষ কথা।

সাহারা মরুভূমির মতো হলেও এগুলো তেমন নয়। এই নদীর তীরে বেশ কিছুটা উর্বর ভূমি রয়েছে। ধান, গমের চাষ হচ্ছে। পুরো এলাকা একেবারে চাষাবাদের অযোগ্য নয়। আবার নদীর কূল ঘেঁষে বাঁশঝাড়। বালুতটে ঘাস জমা পড়ে আছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী ইউরেশিয়ানের আন্তমহাদেশীয় সড়কপথ বয়ে চলেছে। এই সড়ক দিয়ে বলকান থেকে মঙ্গোলিয়ায় যাওয়া যায়। এমন এক সময় ছিল, আমুদারিয়া নদীর তীরবর্তী এলাকা খুবই উর্বর ছিল। প্রচুর ফসল জন্মাত। শাকসবজি হতো। এ অঞ্চলে বসবাসরত যাযাবর গোষ্ঠী গবাদিপশু পালন আর চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত।

প্রথম সহস্রাব্দের আগ পর্যন্ত তুর্কিরা এই অঞ্চলে আগমনের আগ পর্যন্ত আমুদারিয়া নদীর কূলবর্তী এলাকায় বসবাসরত যাযাবররা ইরানি ভাষায় কথা বলত। তারা এই ভূমি নিয়ন্ত্রণ করত। কত হাজার বছর ধরে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এর পরিষ্কার কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তারা ছিল উপজাতি-গোষ্ঠীর মালিক। তারা ষাঁড় গরু পালত। ছোট ছোট ঘর তৈরি করত। শাকসবজির বাগান তৈরি করত। মৌসুমে ফসল ফলাত। এই যাযাবর গোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল। যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ছিল এবং তাদের মধ্যে শিল্পকর্ম ব্যাপৃত হতো। তারা পশুর কৌশল নিয়ে শিল্পকলা করত। বাস্তবতা উপলব্ধি করে সেল্টিক, ভাইকিং এবং মধ্যযুগের কৌশলে সবই শিল্পকলায় তুলে ধরা হতো। মৃৎশিল্পের কাজ হতো নিখুঁতভাবে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তেও এসব দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতের এসব উপজাতি-গোষ্ঠীর নাম স্মরণযোগ্য। যেমন–অ্যালানস, সারমাথিয়ানস, স্কাইথিয়ানস, কিমেনারিসা যাযাবর গোষ্ঠী। এই জাতিদের আমুদারিয়াতে বসবাসের হাজার বছর আগে সাইরাসের পার্সী গোষ্ঠী দক্ষিণ ইরানে বসবাস করত। মরা প্রান্তর এবং বিশাল বনাঞ্চলে বসবাসরত জাতি-গোষ্ঠী মেডেসরা ইরানে অভিবাসিত হয়। তারাই পারস্য সাম্রাজ্যের সন্ধান পায়।

আমুদারিয়ার পশ্চিম প্রান্তে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মিত মোটর-লরি দিয়ে সৈকতের বালু সরানো হচ্ছে। শ্রমিকরা খাকি পোশাক পরে কাজ করছে। যাযাবর গোষ্ঠীর সাধু-সন্ন্যাসীরা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন কৃত্রিম উপায়ে। এই নদী এক সময় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এটা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যে, এর আদি অধিবাসীদের কোনোভাবে

অস্বীকার করা। আজ অতীত, বর্তমানে নতুন ধারা সূচিত হয়েছে। এই নদী এবং এর গতিপথ অন্য দশজনের মতো আমাকে আকৃষ্ট করেছে। এতটা প্রভাবিত কেন হলো তা নিয়ে ভাবছিলাম।

জরাথ্রুস্ট কাহিনীর যতই শেষ পর্যায়ে আসছি, ততই আমুদারিয়া নদীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আবার সেই সূর্যরশ্মির প্রচণ্ড তাপদাহ এবং গরম, অপরিশোধিত তেলকূপের কথা মনে পড়ল। এ সবই আজ স্মৃতি। আমুদারিয়া নদী দুটো প্রাচীন দেশ বাকতারিয়া এবং খোরাজামকে বিভক্ত করেছে। আমুদারিয়া এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালার মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে দুটি দেশ অতিক্রম করেছে।

এই হিন্দুকুশ পর্বতমালার কোনো এক স্থানে পারস্যের নবী জরাথ্রুস্টের জন্ম এবং পিতৃভূমি। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে, একমাত্র সত্য ধর্মের নবীর উত্থান ঘটেছিল আর্য সম্প্রদায় থেকে। এ বিষয়ে ব্যাপক তর্কের প্রয়োজন নেই। যতই অতীতের স্মৃতিচারণা করা হবে ততই জরাথ্রুস্টের রূপান্তর ঘটবে।

এতে ইউরোপীয়দের প্রভাব, মধ্যযুগীয় সময়, অন্ধকার যুগ, প্রাচীন অসামঞ্জস্য সমাজব্যবস্থা, সনাতনী যুগে শেষ খ্রিষ্টধর্মের প্রচার শুরু এবং বিশ্বে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ফিরে যাওয়া এবং ধর্মীয় ইতিহাস লেখনীর সূচনা, নবী জরাথ্রুস্টের কাছাকাছি হওয়া বা ঘনিষ্ঠ হওয়া, তার কাছে থেকে দূরে সরে যাওয়া, তাকে সাধু-সন্ন্যাসী ভাবা–সব কিছুই এক স্তরে চলে আসবে।

দুটি সূত্র আজও আমাকে ভাবায়। একটি হচ্ছে পণ্ডিতবর্গের গবেষণা, দ্বিতীয়টি জরাথ্রুস্টের ধর্মের ঐতিহ্য। এ কথা সত্য, ধর্মের বক্তব্য এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণা আধুনিক চিন্তাবিদদের দর্শনের সঙ্গে বিরোধ হবেই এবং সেটাই হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং দর্শন নিয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে। তারা কখনোই একমত হতে পারেননি, জরাথ্রুস্ট ধর্মের সঠিক এবং নির্দিষ্ট সময়কাল কখন হতে পারে।

পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার প্রথম নবী জরাথ্রুস্টের আদর্শবাদী এবং মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে, তাদের নবী রূপান্তরবাদী হয়ে পৃথিবীতে আসেন আলেকজান্ডারের ২৫৮ বছর আগে। এর অর্থ দাঁড়ায়, মহামতি আলেকজান্ডার পার্সেপোলিস রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ শতাব্দীতে। তাহলে গণনা করে পাওয়া যায়, জরাথ্রুস্টের পৃথিবীতে আগমন হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮ শতাব্দীতে।

ঠিক এই সময়ে আকামেনিস সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহান সাইরাস জন্মেছিলেন। তার জন্ম সময় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯০ থেকে ৫৮০ শতাব্দীর কোনো এক বছরে। জরাথ্রুস্ট ধর্মে বিশ্বাসী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন রাজা বিশ্বথাপা। তিনি ছিলেন মহান রাজা দারিউসের বাবা। সাইরাস এবং দারিউসের শাসনামলে প্রধান গভর্নর ছিলেন বিশ্বথাপা।

তার নির্দেশেই রাজ্য পরিচালিত হতো। কিন্তু আমরা এটা জানি, দারিউসের দাদা এবং পিতামহ তারা সবাই এক এবং একমাত্র ঈশ্বর আহুরা মাজদার নির্দেশে চলতেন। তখন থেকেই নবী জরাথ্রুস্টের আদর্শবাদী এবং অনুসারীরা তার ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করে।

এই জরাথ্রুস্টবাদীরা ইরানে মনুবাদ প্রচার করেছিল। সেটা আলেকজান্ডারের পারস্য দখলের ২৫৮ বছর আগে ঘটনা। হয়তো এর আগেও হতে পারে। পণ্ডিতরা ব্যাপক অনুশীলন করে দেখেছেন, জরাথ্রুস্টের আগমন গ্রিক সময়কাল থেকেই এসেছে, ইরান থেকে নয়।

কিন্তু এটাও সত্য, জরাথ্রুস্টের জন্ম, তার ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় ঐতিহ্য—সব কিছুই তেহরান থেকে আগত। তেহরানের প্রাচীন নগরী রাহাজ থেকে এই ধর্মের প্রসার ঘটে। আবার এমন ধারণা করা হয়, ইরানের উত্তর-পশ্চিমের নগরী মেডেয়া থেকে এর উৎপত্তি।

বর্তমানে এই বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠী তুর্কির এবং তুর্কি ভাষায় কথা বলে। আফগানিস্তানের মানুষ বিশ্বাস করে, নবী জরাথ্রুস্ট বালাক নগরীতে তার ধর্ম প্রচার করতেন। তিনি এই এলাকার মানুষ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, জরাথ্রুস্ট মধ্য এশিয়ার নবী। সম্ভবত তিনি কাজাখস্তানের অধিবাসী।

এই তর্কের শেষ নেই। শিক্ষিত এবং জ্ঞানী সমাজ কখনোই জরাথ্রুস্টের জন্ম, ধর্ম প্রচার কোথা থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে একমত হতে পারেননি। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তার মত দিয়েছেন। সে অধিকার সবার রয়েছে।

জরাথ্রুস্টের জন্ম, ধর্ম প্রচার নিয়ে বিভিন্ন দেশ-জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করছেন, তা খুবই কাল্পনিক এবং ইতিহাস বিকৃত তথ্য। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো সাহায্য করতে পারেননি।

জরাথ্রুস্টের ধ্যান-ধারণা, তার ধর্ম-আদর্শ কী বলতে চেয়েছে, সমাজে কী কল্যাণ বয়ে এনেছে, তার ধর্মের বিশ্বাস গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে নগরবাসীদের মধ্যে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এ কথা সত্য যে, মুখে মুখে

প্রচলিত জরাথ্রুস্ট ধর্মের কথা সাধারণ মানুষ খুবই সহজে গ্রহণ করেছিল। কারণ জরাথ্রুস্ট সত্য প্রচার করেছিলেন, এক ঈশ্বরের কথা বলেছিলেন।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, যুগের পর যুগ, কাল, সময় মুখে মুখে প্রচারিত জরাথ্রুস্ট ধর্মের কথা পারস্যসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। তাই এ ধর্মের কোনো পবিত্র গ্রন্থ বা লিখিত বই ছিল না। এমনকি তার অনুসারীরা যতক্ষণ না তার আদর্শের এবং দর্শনের কথা লিখে রেখেছে তত দিন তা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়েছে।

জরাথ্রুস্ট ধর্মের সংকলিত ধর্মগ্রন্থ, যা গ্রিক এবং রোমান ভাষায় লেখা ছিল; তার ৯০ শতাংশ হারিয়ে গেছে এবং প্রাচীন পারস্যে জরাথ্রুস্ট ধর্মের সংকলিত গ্রন্থের সন্ধান খুবই কম পাওয়া যায়।

আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই ধর্মগ্রন্থ, যা ইরানিদের মধ্যে প্রবলভাবে আঁকড়ে ছিল, তা ক্ষয় হতে থাকে। তার চিন্তা-চেতনা-দর্শন এবং বিশ্বাস সব কিছুই যেন মুছে যেতে থাকে ইরানের সমাজ থেকে।

জরাথ্রুস্টবাদীরা বলেছে, তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে আলেকজান্ডারের সময়। মেসেডোনিয়ার এই মহামতি বীর বহু বই পুড়িয়ে ফেলেছেন। এমনকি বহু ধর্মপ্রচারককে হত্যা করেছেন। কিন্তু জাতি-গোষ্ঠী ওই সময়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঠিকই সংরক্ষণ করতে পেরেছিল।

বিশেষ করে ইহুদিরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণ করেছিল। তারা পাঠাগার নির্মাণ করেছিল। ফলে আজও পাঠাগার থেকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থের বই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পবিত্র বাইবেল শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ইরানিরা কেন এত সহজে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ হারিয়ে ফেলল তা পুরোপুরি রহস্যময়। এ বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন তত্ত্ব ও মত লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা না হলো এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল, তত দিন তাদের অন্ধকার জগতেই থাকতে হয়েছে। এর গুরুত্ব গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস অনুধাবন করেছিলেন।

বাস্তবিক অর্থে হিব্রু ভাষাভাষি মানুষ তাদের ধর্মগ্রন্থ খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছিল এবং তা হয়েছিল রাজা ডেভিডের নির্দেশে। তবে পারস্যের রাজা সাইরাসের যুগে লেখার কোনো উপকরণ ছিল না।

প্রস্তরের গায়ে লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্রাট নিজেই। তার উত্তরসূরিরা একই কাজ করেছিল এবং তাম্রলিপি মেসোপটেমিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল।

তারা সহজ-সরল ভাষায় পারস্যদের ব্যবহারের জন্য এই তাম্রলিপি প্রয়োগ করে। এর ফলে পৃথিবীতে লেখনী যুগের সূচনা হয়।

বর্ণমালার বিভক্তির শুরু এখান থেকেই। অপারস্যীয়, ইহুদি ভাষা, আসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিচিত আরামিক, তারাও বর্ণমালার প্রচলন ঘটায় এবং লিখিত আকারে প্রকাশ করে।

একটা বিষয় খুবই আশ্চর্য যে, পারস্যের থেকেও আরামিক ভাষা পরবর্তী এক হাজার বছরে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমাজে বড় অবদান রাখে। যদিও এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, পারস্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ ছিল। পারস্য জাতি-গোষ্ঠী লিখিত কনো কিছুর থেকে মুখে মুখে কথ্য বা প্রচারিত ভাষাকে মূল্য দিত।

আধুনিক ইরানের সমাজে দেখা যায়, লিখিত বিষয় আসলেই তারা আরবিতে লেখে, নিজের ভাষায় লেখে না। এ জন্য তারা অনুবাদক রাখে। তারা সব কিছু কবিতার ছলে বর্ণনার চেষ্টা করে।

এমনকি ট্যাক্সিচালক যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ইচ্ছা বা অনিচ্ছকৃতভাবেই হোক কবিতার ছন্দ প্রয়োগ করে। অনেক সময় তারা প্রাচীন প্রবাদ স্মরণ করে। যত্রতত্র তা প্রচার করে। এটা সম্ভব হয়েছে দেশের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে।

সেটা লিখিত এবং কথ্য যেভাবেই হোক না কেন। আর এ কারণে আমরা ভাগ্যবান যে, জরাথ্রুস্টের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ না পেলেও অতীতের কিছু প্রচলন দেখতে পাই।

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ লিখিতভাবে কাগজে ছাপা হয়নি জেরুজালেমে মন্দির ধ্বংসের আগ পর্যন্ত। তামুদ জাতিরা প্রথম কাগজে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ লিখিত আকারে প্রকাশ করে। ইসলামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কীভাবে কোরআনের ভাষা লিপিবদ্ধ করেছে তাও সঠিকভাবে বর্ণনা নেই। পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল অনুসারীদের মাঝে।

আলেক্সান্ডারের শাসনামলে এবং তার পরবর্তী সময়ে জরাথ্রুস্ট ধর্ম তার শিক্ষা, দর্শন, ধ্বংসে উপনীত হয়েছিল। এরপর শত বছর ধরে এই ধর্মের অনুসারীরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল।

প্রাচীন এই ধর্ম সবার কাছে উপহাসে পরিণত হলো। এই হারিয়ে যাওয়া, নষ্ট হওয়া বা হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ জরাথ্রুস্ট ধর্মের কথা লিখিত আকারে

ছিল না কখনোই। তৃতীয় শতাব্দীতে সাসনীয় শাসক আরদাশির পদক্ষেপ নিয়েছিলেন জরাথ্রুস্টীয় মতবাদ, দর্শন লিখিত আকারে প্রকাশ করবেন।

জরাথ্রুস্টের অনুসারী এবং ধর্মপ্রচারক কাটির ছিলেন মনির শত্রু। তিনিও কিছু জরাথ্রুস্ট ধর্মের কথা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। আরেক ধর্মপ্রচারক তানসার, তিনিও জরাথ্রুস্টের ধর্মতত্ত্বগুলো সংরক্ষণ করে লিখিত আকারে প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন।

রাজা শাহের নির্দেশেই তিনি এ কাজ করেন। এই সব ঘটনা আলেক্সান্ডারের পারস্য বিজয়ের ৬০০ বছর পর ঘটেছিল, যখন এই ধর্ম প্রথমবারের মতো সংকটের সম্মুখীন হলো এবং মানসিক যন্ত্রণার শিকার হলো তারা।

পণ্ডিত ব্যক্তি হায়াম সলোতেচিক উল্লেখ করেন,

> *'যখন পৃথিবীতে সব কিছু লিখিত আকারে গ্রহণের আইন পাস হলো, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু হলো তখন থেকেই অলিখিত কোনো ধর্মগ্রন্থের বাণী মানুষের কাছে মনগড়া মনে হতে থাকে।'*

আর বিপর্যয় সেখান থেকেই শুরু।

সমাজে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, দর্শন এসব কিছুর মূল্য হারিয়ে গেল। একজন মানুষ কতটা দেখেছে তার ওপর নয়, বরং কতটা সে জানে সেভাবেই বিচার করা হলো।

তবে আরদাশির এবং তার উত্তরসূরিরা সময়ের বাস্তবতা অনুধাবন করেছিলেন আর সে কারণেই তাদের বিশ্বাসের থেকেও কতটা বেশি জরাথ্রুস্ট ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আছে–এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান করেছিলেন।

নবী জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পারি বা ধারণা করতে পারি, এই ধর্মের লিখিত কোনো গ্রন্থ পাওয়ার পরও এই ধর্ম আমাদের বা তৎকালীন পারস্যবাসীদের কী শিক্ষা দিতে পেরেছে–জরাথ্রুস্ট ধর্মের নীতি থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে :

> *'বিশ্বভূমিতে আমি যত্রতত্র উড়ে যেতে পারি।*
> *যখন খুশি তখন চলে যেতে পারি।*
> *বিখ্যাত হোক অথবা আমার পীর হোক, আমি তা ত্যাগ করতে পারি।*
> *মানুষ যেন আমাকে উজাড় করে ভালোবাসে না*
> *এই পৃথিবী যেন কখনো মিথ্যাবাদী শাসন না করে*
> *কেমন করে আমি আহুরা মাজদাকে সন্তুষ্ট করব*

আমি তা জানি না। ও আহুরা মাজদা, তোমাকে খুশি করতে আমি ব্যর্থ
আমার হৃদয় ভেঙে গেছে এবং খুব কম লোকেরই তা আছে
আমার কান্না পাচ্ছে। ও আহুরা, আমাকে করুণা করো।
তোমার পথ প্রদর্শনে আমায় কাছে বন্ধু পাঠাও।'

এই কবিতাটিতে পার্সি ভাষায় ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে। আমাদের এই পৃথিবীকে সুন্দর করতে সময় প্রার্থনা করা হয়েছে। এর ভাষা খুবই মর্মস্পর্শী। পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন এবং সনাতনী আদর্শে বিশ্ববাসীদের থেকে এই কবিতার ছন্দ সংগৃহীত হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে এই শ্লোক আবৃত হতো। সে সময় এই ভূমি ছিল পাপাচারে পরিপূর্ণ। এই কবিতার পরবর্তী সংস্করণ রূপ প্রাচীন সংস্কৃত, যা মূল ভাষা থেকে রচিত হয়েছে। বেদ হচ্ছে হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। সংস্কৃত এবং পার্সি ভাষায় কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তবে যিনি এই দুটি ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তার জন্য এই কবিতার মমার্থ উপলব্ধি করা দুরূহ এবং বাস্তবিক অর্থে সম্ভব নয়।

আভেস্থা থেকে পার্সি ভাষায় লেখা হয়েছে :

'তোমার মুক্তি জরাথ্রুস্ট দর্শনে মিথরাবাদে।'

সেটাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলো :

'হে মানুষ তুমি মুক্তি পাবে জরাথ্রুস্ট দর্শনে।'

(আমি হচ্ছি মিথরার পক্ষের একজন মহাযোদ্ধা, তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান শক্তিশালী দেবতা, সব সৃষ্টির মূল উৎসদাতা তিনি)

এই দুটি ভাষা একে অপরের থেকে কিছুটা জটিল এবং বর্ণনার দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। তবে দুটি ভাষা বিন্যাস পরিশোধিত হয়েছে শত শত বছর আগে, সেই সময় থেকে পারস্যের উত্তরসূরি বা পরবর্তী প্রজন্ম এবং ভারতীয় আর্য সম্প্রদায় দুই গোষ্ঠী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়, তারা নিবিষ্টচিত্তে এক পক্ষ ষাঁড়ের এবং আরেক পক্ষ নদীর উপাসনায় মগ্ন হয়। এসব ঘটনা গ্রন্থ গবেষকরা গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, এটার সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ শতাব্দী পর্যন্ত, তবে জরাথ্রুস্ট দর্শনের পূর্ণাঙ্গ লিপি আরো পরে লিপিবদ্ধ হয়।

এতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবী জরাথ্রুস্ট খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটা

এমন একটা সময়, যখন মধ্যপ্রাচ্যের অন্য প্রান্তে মুসার দর্শন নিয়ে চলছে ব্যাপক তোড়জোড়। মুসার মতোই জরাথ্রুস্ট তাম্রযুগে নবী এবং পারলৌকিকবাদী ও বার্তাবাহক হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাদের আগমনের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে কোনো এক সময়। অনেকের মতে, জরাথ্রুস্ট তাম্রযুগের মাঝামাঝি পর্যায় ইব্রাহিমের কোনো এক সময় পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির জন্য এসেছিলেন। অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত কারণে সেইসঙ্গে মানুষের ব্যাপক আন্দোলন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, ভৌগোলিক গতিধারার পরিবর্তনের ফলেই সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক ইউরোপে উনিশ শতাব্দীতে সঠিক দিন-তারিখ গণনার যে হিসাব করা হয়েছে, তাতে নতুন করে পৃথিবীর মানুষ সুন্দর স্বপ্ন দেখতে থাকে। দিন-তারিখ গণনার হিসাব সঠিকমতো আসার পর মানুষের কষ্ট কমে গেল, সেইসঙ্গে জরাথ্রুস্ট দর্শনে বিশ্বাসী অনুসারীরা যেন 'তলোয়ার এবং শান্তির' বাণী প্রেম, উপাখ্যান, সবই রচিত হলো। এ সব কিছুই ইউরোপের মধ্য এবং অন্ধকার যুগের কাহিনী। রোমান এবং গ্রিকরা এ সময় একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসে। তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর কারণ একটাই, ওল্ড টেস্টামেন্ট। এর বৈশিষ্ট্যগত কারণেই এ দুই জাতি-গোষ্ঠীর মিলন হয়েছিল। তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সর্বত্র (যদিও একটি বিষয় পরিষ্কার যে, আমরা পেছনের দিকে তাকাব না আর জ্ঞানার্জনের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হব)। কিন্তু জরাথ্রুস্টের দর্শন, এমনকি ইসরায়েলের নবী এরা ভবিষ্যতেও থাকবে মানুষের হৃদয়ে। আমরা আবার পেছনের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এমন একটা সময়ের কথা বলছি, যখন মানবের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যখন মানুষের হৃদয় একেবারে তাড়িত হতো ধার্মিক বিশ্বাস, নীতি এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে। ঈশ্বরের প্রতি জরাথ্রুস্টের এই যে করুণ আহ্বান-এতেই বোঝা যায়, কখন এবং কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুধর্ম গ্রন্থ বেদে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে। জরাথ্রুস্টের এই ধর্ম প্রচারের কথাগুলোর ফরাসি, সংস্কৃত এবং বেদ গ্রন্থের সঙ্গে মিল ও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এমনকি যার পক্ষে জরাথ্রুস্টের ধর্মের মৌলিক কথা ও দর্শন বোঝা সম্ভব নয়, সেও এই ধর্মের মূল দর্শনের সঙ্গে বেদ গ্রন্থের মিল দেখে হতবাক হয়ে পড়ে।

ধর্ম প্রাণবন্ত

মধ্য এশিয়ার মানুষেরা যেন দীর্ঘায়ু হয়। তাদের স্মরণশক্তি প্রখর। জরাথুস্ট ধর্ম প্রচারের সময় পারস্যের রাজা-বাদশাহদের জীবন কাহিনী কত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। এই পবিত্র ভূমিতে পৌঁছানোর পর থেকেই তাদের রাজা-বাদশাহর নাম অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে।

পারস্য ভ্রমণের পর সে দেশবাসীর মুখে যখন রাজা-বাদশাহর কাহিনী শুনি তখন আমার চিন্তা আরো বেশি পরিশীলিত করে তোলে। আমি এক বরযাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। চলতি পথেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাদের একজনকে পারস্যের অতীত, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই অবলীলাক্রমে অতীতের সব কিছু তুলে ধরলেন। আয়নার মতো সব কিছু ফুটে উঠল। এ ঘটনা ঘটেছিল আমুদারিয়া নদীতে যাওয়ার পথে। এ সময় মিল্ক রোডের পুরনো স্টেশনে গিয়েছিলাম। এটা ছিল বালাক নগরীর পশ্চিমে।

বহু বছর আগের গির্জার দুর্গ এখনো অক্ষত রয়েছে। দুর্গের পুরো এলাকা তারকাঁটা দিয়ে ঢাকা। সড়ক শেষ হয়েছে যেখানে সেখান থেকে আফগানিস্তান সীমান্ত শুরু। অন্যদিকে সমরকন্দ এবং পর্বতমালা। ছোট্ট টিলার ওপর দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। একটা বিষয় সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল এই দুর্গ নির্মাণকারীরা। সমগ্র এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য সড়ক সমরকন্দ। অথচ এই দুর্গ নির্মাণের সময় বিশ্রামের স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার এক গরুর গাড়িতে চড়ে এক বিখ্যাত যাত্রী এই সড়ক পাড়ি দিচ্ছিলেন।

তিনি দেখলেন, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা, বহু দোকান এবং চা বিক্রয় কেন্দ্র। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, ভ্রমণকারীরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সময় এখানে বিশ্রাম নেয়। তারা হালকা নাশতা করে। এ সবই পারস্যে ইসলাম বিজয়ের এক হাজার বছর আগের কথা।

অতীতের এসব ঐতিহ্য সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও এই দুর্গের কাছে এলে বাস থামে। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে হাঁটাচলা করে এবং চা পান করে। আবার স্থানীয় গ্রামবাসী বাসে উঠে সমরকন্দ অথবা আফগানিস্তানে যায়।

এই দুর্গের মাঝে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের নির্মম কাহিনী মধ্য এশিয়ার মানুষ ভুলে যায়নি। কী নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে সোভিয়েত বাহিনী তা

সবার মনে এখনো জ্বলজ্বল করে। তবে এত কিছুর পরও বিধ্বস্ত দুর্গের কাহিনী আজও পারস্যবাসীর মনে পড়ে। এখানে দুটি টাওয়ার ছিল। যেমন কফির সঙ্গে চিনি না মেশালে পূর্ণতা পায় না, তেমনি টাওয়ার দুটো যেন একে অপরের প্রাণ।

আর টাওয়ারে প্রচুর কাঠের দরজা ছিল। কিন্তু আজ সবই হারিয়ে গেছে। নেই টাওয়ার। বরং সেখানে আধুনিক দালানকোঠা উঠেছে। বিধ্বস্ত দুর্গের কোনো ব্যবস্থা নেই। দুর্গের অভ্যন্তরে ঘাস, লতাপাতা জন্মেছে।

জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরে গাছগাছালি ছিল। মনোরম পরিবেশ ছিল। আজ সবই স্মৃতি। হারিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

পারস্যের সেই দুর্গতে বেড়াতে গিয়েছিলাম শীতকালে। পানির ট্যাংক শুকিয়ে গেছে। মাঠ ফেটে চৌচির হওয়ার মতো অবস্থা। শীতকালেই এখানে পর্যটকরা ভ্রমণে আসে। তরুণ-তরুণীদের ভিড় বেশি। রং-বেরঙের পোশাক দেখা যায়। অনেকে বিয়ের পর প্রথমেই এখানে ভ্রমণে আসে। গাছের নিচে সাধারণ অভিভাবকরা বসে। পুরুষরা সাদা কোট পরে। তাদের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বৃদ্ধরা সাদা কোট পরে, কারণ তারা সাদা দাড়ি রাখে এবং সাদা ট্রাউজার পরে। তবে জুতা কালো। আর এই পুরো দলের সঙ্গে থাকে নৃত্য পরিবেশনকারী দল।

ধূসর রঙের স্যুট-পরিহিত বিশাল দাড়িওয়ালা ড্রাম বাজাচ্ছে। তার ড্রাম বাজানোর ছন্দে তরুণ-তরুণীরা নাচছিল। এ সময় দুই তরুণ গান গাইল। তাদের সঙ্গে অন্যরাও গান গাইতে শুরু করে। এ সবই আজ স্মৃতি। বর্তমান সময়ে বিয়ের যাত্রীরা নাচগান করে না। তারা মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করে।

তারপর হাজির হলো দুই তরুণ-তরুণী। তাদের পরনে নীল শার্ট এবং স্যুট। নববিবাহিত এই তরুণ-তরুণী ম্যাঙোলিয় জাতি-গোষ্ঠী। সবশেষে এলো গায়ক দল, তারা গানের ছন্দে রচনা করল। তাদের সঙ্গে সবাই সুর মেলাল।

আজকের এই বর-কনেরা এসেছে সরাসরি মসজিদ থেকে। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশিত হলো। ৫০ জন অতিথি মিলিত হয়ে স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়ায়। মহান দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা, যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই তাদের স্মরণ করে। সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, ওয়ারশ চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু পুরনো সেই অভ্যাস আজও অমলিন

রয়েছে। এক সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের বার্ষিক উদ্‌যাপন, জন্মদিন, বিবাহ অনুষ্ঠান–এসব পারস্যে আজ স্মৃতি।

এত কিছুর পরও একটা বিষয় ভাবলে অবাক লাগে যে, অতীতের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন বর্তমান সময়েও কী সুন্দরভাবে পালিত হচ্ছে। এখানে ধর্ম কত জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত তার প্রমাণ মেলে। সোভিয়েত যুগ ও শাসনামল আজ অতীত স্মৃতিমাত্র। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত শাসন চরম সংকটে ফেলেছিল। না ছিল মানুষের অধিকার, না ছিল স্বাধীনতা। নাচ-গান শুরু হয়। নীল শার্ট এবং ধূসর রঙের স্যুট পরিহিত যুবক এবং তার নববিবাহিত স্ত্রী–ঝড়ো বাতাসের মধ্যে নাচতে থাকে। এক পর্যায়ে তরুণ তার শার্ট খুলে ফেলে। প্রথম দৃষ্টিতে কিছুটা বেখাপ্পা লাগছিল। তবে এটা যেন ইউরোপের আধুনিকতার ছাপ, আর সবাই তাতে সায় দিল। তবে কোনো বয়স্ক মহিলা এবং তরুণী তাদের ওপরের অংশ খুলে ফেলেনি। বরং তারা অত্যন্ত পরিপাটি এবং সুশৃঙ্খলভাবেই ভদ্রোচিত পোশাক পরিধান করে নাচে অংশ নিয়েছিল। বহু তরুণীর মিলন ঘটেছিল। বহু রঙের পোশাকের সমারোহ চারদিকে। প্রত্যেকের মাথায় হেজাব ছিল। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের সমারোহ চারদিকে। সুন্দর শোভা ফুটে উঠল। আর এই ডিসেম্বরে সূর্যের তাপ বিকিরণ কম থাকায় নাচতে কারো সমস্যা হয়নি।

নাচিয়ে দলের প্রত্যেক স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সামনে ঢালু মতো ছোট্ট উপত্যকা তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে গাছ লাগানো হয়েছিল। নববিবাহিত বধূ কিছুটা হেঁটে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। তারপর এক পা অগ্রসর হয়ে লাল রেশমি বেল্ট খুলে ফেলল। তার নতুন স্বামী তাকে কোলে তুলে নিল। তরপর হালকা আলিঙ্গনে মিলিত হলো। তারা প্রত্যেকের কাছে তাদের বার্তা, ভালোবাসা, হৃদয়ের উষ্ণতার বার্তা পৌঁছে দিল।

গানের আয়োজন হচ্ছিল এবং নাচও হচ্ছিল। স্মৃতিসৌধের চারদিকে এই নয়নাভিরাম অনুষ্ঠানে চলছিল। অনেকেই পাহাড়ি ঢালু উপত্যকার ওপরে উঠে নাচ-গান করছিল। উপত্যকার এক পাশে আগুনের শিখা জ্বলছিল। বর-কনে, তরুণ-তরুণী, বয়স্করা সবাই তাদের মহামিলন আনন্দে উপভোগ করছিল। তরুণ-তরুণীরা আগুনের শিখার ওপর দিয়ে লাফালাফি করছিল।

রাতের অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিবাহ যাত্রীরা প্রজ্বলন শিখার সামনে সবাই বসে পড়ল। প্রত্যেক এ সময় মোহাম্মাদ (সা.) এবং মার্ক্সের দর্শন নিয়ে আলোচনা করছিল। ইতিহাসের এই আলোচনায় বর-কনে এবং

তরুণ-তরুণীরা মনোযোগ সহকারে শুনছিল। যাই হোক, আমরা এই সুন্দর অনুষ্ঠান শেষে গাড়িতে ফিরে এলাম এবং পরবর্তী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। একটি বিষয়ে আমি অবাক হলাম, ওই বিয়ে এবং নাচ-গানের অনুষ্ঠানে বলা যায়, সব ধরনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশ নববিবাহিত। স্মৃতি সমস্যা থেকে সোভিয়েত শাসনের কথা ভুলে যেতে চায়। এসব যেন সবার কাছে স্মৃতি। স্মৃতিসৌধের সামনে সবাই দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রত্যয় ঘোষণা করল। আমার ধারণা, সমস্যা জর্জরিত মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। কিন্তু আমি ধারণা করি, তাদের উত্তরসূরি এক শ কি দুই শ বছর পরও তারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এবং আগুনের সামনে দাঁড়াবে। নাচ-গান, আগুনের এই প্রজ্বলন অংশ খুবই প্রাচীন, এমনকি জরাথ্রুস্টেরও আগে এমনটি ভাবা হতো। সম্ভবত এমনও হতে পারে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে থেকে এই উপত্যকায় আগুন জ্বলছে। এই আগুনের শিখা কোনো বিপদ সৃষ্টি করেনি। জরাথ্রুস্ট-মুসার মতো যিনি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন আগুনের লেলিহান শিখার মতো করে–তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন আগুন হচ্ছে স্বর্গের প্রতীক। জরাথ্রুস্টের যুগেরও আগে আগুনকে পূজা করা হতো। অনেকেই এটাকে ঈশ্বরের প্রতিকৃত মনে করত।

তাম্রযুগে, সম্ভবত এই সময়েই জরাথ্রুস্ট পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং ধর্মপ্রচার করেন, এই সময়কালকে ধরে ঐশিবাহককে এবং ধর্মপ্রচারের যুগ বলা হয়। পৃথিবীতে এই সময় খ্যাতনামা ব্যক্তি যেমন হোমার এসেছেন, আরো বিখ্যাত, সম্মানিত, সাহসী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে।

কিন্তু এই সময় বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী, জাতি, উপজাতি-গোষ্ঠী যেমন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তেমনি আবার তারা চাষাবাদ, গৃহপালিত পশু পালন করেছে। দাসপ্রথা চালু রেখেছিল এবং একাধিক বিয়ে করত। এ সময় হিব্রুদের দ্বারা কানান বিজয় সূচিত হয়। আবার একই সময়ে রোমেলাস-রোমের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক বহু সেবাদাসী ধর্ষণের শিকার হয়। যাযাবর শ্রেণী তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে থাকে। তার পরও এই যাযাবর শ্রেণী প্রতিবেশীদের অবহেলা করতে পারত না। তাদের ছেড়ে একেবারে নিঃসঙ্গ থাকতে পারত না। আর এ জন্য নিজেদের বাঁচার সংগ্রামে প্রাচীন সময়ের আধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র যেমন কামান এবং তলোয়ার ব্যবহার করত।

মধ্য এশিয়ায় ধর্ম কতটা হৃদয়গ্রাহী, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। জরাথ্রুস্ট প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। তার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর তার প্রার্থনার পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করবেন ১০টি গাধা এবং একটি উট।

এ ধরনের সামান্য প্রার্থনা, বাস্তববাদিতা, এ সব কিছুই ছিল মানুষের নৈতিক অধিকারের মধ্যে। এটা তুলনা করা হতো খ্রিষ্টান নীতি-আদর্শের সঙ্গে অথবা স্বর্গীয় ইসলামের সঙ্গে। আমি (লেখক) নিজে যে বিষয়টি দেখলাম তা হচ্ছে নবীর মূল ভূমিতে ভয়াবহ দরিদ্রতা, যা বলার মতো নয়। তিনি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করলেন তার ঐশ্বরিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। কেউই এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, জরাথ্রুস্ট ছিলেন প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাসে সবচেয়ে বৈপ্লবিক বার্তাবাহক। এর একমাত্র কারণ তার আদর্শ, বাণী পরবর্তী শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী বন্ধুবান্ধব, এমনকি তার শত্রুরাও তার দর্শন ছড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তার অন্যান্য অসাধারণ বাণী সমাজ, জাতি, রাষ্ট্রে সর্বোপরি পৃথিবীতে অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছে। জরাথ্রুস্টের মৃত্যুর পর মুসা, যিশু, মোহাম্মাদ বহু বছর পর তাকে স্মরণ করেছেন, যদিও তার জীবন দর্শন সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না।

জরাথ্রুস্ট এমন এক জাতির সামনে হাজির হয়েছিলেন, যারা অগ্নি-উপাসক এবং মূর্তি পূজারক ছিল। তারা ছিল প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি, যারা আকাশ এবং পৃথিবীকে ঈশ্বর ভাবত, আসমান এবং জমিন, সূর্য এবং চাঁদকে দেবতা রূপে ভাবত। মিথরা এবং মাহ, যুদ্ধের দেবতা ইন্দ্র এবং দেবের প্রিয় ভূমি–এ সব কিছুই যেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাক-বৈজ্ঞানিক চিন্ত ধারার যুগে, বিশ্বব্যাপী এসব ধারণা ছড়িয়ে দেয়া হতো। ইতিহাসের পিতা খ্যাত হেরোডোটাস গ্রিকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তারা ঠিক তাদের সেই দেব-দেবীকে বিশ্বাস করত, যারা কিনা আচরণগতভাবে তাদের মতোই ছিল। এই একই ধ্যান-ধারণা পোষণ করত ইন্দো-ইউরোপীয় সব জাতি-গোষ্ঠী। কিন্তু জরাথ্রুস্ট কোনো মানুষকে হুমকি দেননি। কখনো বলেননি সর্বশক্তিমান শাস্তি প্রদান করবেন, বরং মানুষকে সত্যের পথে আসতে বলেছেন।' তিনি প্রচার করতেন, একটাই ঈশ্বর, তা হচ্ছে আহুরা মাজদা। একই সময়ে তিনি পৃথিবীতে শয়তানের শক্তির উৎস চিহ্নিত করেন, মিথ্যা (দ্রুজ)–হিসেবে চিহ্নিত হলো আনরা মানিয়া অথবা অ্যারিম্যান। ঈশ্বরের থেকে শয়তানের শক্তি বেশি নয় এবং এক সময় শয়তানের সব ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যাবে, এটাই প্রচার করলেন জরাথ্রুস্ট। তিনি মূর্তি পূজারকদের জানালেন, মূর্তির

কোনো ক্ষমতা নেই। শিক্ষা দিলেন, পৃথিবীতে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে হবে, অপশক্তি ধ্বংস করে দিতে হবে, লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে মানবতার বিজয় ঘটাতে হবে।

জরাথ্রুস্টের দর্শন এবং ঐতিহ্য অনুসারে এটাই যেন শুরু, একই সঙ্গে যেন সঠিক পথে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। নবী এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বাধীনতা রয়েছে। যে ভালো এবং মন্দ, সত্য-মিথ্যা, একেশ্বর এবং বহু মূর্তি পূজারক হতে পারে, পরবর্তী যা ভাবতে পারে তা হচ্ছে আশা, যেটা সঠিক হতে পারে। তাদের মুক্তির পথ তারাই ঠিক করবে, এমনকি মূর্তি পূজারকরাও নিজেদের দর্শন নতুন করে চিন্তা করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, শুধু ধর্মপ্রচারক এবং ঐতিহ্যবাহী শাসকবর্গ, তারাই শুধু এসব কল্পনা করতে পারে। তারা অমরশীল আত্মা নিয়ে ভাবে-স্বর্গ যেন সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত, নরকের সাজা দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত-এই ছিল পৌত্তলিকতাবাদীদের দর্শন।

বৌদ্ধ দর্শনের মতোই জীব হত্যা মহাপাপ, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনীয় এবং বৈদিক যুগে ধর্মপ্রচারকগণ সাধু-সন্ন্যাসী, সাধকদের দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করত। তাই হিন্দু সংস্কৃতিতে, মাধক তৈরির গাছ-গাছালি এবং লতাপাতার কথা উল্লেখ রয়েছে (সম্ভবত গাঁজা, আদিম যেগুলোকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেবন করত)। জরাথ্রুস্ট কোনো প্রকার অগ্নির উপাসনা করতেন না। তার মৌলিক দর্শন এবং চিন্তা ছিল মধ্যমপন্থি পথ অবলম্বন করা, উগ্রবাদিতা নয়, প্রচণ্ড আত্মত্যাগী তিনি নন। জরাথ্রুস্ট তার অনুসারীদের উৎসাহ জোগাতেন, তারা যেন এক ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করে।

পারস্যের রাজকুমার এবং রাজার সামরিক যোদ্ধারা ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করেই, জরাথ্রুস্টের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ দাঁড় করান। সে সময় জরাথ্রুস্ট ৩০ বছরের পূর্ণাঙ্গ একজন ধর্মপ্রাণ মানব রূপে পরিণত হয়েছেন, একই সঙ্গে তার জাতি-গোষ্ঠীর কাছে হুমকিস্বরূপ? অথবা এমনও হতে পারে, যিনি চিন্তা করেছেন তার দেশের মানুষ তাকে খুব কমই চিনতে এবং বুঝতে পারল। তিনি নিজের মতো করে ধর্ম প্রচার করেছেন, মহান সাইতামা জাতি-গোষ্ঠীর মানব তিনি। তবে জরাথ্রুস্ট কোনো জাতি-গোষ্ঠী মানতেন না। এতেই তার বিপদ হলো। তার জানা উচিত ছিল, প্রচলিত ধর্মের স্রোত এবং বিশ্বাস তার মতের বিরুদ্ধে যাবে। তিনি ছিলেন একেশ্বরের বিশ্বাসী। তাই প্রচলিত মূর্তি পূজারকের পক্ষে যেতে পারেন না।

আর এটাই বা তিনি কেমন করে বিশ্বাসী হলেন যে, তার কথা মানুষ শুনবে, মানবে এবং স্বর্গের সন্ধান পাবে? ক্ষমতাশালী এবং শীর্ষ ধর্মপ্রচারক কারাপানসের দ্বারা তিনি নিগৃহীত হন, তাকে তার সম্প্রদায় থেকে বের করে দেয়া হয়, পরিবার এবং জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তার, জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি সর্বপ্রথম, সম্ভবত সর্বশেষ নবী, যিনি তার নিজ দেশেই নিগৃহীত হন।

কোন ভূমিতে আমি যাব, কোথায় যাওয়া উচিত? ক্ষমতাবান এবং আমার রাজ্যের শীর্ষ ক্ষমতাবান ব্যক্তির দ্বারা আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, মানুষ আমাকে ভালোবাসেনি, মিথ্যাবাদীদের শাসক হওয়া উচিত নয়।

জরাথ্রুস্ট ইরানের উত্তর-পূর্ব রাজ্যের রাজা গুস্তাপের কাছে এসে আশ্রয় নিলেন। সেটি ইরানের উত্তর-পূর্ব রাজ্য, সম্ভবত যাকে প্রাচীন বলখ নগরী হিসেবে আমরা জানি ও চিনি। বর্তমানে এটি আফগানিস্তানের অংশ। এখানে তাকে সবাই সাদরে গ্রহণ করল। সাধুবাদ দিল। প্রথমে তিনি বলখ রাজ্যের রানির মন জয় করলেন, তারপর রাজা, এভাবে রাজন্যবর্গসহ সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিলেন জরাথ্রুস্ট। এ সবই সম্ভব হয়েছে ধর্মীয় সংস্কারের চিন্তা দর্শন এবং সত্যাদর্শের কারণে। রাজা গুস্তাপের মন্ত্রিপরিষদ, রাজন্যবর্গ, এমনকি আদালত তাকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। তিনি ধর্ম শিক্ষা দিতে শুরু করেন। ধর্মপ্রচারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার বাণী সব লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে আভেস্তা, জরথ্রুস্টের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আভেস্তা ধর্মগ্রন্থে রাজার নাম এবং তার নীতি ও আদর্শের কথাও লেখা রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে রাজা গুস্তাপ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান, বিয়ে করেছেন তিনটি, শেষ বিয়ে করেন তার প্রধানমন্ত্রীর কন্যাকে। গুস্তাপের ছয়টি সন্তান ছিল। শেষ সন্তান গাথাস। তিনি তার সবচেয়ে ছোট কন্যাকে পুরচিস্তাকে (পূর্ণ জ্ঞানী) বিয়ে দেন জামাস্প (ঘোড়ার মতো তেজি) সঙ্গে। তিনি ছিলেন বলখ রাজ্যের মন্ত্রী। জরাথ্রুস্টীয়বাদীদের মতে, তাদের নবী বহু বছর বেঁচে ছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল ৭৭ বছর বয়সে। সাতাত্তর–সন্দেহজনক এবং জাদুকরী সংখ্যা–তাকে অলৌকিক বার্তার মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, তার মৃত্যু হবে কারাপান ধর্মপ্রচারকের হাতে। এই ধর্মপ্রচারক তাকে পেছন থেকে ছুরিকাহত করেছিল।

তিন হাজার বছর পার হয়ে গেছে, ইরানের মরুভূমি নগরী ইয়াজদে গুস্তাপের রাজপ্রাসাদ এবং কয়েদখানা সবই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নগরী আধুনিক রূপ

নিয়েছে, আকাশছোঁয়া দালান তৈরি হয়েছে। এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে গরমের বাতাস ক্ষীণ ছোঁয়া লাগে আর ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জরাথ্রুস্টীয় আগুনের মন্দির ইট-পাথরে কোনো মতে ঢেকে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর আকর্ষণ কমেনি এবং দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসে। ইরানের বর্ষপঞ্জিকা মতে নোরুজ বছরের প্রথম মাস। এ সময় ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন আগুনের মন্দিরে ভ্রমণে আসে। তারা পুরো বাগান ঘুরে বেড়ায় এবং পাহাড়ে ওঠে। বিশাল আকৃতির ফারাওহার (ঈশ্বরের মাথার চিহ্ন প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত) প্রতিকৃতি পাহাড়ের পাদদেশে মন্দিরের দরজার সামনে রক্ষিত রয়েছে। পর্যটকরা সেই দরজা ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ করে। হলের ভেতরে প্রবেশ করেই পর্যটকরা দেখতে পায় বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন পবিত্র অগ্নি-প্রজ্বলন শিখা, যা চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা রয়েছে। পর্যটক এবং প্রত্যক্ষদর্শীয় মতে, আগুনের শিখা জ্বলছে ৪৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, যদিও এই অগ্নিশিখা (এর হাতল এবং ব্লেড, যে কেউ স্মরণ করে বলতে পারে বহুবার স্থানান্তরিত করা হয়েছে)–এক স্থানে কখনোই ছিল না। জরাথ্রুস্ট মন্দিরের বয়স্ক নিরাপত্তারক্ষী আগত পর্যটকদের এই অগ্নিশিখা সম্পর্কে তার জানা তথ্য বর্ণনা করছিলেন ফার্সি ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় এবং একই সময়ে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যারা অর্থ সাহায্য করছিল সেই টাকা তিনি সুন্দরমতো বাক্সে রেখে দিচ্ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তার বাক্সে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা জমেছে। যদিও এই অর্থের কিছু পরিমাণ ইরানীয় রিয়াল, অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের ডলার। আতরা মাজদার সেরা ধর্মকে এখনো সমর্থন করছে মানুষ, এটিই ধারণা করা যায়।

জরাথ্রুস্টের মন্দিরে এবং অগ্নিশিখার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বহু পর্যটককে নানা রকম প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। যাই হোক, সর্বশেষ নিরাপত্তারক্ষীকে প্রশ্ন করলাম, তিনি আমাকে যে উত্তর দিলেন, তা জরাথ্রুস্টের পবিত্র গ্রন্থ আভেস্তাতে লেখা রয়েছে। সেখান থেকে প্রথম ২০ লাইন পাঠ করে শোনালেন আমাকে, যাতে জরাথ্রুস্ট ধর্ম এবং পবিত্র অগ্নিশিখা চমৎকারভাবে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। জরাথ্রুস্টবাদীরা নোরুজ দিয়ে কী অর্থ বোঝাতে চায়, তা জানারও কোনো সুযোগ থাকল না বা ছিল না। আমি এবং আমার ইরানি সতীর্থ সিদ্ধান্ত নিলাম, অন্য কারো কাছ থেকে জেনে নেয়াই হবে উত্তম কাজ।

কয়েক বছর আগে ইয়াজদি নগরীতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হলো। মরুময় এ নগরীতে ঘূর্ণিঝড় মানেই বালুর শহরে পরিণত হয়। নগরীর চারদিকে এই

বালুময় পরিণত হওয়ায় নগরবাসীর প্রচণ্ড কষ্ট হয়, এমনকি জরাথ্রুস্টের গ্রামাঞ্চলেও ঘূর্ণিঝড় হলো। এর পরও তার মন্দির এবং অগ্নিশিখা সংরক্ষিত ছিল। এই অগ্নিশিখা সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। চারপাশের যে দালানকোঠা প্রাচীন নয়; কিন্তু গ্রামাঞ্চল এলাকা জুড়ে বালুময় ঘূর্ণিঝড়ে সম্ভবত ধ্বংস হয়। এটা উনিশ শতকের ঘটনাপঞ্জি। কিন্তু রাজপ্রাসাদ একেবারে অবিচল, স্থিরভাবে এবং দৃঢ়ভাবে যেন দাঁড়িয়ে ছিল। এ যেন বরফের এক খণ্ড বিশাল টুকরা—একেবারে যেন পম্পাই নগরীর মতো। ওই নগরী ডুবে গেলেও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি।

যাই হোক, আমরা পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেয়ালের সামনে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দিল নিরাপত্তাকর্মী। বিশাল দুটি কক্ষ। আমাদের সঙ্গে এসে পৌঁছাল ইরানের স্থানীয় দুই ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে ছিল তিনজন মহিলা এবং দুজন তরুণী। মহিলাদের পোশাক ছিল খুবই পরিমার্জিত। তাদের রূপে যেন আলো বিকিরণ দিচ্ছিল। তারা বিশাল আকৃতির বোরকা পরিধান করেছিল। তাদের নখ পর্যন্ত ঢাকা ছিল। এদের দেখলেই বোঝা যায়, এসব মহিলা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। তাদের পাশে আরো অনেক মহিলা এসেছিল মন্দিরে। তারা সাধারণ ঘরের এবং সাধারণ চাদর পরিধান করেছিল। সবাই ঘুরে-ফিরে জরাথ্রুস্টের মন্দির এবং অগ্নিশিখা প্রদর্শন করছিল।

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন চৌকস বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তার মেয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি তার মেয়ে এবং স্ত্রীকে জরাথ্রুস্ট সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিলেন। অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে, বিশেষ করে ইরানিরা যেভাবে প্রবাদ পাঠ করে। তারা এমনভাবে প্রবাদ পাঠ করে, তা দেখলে মনে হবে শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। প্রতিটি শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করে, যেন মনে হয় হঠাৎ কোনো শব্দ বা বাগধারা অথবা অপ্রত্যাশিত ধীর গতিতে... সঠিক... নিচু স্বরে তার শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে। আমার মনে হলো তিনি একজন স্কুলশিক্ষক—একমাত্র তারা এবং টেলিভিশনে আবহাওয়ার বার্তাবাহক একসঙ্গে কথা বলছিল। তাদের বক্তব্য এককেন্দ্রিক আর তা হচ্ছে জরাথ্রুস্ট দর্শন। যাই হোক, আমরা একে-অপরকে মিষ্টি এবং চকলেট বিতরণ করলাম এবং আমি সেই শিক্ষককে জরাথ্রুস্টবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করলাম এবং একই সঙ্গে জরাথ্রুস্টীয় প্রতিবাদে অর্থপাপ, যা সিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সাতটি 'S' চিহ্ন

দিয়ে টেবিল নির্মাণ করা হয়েছে। এই ঘরের গোপন ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম।

ওই শিক্ষক বললেন, 'এর কোনো সঠিক অর্থ নেই।' বাস্তবিক অর্থ তিনিও জানেন না। অর্ধপাপের চিহ্ন দিয়ে যে টেবিল নির্দেশ করা হয়েছে, তা দিয়ে মূলত মানুষের, লৌহ মানবতার কথা বলা হয়েছে, যা ধর্মীয় প্রতীকের থেকেও কঠোর বোঝানো হয়। ইরানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নোরুজ (ইরানের বর্ষ শুরু মাস) পালিত হতো এমনভাবে যে, মানুষ পূর্ববর্তী বছরে যে পাপ করেছে তা থেকে যেন মুক্তি পায়। এ জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত। আর এ জন্যই বছর শুরু হতো সাতটি কর্ম দিয়ে—সঙ্গে থাকত 'Sh'. বছরের শুরুতে যে সাতটি জিনিস নিয়ে তাদের চলার পথ নির্ধারণ করত, তা হচ্ছে শরাব (মদ)—রাখা হতো আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য, শীর (দুধ)—পুষ্টির জন্য, শরবত (শেরবত)—প্রফুল্ল হৃদয়ের জন্য, শ্যামমীর (তলোয়ার)—নিরাপত্তার জন্য, শামমাদ (বাক্স)—সম্পদ রক্ষার জন্য, শ্যাম (মোমবাতি)—অন্ধকার দূর করার জন্য, শাধানেহ (গাঁজার বীষ)—নিজেকে উজ্জীবিত করতে। এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়, পৃথিবীতে আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

গাঁজা এবং আফিম আনন্দদানের জন্য—এ কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা, চেতনা, দর্শন অতীত ইতিহাসের দিকে চলে গেল। ইতিহাসের পিতা হেরোডোটাস স্কাইথিয়ানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বর্ণনা করেছিলেন হেমলক বিষের কথা, গাঁজা, আফিমের কথা। সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাযাবর শ্রেণী হেমলকের চারা আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং গাছের নিচে বসে সেই আগুনে সিগারেট পান করছিল।

স্কুলের শিক্ষক আমাকে তার অভিব্যক্তি জানিয়ে বললেন, 'এই সাতটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে হলে আপনাকে সম্ভবত ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান নিতে হবে?' তার এ কথা শুনে আমি যখন মাথা নাড়িয়ে দ্বিমত প্রকাশ করলাম তাতে তিনি কিছুটা হতাশ হলেন। তিনি আমাকে বললেন, "বেশ, আপনি যদি আপনার কাছ থেকে শুনতে চান তাহলে বলি, আপনাকে যেটা জানতে হবে 'Sh' এবং 'S' উচ্চারণ প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, 'Sh' খুব নরমভাবে, উষ্ণভাবে এবং 'S' শক্ত, দৃঢ় ঠাণ্ডাভাবে উচ্চারিত হয়—এখানেই মৌলিক পার্থক্য।"

যাই হোক, আমরা সবাই পরিত্যক্ত সেই গ্রামে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় স্টিমের ট্রেন হিশহিশ শব্দে এগিয়ে আসছিল।

স্কুলশিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি?

আমরা সবাই একমত পোষণ করলাম, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

তাহলে এ কথা বলাই যায়, ইরানে যেদিন থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলো সেদিন থেকেই এ দেশের মানুষ তাদের ধর্ম দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে একজোট হয়ে কাজ করেছে। টেবিলে যে সাতটি দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ টেবিলে উপস্থাপিত দর্শনগুলো ইসলামের কোনো আইন ভঙ্গ করেনি। পবিত্র কোরআন শরিফেও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকার পাপবোধ টেবিল, যা সাতটি 'Sh' এবং বর্তমানে সাতটি 'S' দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে, প্রতিবছর জরাথ্রুস্টবাদ কতটা অম্লমধুর, তিক্ত, কঠিন এবং ঠাণ্ডাভাবে আলোচিত হয় তাই বোঝা যায়। কিন্তু যেসব মুসলমান ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেনি, তারা এগুলো জানতে পারবে না।

কিন্তু এই সাতটি 'S' দ্বারা কী প্রতীক বোঝানো হয়েছে এবং কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আমরা তা জানতে চাই?

স্কুলশিক্ষক বললেন, কোনো অর্থেই এই সাতটি 'S' ব্যবহার করা হয়নি, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাননি?

এ কথা শোনার পর বুঝতে পারলাম, তিনি সামান্য স্কুলশিক্ষক, এটা শুধু শুরু হয়েছে 'S' দিয়ে।

স্কুলশিক্ষক আমাদের প্রতি সব আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। তিনি দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লেনঅ সিনেমার নায়কের মতো পোজ নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তারপর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে তিনি অগ্নি মন্দিরের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। তার স্ত্রী নিবিষ্টচিত্তে তার কথা শুনছিলেন আর তার কন্যা কিছুটা অস্থিরতা বোধ করছিল।

ইরানে জরাথ্রুস্টের শিক্ষা, যা আড়াই হাজার বছরের পুরনো, তা আজও অক্ষত রয়েছে, এ বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে। আর সাতটি বিষয়, যা শুরু হয়েছে 'S' দিয়ে, তা কি শুধুই অর্থহীন? অর্ধবৃত্তাকার পাপবোধ চিহ্ন টেবিলটি সম্পর্কে যে ধারণা করা যায়, তাতে বোঝা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ এবং আত্মিক সম্পর্কের কথা অথবা স্রষ্টার ভালো-মন্দ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে বিস্তৃতভাবে, এমনকি ইয়াজদির অগ্নি মন্দিরে আগত পর্যটকদের সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, তাদের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়–যা

কোনো তীর্থযাত্রী এসব চিন্তা করে না, তারা তাদের বিশ্বাস নিয়েই এখানে আসে।

'ধর্ম প্রাণবন্ত, ধর্ম মৌলিকত্ব–এটা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসে। ধর্ম কোনো চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়,–স্কুলশিক্ষক তারা একটি শ্রেণীকক্ষে বর্ণনা করলেন।

'আপনি বা কেউই এটা প্রত্যাশা করতে পারেন না যে, হাজার বছর ধরে একই দর্শন ও সূত্রে জীবন অতিবাহিত হবে।' আবার এটাও সত্য যে, বিপ্লবের গতিধারার মতোই ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য এবং দৃষ্টি এমনও আছে, একজভাবে ধর্ম বাজেভাবে বা নোংরাভাবে প্রচার হচ্ছে, চূড়ান্তভাবে তাদের শ্রম ব্যর্থ হয়, প্রতিটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা ধর্মের উৎসদাতা অবাক হতেন, যদি তারা আজ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেন। পরবর্তী শত বছরে তাদের ধর্মীয় আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। মুসা–যার কথা ও দর্শন ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, যার বর্ণনা প্রকৃত অর্থেই বিশদ বর্ণনা রয়েছে–নিশ্চিতভাবেই ইহুদিদের সেবা দিয়েছে, আর এ সবই জরাথ্রুস্টের চিন্তার বাইরে ছিল, যে তার মৃত্যুর আড়াই হাজার বছর পরও এভাবে আলোচিত হবে। তার দর্শন, ধর্ম প্রচার ঈশ্বরকে পেতে একনিষ্ঠ হওয়া–সব কিছুই সবাইকে বিস্মিত করে। আমি একটা বিষয়ে কোনো মতেই একমত পোষণ করতে পারি না যে, যিশুখ্রিষ্টের ক্যাথলিক ধর্মবাদের পক্ষে, কুমারী এবং সন্ন্যাসীর দর্শন সম্পর্কে, এমনকি খ্রিষ্টীয় দর্শনতত্ত্ব এবং যারা মূর্তি পূজারক, এদের প্রত্যেকে এক সূত্রে গাঁথা। এমনকি ইসলাম যেভাবে অলৌকিক গতিতে উত্থান ঘটেছে, যদিও এই মহান ধর্মের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মাদ (সা.) তার যুগেও এতটা ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেনি, যা পরবর্তী শতবর্ষে ঘটেছে, ইসলামের এত প্রসারিত হলো বটে কিন্তু এই ধর্মের প্রথম সংঘাত হয়েছিল পারস্য অঞ্চলে শিয়া এবং সুন্নির মধ্যে। মোহাম্মাদ (সা.) শিয়া, সুন্নির কষ্টের কথা বলেছিলেন–এটা অবশ্য পবিত্র কোরআন শরিফে কোথাও উল্লেখ নেই। তার মৃত্যুর পরই বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় হলো, যার ফলে আজও মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নির লড়াই চলে। সংঘাতময় হয়ে ওঠে। রক্তপাত হয়।

জরাথ্রুস্টের বার্তা একদম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তার পক্ষের এবং প্রতিপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, জরাথ্রুস্ট একেশ্বরবাদের পূজারক ছিলেন, জীবনকে সুখী করতে চেয়েছিলেন, শয়তানের বিপক্ষে যুদ্ধ জয় করে জিততে ভালোবাসতেন, এ সবই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা আছে।

এটা এমনই যে, অনন্ত এক মহাসাগরে এক খণ্ড হীরার টুকরা পড়ে গেল এবং সেটা সংগ্রহ করতে শত শত বছর ধরে মানুষ তার সত্য দর্শন খুঁজে ফিরছে কিন্তু তারা এটা কখনোই বুঝতে পারেনি বা খোঁজেনি হৃদয়েই ঈশ্বরের বাস। ঈশ্বরকে পেতে হলে নিজের আত্মাকে পরিশোধিত করতে হয়। এসব ঘটনা বহু বছর আগে ঘটেছে। কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না জরাথ্রুস্ট দর্শনে কী ছিল? কবে, কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? অধিকাংশ দার্শনিক বিশ্বাস করেন, পারস্যের নবী জরাথ্রুস্টের মৃত্যুর পর প্রধান শত্রু কারাপান, উপজাতি-গোষ্ঠীর প্রধান তিনি নিজেও জরাথ্রুস্টবাদ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তার দর্শন প্রচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। যারা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত এবং অপশক্তির কাছে নিজেকে উৎসর্গ করত, তাদেরকে মুক্তি দিতে তার অনুসারীদের মাধ্যমে চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন বার্তাবাহক। তিনি স্বর্গীয় পথ জয় করেন।

প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী আর্য সম্প্রদায়, যারা অগ্নি উপাসক, তারাও জরাথ্রুস্টের স্তবক এবং দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক গবেষণা করেছে। এটা এখন পরিষ্কার, জরাথ্রুস্ট ধর্ম যখন কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে তখনই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

জরাথ্রুস্ট কর্তৃক হামা (গাঁজা) বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, জরাথ্রুস্টবাদীরা তার ধর্ম প্রার্থনার পূর্বে নিষিদ্ধ ওষুধ সেবন করে।

আকামেনীয় এবং হেলেনিস্টিয় সময়কালে–মেডেস এবং পারস্য সাম্রাজ্য শুরু থেকে আলেকজান্ডারের পৃথিবী বিজয় পর্যন্ত এবং এর পরেও–জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসীরা তার অগ্নিশিখা সঠিকভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছিল। যার ওপর এই দায়িত্ব পড়েছিল তিনি যেন ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। এই প্রেরিত দূতের কাছে সবাই তাদের আর্জি পেশ করত। মেডেস জাতি-গোষ্ঠীরা এবং ধর্মপ্রচারকগণ, যারা চেষ্টা করেছিল ইরানের বহুদিনের প্রাচীন বিশ্বাসের সংস্কার করতে তারা পর্যন্ত জরাথ্রুস্ট দর্শনে বিশ্বাসী হয়। একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় না, কেউ ঠিকমতো জানে না, পারস্যের নবীর কথা তারা কীভাবে জেনেছিল, এমনকি তার সম্পর্কে তারা কী জানত তা পরিষ্কার নয়। এত সমস্যার পরও পারস্যের রাজারা জরাথ্রুস্টের ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা নিজেদের আর্কাইভে এবং লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করে রাখতেন। তাদের অর্জন এবং জরাথ্রুস্টের পাথরের দেয়ালে অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখতেন প্রাচীন

পারস্যের রাজাগণ। এতে জরাথুস্টের দর্শনের চিন্তা-চেতনা এবং একেশ্বরবাদীর কথাই উল্লেখ থাকত। প্রথমেই সেই পাথরের দেয়ালে আমরা দেখতে পেলাম আহুরা মাজদার প্রশংসা। এভাবে একের পর এক অন্যান্য ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই পাথরের দেয়াল সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হতো এবং সর্বশেষ দ্বিতীয় আরতাবোরেক্সের মূর্তি প্রদর্শিত হতো। যিনি মন্দির এবং প্রতিকৃতির দর্শনের নিয়ম-কানুন ভেঙে দিয়েছিলেন, মিথরা এবং আনাহিতা শুধু এ দুটি নাম পরিচিত ছিল। দেবদূতগণদের কেউই সহসা দেখতে পেত না, তারা জাদুর মতো কাজ করতেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর সি. জেহনার 'দি ডন এ্যান্ড টুলাইট অব জরাথুস্টইজম' বইটা জরাথুস্টীয় ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। সেখানে তিনি বর্ণনা করেন, 'মহাবীর আলেক্সান্ডারের বিশ্ব জয়ের পর ধর্মীয় বিশ্বাসের সুদিন যেন ফুরিয়ে গেল। পরবর্তী তেরো শ বছর শুধু অজ্ঞতা আর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পারস্যবাসীরা নিজেদের মতো করে চলতে থাকে। তারা আলেক্সান্ডারের পথ অনুসরণ করেনি। নবম শতাব্দীর তথ্য প্রাপ্ত অনুযায়ী তারা ধর্মের কাজ করত, যা দিনকট (ধর্মের কানুন) নামে প্রচারিত হতো।

দারে–যিনি দারের সন্তান (তৃতীয় দারিউস), তার রাজ্যের শীর্ষ ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন জরাথুস্ট ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা এবং জান্দ (ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার) দুই কপি অবশ্যই লিখিত হতে হবে, এমনকি জরাস্টার নিজেও এই নির্দেশ পেয়েছিলেন আর মাজদ (আহুরা মাজদার কাছ থেকে)। এই দুই কপির একটি থাকবে রাজকীয় রক্ষণাগারে আর একটি থাকবে জাতীয় আর্কাইভে। ভালকা (ভালাগায়) এবং আরসাশীয় (পার্থিয়ান) নির্দেশ দিলেন এই ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং বর্ণনা বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যাতে প্রাদেশিক সরকার তা সংরক্ষণ করে। এতে জরাথুস্টের ধর্মগ্রন্থ যেন প্রতিটি প্রদেশেই পাওয়া যায়। সে যাই হোক, আভেস্তা এবং জান্দ যেন সাধারণ মানুষের কাছে আবার ফিরে এলো। এর থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারল, যদিও এই ধর্মগ্রন্থের দর্শন নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। অন্যদিকে মহামতি আলেক্সান্ডার যিনি মেসিডোনিয়া করায়ত্ত করেন, তখন মেসিডোনিয়া ইরানের অন্তর্গত ছিল, তিনিও জরাথুস্ট ধর্মগ্রন্থের সব কপি লুট করেন।

রাজা আরদাশির, পাপাকের পুত্র, রাজাদের রাজা, (সাসনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) তার উত্তরসূরি তানসার তার নিজস্ব চিন্তা ও দর্শন থেকে এই নির্দেশ দিলেন, জরাথ্রুস্ট ধর্মগ্রন্থ আদালতে হাজির করতে হবে। তানসার তার কাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে ফেলেন। তিনি এই ধর্মগ্রন্থের একটি পাঠ অধ্যায় রেখে বাকি সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন এবং তিনি একটি অধ্যাদেশ জারি করেন–'মাজদার মূর্তি পূজারকদের ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করাই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ; এখন থেকে এ ব্যাপারে জ্ঞানের স্বল্পতা ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে।'

এটা ছিল সত্যিকার অর্থে সাসনীয় সময়কালে জরাথ্রুস্টের ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে সুস্থ এবং সুন্দর দিক। জরাথ্রুস্টের ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা এবং বর্ণনা জান্দ হারিয়ে গিয়েছিল। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যক্ত করেছিল। অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল, তার অবসান ঘটল। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন পার্সি এবং সংস্কৃত ভাষা ও শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পেরেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ, দ্বন্দ্ব এবং সংশয় থেকেই গেছে। যদিও সাসনীয় ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীর মধ্যে সংশয় পুরোপুরি যায়নি, তারা আহুরা মাজদাকে সেরা ধর্ম মনে করত। নৈতিকভাবে প্রাচীন এই ধর্মতত্ত্বে তারা বিশ্বাসী ছিল–রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ধর্ম স্বীকৃত ছিল, কিন্তু এর নিয়ম-কানুন, আইনে ব্যাপক জটিলতা ছিল। বিষয়টা এমনই ছিল, যা ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। ইহুদিদের দর্শনও ছিল জটিল। বহু দার্শনিক ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের মতে, জরাথ্রুস্টের মৌলিক দর্শনবাদ মূলত এসেছে ইহুদিদের তালমুদ আইন থেকে। যেভাবেই এই পবিত্র গ্রন্থ রচিত হোক না কেন–এতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়; তা হচ্ছে সাসনীয় ধর্মপ্রচারক সম্ভবত ইহুদি দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ধর্মের ক্ষেত্র অবমুক্ত করণে। সাসনীয় সাম্রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রীয়ভাবে জরাথ্রুস্ট ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেইসঙ্গে রাজ্য সরকার প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে সমর্পণ করেছিল, এবং এ ধরনের মূল্যায়ন সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জরাথ্রুস্টীয়বাদীদের হতাশ বা দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। যেন আবার বিশ্বে ইসলামের বিজয় হলো। এটা এমন নয় যে, এক রাতে ঘটেছে। বহু শতাব্দী পার হয়েছে, ধর্মে এবং একেশ্বরে বিশ্বাসী বহু মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিশ্বাসীরা ছিল সংখ্যালঘু। তারা নির্যাতনের শিকার হতো। মধ্য

এশিয়ার বহু গল্প আমি শুনেছি, বিশেষ করে আরব বিশ্বের ইমামগণ অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন, 'মসজিদে আসো'। তিনি শুক্রবারে বিশেষ খুতবা পাঠ করতেন। দামাস্কাস থেকে যেসব অতিথি আসতেন তাদের ধর্মের সুন্দর বাণী শোনাতেন। তারপর আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদেও কোরআনের বাণী প্রচার করা হতো। নিশ্চিত করা হতো কোরআনের বার্তা এবং নির্দেশনা, যা ছিল বিজয়ের পথ।

আরব বিশ্বে যখন ইসলাম প্রচার হতে থাকে, ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে তখন জরাথ্রুস্টীয়রা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। এর ফলে মুসলিম শাসন তাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এরই সূত্র ধরে অষ্টম এবং দশম শতাব্দীতে জরাথ্রুস্টীয়রা পারস্য উপসাগর দিয়ে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে তারপর তারা ভারতে চলে যায়। সেখানে তারা গুজরাটে আশ্রয় নেয় এবং চাষাবাদ ও বাণিজ্যের কাজে নিয়োজিত হয়। গুজরাটীয়রা তাদের পার্সি (পার্সি) বলে ডাকত। ভারতীয় অভিবাসিত পার্সীয় এবং ইরানের অন্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এক পর্যায়ে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং জরাথ্রুস্টবাদ আদর্শে বিশ্বাসী দুটি শাখাই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে একে অপরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বাস্তবিক অর্থে, যত বিচ্ছিন্নতাই ঘটুক না কেন পুনরায় যখন উভয়পক্ষ মিলিত হতে থাকে। এটা ১৪০০ সালের শেষ প্রান্তের সময়। তখন তাদের বিশ্বাস, ধর্ম, এমনকি দুই সম্প্রদায়ের বর্ষ পঞ্জিকা নতুন করে পুনর্মুদ্রিত হলো। এটা নতুন করে ভারতীয় পার্সির ঐতিহ্যবাহী, সংস্কারক দুই পক্ষের মধ্যে সংস্কার হলো, যেটা অ্যানেক ডি পোরেন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় অভিবাসী পার্সীয়দের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুজরাটে ব্রিটিশ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করল তখন পণ্য কিনত পার্সীয়দের কাছ থেকে তারা স্থানীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি দিল। এই স্থানীয়রা না ছিল মোগল সম্প্রদায়ের মুসলিম, না ছিল ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তারা পার্সি সম্প্রদায়ের খোঁজ পেল, যারা ইউরোপীয়দের প্রভাব এবং বাণিজ্যের দুয়ার খুলে দিল। ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি বোম্বের (বর্তমানে মুম্বাই) দখলে নিল, ভারতীয় পার্সীয়রা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ার সুবর্ণ সুযোগ পেল। মুম্বাই নগরী অষ্টাদশ এবং উনিশ শতাব্দীতে দ্রুত গতিতে উন্নতি হতে থাকে। এর জন্য জরাথ্রুস্টের অনুসারীরা কঠোর পরিশ্রম এবং আদর্শ ভূমিকা পালন

করেছে। এই জরাথ্রুস্ট আদর্শবাদীরা ভারতের বহু শিল্প-কলকারখানার প্রতিষ্ঠাতা। বস্ত্র, ওষুধ শিল্প, লৌহ কারখানা, রেলওয়ে এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে তারা জড়িত।

ভারতীয় পার্সিরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব বজায় রেখেছিল। পার্সীয় এক অধিবাসী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা তৈরি করেন। এটা ১৭৭৮ সালে। অন্য আরেকজন ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা (১৮২২ সালে) প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পার্সীয় অধিবাসী শিল্পকলা, শিক্ষা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখেন। ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন একজন পার্সীয়। তার নেতৃত্বে ভারত (১৮৯৬) সালে ইংল্যান্ড সফর করে। সেইসঙ্গে আরো পুরো দলটিকে জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসী বলা যায়। বাস্তবিক অর্থে আগুরা মাজদার দর্শনে বিশ্বাসী তারা। এই আগুরা মাজদার দয়ায় দলের প্রত্যেকের মধ্যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। ভারতীয় এক লেখক এ বিষয়ে বলেন যে, ক্রিকেট ভারতীয় খেলা, দুর্ঘটনাবশত ব্রিটিশরা এই খেলার জনক হয়েছে। খেলাধুলার প্রতি গভীর আগ্রহের ফলে পার্সীয়রা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে বেরিয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছে তারা ইহুদিদের মতো বিশ্বব্যাপী ছুটতে পেয়েছে। শুধু খেলার জগত নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও প্রসার ঘটিয়েছে। পার্সীয়রা দুই শ বছর ধরে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রমে বিশ্বের সর্বত্র ছুটে বেড়ায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাদের একমাত্র আরাধনা। সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখত পার্সিয়ানরা। যেখানেই তারা গিয়েছে, সেখানেই নিজেদের উপস্থাপন করেছে, নিজেদের জ্ঞান, মেধা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে ভারতীয় পার্সিও ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। অন্য আর এক ভারতীয় উপাধি লাভ করেন। ভারতে জন্মগ্রহণকারী তিন পার্সি প্রথম ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবে আরো অনেক বর্ণনা দেয়া যাবে। অতি সম্প্রতি ভারতে জরাথ্রুস্টরা আরো সাফল্যের শিখরে উঠে গেছে, বিশেষ করে শিল্পকলা, নাটক, টেলিভিশন ব্যবস্থাপনা এবং গানে। কে ভুলতে পারে জুবিন মেহতা অথবা ফ্রেডি মার্কারির কথা। যিনি গানের জগতে বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন।

ইরানের প্রসঙ্গে আসা যাক, এই দেশে জরাথ্রুস্ট আদর্শবাদীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। জরাথ্রুস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, চিন্তা-চেতনার প্রভাব পড়েছে ইসলামি চিন্তা-চেতনার প্রতি, যার ফলে এই ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী

হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মানুষ। এক সময় পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইরান, ইরাক, মধ্য এশিয়া, মস্কোর অংশবিশেষ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ। এসব দেশ এখন যে বিভিন্ন স্তর পার করছে, এদের সবাই ইরানি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইরানের শিক্ষা-সংস্কৃতি তুরস্ক হয়ে এসব দেশে এতটা প্রসার ঘটেছে, ইরানের জাতীয় পরিচয় ইসলামিক উম্মাহ, মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে খ্যাত। তারা শিয়া গোত্র। এই পরিচয়ের ফলে ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। মহানবী মোহাম্মদ (স.)-এর পরলোক গমনের পর এই সংঘাতের শুরু। সঠিকভাবে বলা চলে, আরব বিরোধের ফলে–শিয়া সম্প্রদায় ইরানের জাতীয় ধর্মে রূপ নিল।

আশুরা

ইরানে দুটি পবিত্র ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে নোরুজ একটি। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বর্ষ শুরু হয়। অন্য পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান আশুরা। ইসলামের ষষ্ঠ পঞ্জিকা অনুসারে ১০ মহররম মহানবী হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রিয় নাতি হুসেইন কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। কারবালা বর্তমানে ইরাকের অংশ। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে হুসেইন পরলোক গমন করেন। নোরুজ অর্থাৎ বর্ষ শুরুর দিন ইরানি জনতা আনন্দে মেতে ওঠে, হেসে-খেলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সময় কাটায়। দারুণভাবে উৎসব উপভোগ করে। বিপরীতে আশুরা হচ্ছে গভীর শোকাহত এবং ধর্মীয় পবিত্র দিন। বহু মানুষ শোকযাত্রায় অংশ নেয়। তারা হুসেইনের তাজিয়া বানিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। তরুণরা নিজেদের পিঠ চেইনের আঘাতে রক্তাক্ত করে। এ সময় দোকানদাররা বাহারি পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসে। শোকযাত্রায় আগত ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করে। গ্রামাঞ্চলে, শোকাহত এই দিনে হুসেইনের তাজিয়া (কল্পিত মৃতদেহের কবর) বানিয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করা হয়। এর মাধ্যমে হুসেইনের শেষ করুণ পরিণতির কথাই যেন পুনরুজ্জীবিত করা হয়। হুসেইন যুদ্ধ প্রান্তরে শহীদ হন। প্রতিপক্ষের চার হাজার সৈন্যবাহিনীর সামনে যেন একাই বীরের মতো লড়াই করে প্রাণ দেন।

পবিত্র আশুরা ইরানে খুবই জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। তা দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। শিয়া ধর্মাবলম্বীরা এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার মতো পালন করে। প্রাচীন এই ধর্মীয় শোকযাত্রা

দেখে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইরানের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ নিজ গ্রামের খেলার মাঠে হাজির হতো। মাইলের পর মাইল জুড়ে এ দৃশ্য দেখা যেত। মানুষজন মাঠের চারপাশে বসত। মাঠে এ সময় মহররমের অনুষ্ঠান হতো। তরুণ-তরুণীরা নানা রকম আয়োজন করত। এর মধ্যে হাসান-হুসেইনের তাজিয়া বানাত। মানুষজন ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং মহিলারা অনুষ্ঠান দেখতে আসত অত্যন্ত পর্দানশীল হয়ে। মহিলারা কালো চাদর পরে, পুরো শরীর আবৃত করে রাখত। তাদের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। পুরুষরা শুক্রবার মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য যে পোশাক পরে, আশুরার দিন সেই পোশাক পরে। সেইসঙ্গে জ্যাকেট এবং ট্রাউজার পরিধান করে। শুধু ইমাম সাহেব মহররমের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেন। কয়েকজন আবার কাঁধে বন্দুক রাখে। বহু মানুষ রয়েছে, যারা ইরান-ইরাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে অর্থাৎ বীরযোদ্ধারা পর্যন্ত এই শোকগাথা অনুষ্ঠানে আসে। তারা সেসব দিনের কথা স্মরণ করে। বহু বিবাহিত মহিলা অথবা সন্তানের মা হুসেইনের জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয় এবং সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে। কোনো হৈহুল্লোড় নেই। নেই কোনো বাজে গল্প। প্রত্যেকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি ছোট্ট শিশুরা পর্যন্ত শান্ত হয়ে বসে থাকে। দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে নীরবে শুয়ে থাকে। সে বড় বড় চোখ করে চারদিকে তাকায়। তবে কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না।

এই বিশাল মাঠে আশুরার দিন কী হয়েছিল সেসব ঘটনা তুলে ধরা হয়। বীর সেনানায়ক সাদা ঘোড়ায় করে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করে। তার পরনেও সাদা পোশাক, মাথা সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে এবং শত্রুর মতো সেও তলোয়ার হাতে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত। সে তার নিজের মতো করেই ভাষণ দিল। তলোয়ার চারদিকে ঘোরাল এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য আকাশের দিকে তাকাল, যেন মনে হলো স্বর্গের দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক একইভাবে শান্ত হৃদয়ে মাটিতে তাকাল। এই হচ্ছে হুসেইন, যার মধ্যে সব মহান এবং ভালো গুণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ইরানের শিয়া সম্প্রদায় এভাবে একজন তরুণকে হুসেইন বানিয়ে কল্পিত যুদ্ধের রূপ দেয়।

ময়দানে আরো সৈন্যসামন্ত হাজির হয়। তারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে আসে এবং পরনে রং-বেরঙের পোশাক। তারা কল্পিত যুদ্ধে অংশ নেয়। ব্যাপক চিৎকার, হইগোল এবং তলোয়ারের ঝনঝনানি শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে চলে তীর নিক্ষেপ। কারবালার কল্পিত ময়দান সাজিয়ে সে মাঠে

গ্রামাঞ্চলের যারা যুদ্ধের নাটকে অংশ নেয়, সেসব অভিনেতা একটা ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে, তা হচ্ছে তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রতে কেউ যেন কোনো প্রকার আহত না হয়। কোনো প্রকার শারীরিক ক্ষতি না হয় কারো। মাঠের চারপাশে উপস্থিত দর্শক, যারা প্রকৃতপক্ষেই ঝুঁকির মধ্যে থাকে, কখন ঘোড়ার গাড়ির চাকা তাদের গায়ে এসে লাগে কি না কে জানে। এ জন্য তাদেরও সতর্ক থাকতে হয়। যুদ্ধ শুরু হয়। দুই পক্ষের এক একজন করে বীরযোদ্ধা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। প্রথম বীরযোদ্ধা শহীদ হয়। প্রথম বীরযোদ্ধা আলী আকবরের ভূমিকায় অভিনয় করে। আলী আকবর ছিলেন হুসেইনের সন্তান। তার পরনে সাদা এবং সবুজ রঙের আলখেল্লা, পরিধানকৃত কাপড়ে লাল রং মেশানো হয়েছে, যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে, শত্রুরা তার সারা শরীরে তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত করেছে। তার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে এবং তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মাটিতে পড়ল সে। প্রথমে মাটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে সে মাটিতে পড়ল। সেখানে কোনো পাথর রয়েছে কি না, সে রকম ঘটনা যেন না ঘটে, তারপর মাটিতে পড়েই সে তার শেষ কথা জানায়। এ কাজটি করে মাথাটি ধূসর মাটিতে রাখার ঠিক আগ মুহূর্তে তার চোখ বন্ধ করে মৃত্যুবরণ করে। এই দৃশ্য দেখার পর মাঠের চারপাশে উপস্থিত দর্শকরা কাঁদতে থাকে।

কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনী এবং মুসলমানদের আত্মত্যাগের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। কারবালার কাহিনী নিয়ে ইরান সম্প্রদায় যেভাবে নাটক করে এবং সারা দেশে তা উপস্থাপন করে, সেটা তিন ঘণ্টা ধরে প্রদর্শিত হলো, যতক্ষণ না হুসেইনের সব সদস্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আনুষ্ঠানিকভাবে এই দৃশ্যের শেষ ঘটে তখনই।

যদিও তিন ঘণ্টার এই নাটক দেখতে বিরক্তি লাগে। কারণ অধিকাংশের অভিনয় খুবই দুর্বল এবং নিষ্প্রাণের। তবে আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, তা হচ্ছে, সবার মধ্যে অসাধারণ কিছু করে দেখানোর অভিপ্রায় ছিল। কারবালার নাটক দেখে উপস্থিত দর্শক, পুরুষ ও মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, এ কান্নায় কোনো অভিনয় নেই, দর্শকরা মাথা নিচু করে কাঁদছিল। তাদের চোখের পানি কাঁধ স্পর্শ করছিল। মাঠের চারপাশে নিরাপত্তা বাহিনী, যারা কাঁধে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও চোখের পানি না ফেলে পারল না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে কাঁদছে আর রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

এ ঘটনার সঙ্গে একটি বিষয়ের মিল পেলাম, তা হচ্ছে, ডায়ানার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ কেঁদেছিল। যেন তারা তাদের হৃদয়ের রানিকে হারাল। আমি দেখতে পেলাম, এক কান্না একেবারে হৃদয় থেকে উদ্বেলিত হয়েছে, নিখাদ সত্য, হীনম্মন্যতা ও লজ্জার কোনো কারণ নেই। এ চোখের পানি, এ যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে।

এই আবেগ-অনুভূতি মানুষের মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। তেরো শ বছরের পুরনো স্মৃতি এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই, তা ধর্মীয়ভাবে এতটা প্রভাবিত করতে পারে, তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু এটাই সত্য। তবে মানুষের মধ্যে হাল আমলে হাসান-হুসেইনের হৃদয়বিদারক মৃত্যুর ঘটনা অনেকটা মিলিয়ে গেছে। তারা এসব ব্যাপারে এতটা অনুভব করে না। এর কারণ, মানুষ এসব ঘটনার অনেক কিছুই জানে না। মানুষের মন ও হৃদয় তখনই ভেঙে যায় যখন তারা নিজেদের জীবনের কিছু হারায় এবং তারা কোনো কারণে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কারবালা নাটক শেষ হওয়ার পর তরুণ এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ হলো। গ্রাম্য এই পুলিশের চাহনিতে রাগ, ক্রোধ সবই ফুটে উঠেছিল। প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করলেন। যখন নাটক শেষ হলো তখন এবং দর্শকরা একে একে চলে যেতে থাকে। শিশুরা যেন মুক্তি পেল। তারাও তাদের মায়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

অনেকটা নাটক বা ছবির স্টাইলে পরিবেশিত হয়। হঠাৎ করেই বিশাল কালোদেহী একটা দৈত্য প্রবেশ করে। কার্ডবোর্ডে চিত্রায়িত কালো রং দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা। তার হাতে থাকে তলোয়ার। তার ঘোড়া দ্রুতগতিতে চালাতে থাকে।

অশ্বারোহী সুরেলা কণ্ঠে ভাষণ দিতে থাকে। তার এই কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন আক্রোশ আছে। সে যেন কাকে খুঁজছে। ছেঁড়া একটু কাগজ তার হাতে। প্রতিটি শব্দ যে চয়ন করছে। আসলে সে শয়তানের প্রতীক। সে হচ্ছে উমাইয়া, যে মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্রের হত্যাকারী।

কারবালার কাহিনীতে শুধু ইমাম হুসেইনের হত্যার বিষয়টি জড়িত, তা ভাবা ঠিক নয়। পুলিশ কর্মকর্তা আরো বলেন, 'আমাদের কাছে ইমাম হুসেইন (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) একজন অসাধারণ গুণাবলি এবং মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এটা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। এটা সর্বজন সত্য, তিনি ইসলামের সর্বকালের সেরা নবী মোহাম্মাদ (স.) (তার ওপর শান্তি

এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক)-এর প্রিয় নাতি। আরো আছে, যেমন হজরত আলী (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), যিনি মহানবীর চাচাতো ভাই এবং একই সঙ্গে জামাতা এবং মহানবীর প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.) (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। ইসলাম ধর্মে এ রকম যারা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানব রয়েছেন, তাদের কারো মৃত্যু ইমাম হুসেইনের মতো হওয়া উচিত নয়, হয়নি এবং সেটা কেউই প্রত্যাশা করেনি। প্রকৃত অর্থে এ যুদ্ধ হচ্ছে ভালো এবং মন্দের। সত্য ও মিথ্যার লড়াই। কারবালার ঘটনার সঙ্গে আরো অনেক বিষয় জড়িত। প্রকৃত অর্থে এ কাহিনী হচ্ছে ভালো এবং মন্দের লড়াই, সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ। এ লড়াই কখনো শেষ হবে না। আর এ কারণে প্রতিবছর কারবালার নাটক পুনঃ প্রচার করা হয়। এটা এমনই এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধে প্রতিটি আদর্শবান মুসলমানের নীতিগতভাবে অংশ নেয়া উচিত। ইমাম হুসেইন যেমন সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়েছেন তেমনিভাবে আজকের মুসলমানদের সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

প্রায় পনেরো শ বছর আগের এই যুদ্ধের কাহিনী শুনে বা কল্পিত চিত্রায়িত কাহিনী দেখে ইরানের জনগণ শুধু হুসেইনের জন্য কাঁদে, তা নয়, তারা কাঁদে ওই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল বলে। কিন্তু... হঠাৎ করে পুলিশ অফিসার সর্তক হলনে, নাটকের ইমাম হুসেইনের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এসেই সে বলল, এই যুদ্ধ একদিন শেষ হবে এবং সত্য জয়ী হবে। আমি এর জন্য প্রার্থনা করি। হতে পারে আমার জীবনে তা দেখে যাব অথবা আমার সন্তানের জীবনেও হতে পারে।

ইরানে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ইতিহাস থেকেও জরাথুস্টীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা, সে বিষয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে অতীত ইতিহাস শুনতে চাচ্ছিলাম। বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিজ্ঞ দার্শনিক ও চিন্তাবিদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছি। একটা পর্যায়ে এসে লক্ষ্য করলাম, জরাথুস্টের নীতিবোধ এবং দর্শন ইরানীয় ইসলাম সমাজে পর্যবসিত হয়। তার দর্শনের সঙ্গে ইসলামি দর্শন ও চিন্তা অনেকটা মিলে যায় বৈকি। আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদের মতে, ইমাম হুসেইনের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড শুধু ইসলামিক আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেইসঙ্গে ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ অনেক নৈতিক শিক্ষা নিতে পেরেছে। সর্বোপরি গ্রাম সেই পুলিশ অফিসার এই উপলব্ধি করেন, কারবালার মর্মান্তিক পরিণতি হচ্ছে মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর লড়াই।

মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, এটাই ছিল নৈতিকতা। কিন্তু এই ধর্মের দুটি ধারা বিদ্যমান। মহররম যেন শিয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং রীতিনীতিতে পরিণত হয়েছে। কারবালার মর্মান্তিক পরিণতি এবং এর জন্য দুঃখ, হতাশা প্রকাশ করা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে রূপ নিয়েছে। কিন্তু সুন্নি মতাবলম্বীরা শিয়াদের মতো করে পালন করে না, শোকযাত্রায় বিশ্বাস করে না। ইরানিদের চিন্তা-চেতনা, কল্পনায়, দর্শনে খলিফা হজরত আলী, যাকে পারস্যের নবী জরাথুস্ট্রের প্রতিচ্ছবি ভাবা হতো, তার চিন্তা-চেতনা মিলে যায় পারস্যের নবীর দর্শনের সঙ্গে। শিয়া সম্প্রদায়র বহু জ্ঞানী-গুণী চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন, হজরত আলী এবং তার উত্তরসূরি শিয়া ইমাম, শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা, ইসলামের এ দুই মহান ব্যক্তি ঈশ্বরের পানে ধাবিত হতে মনুষ্য সমাজকে আলোকিত করেছেন, তারাই সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং একমাত্র তারাই পবিত্র কোরআন শরিফের গোপন বিষয়গুলো অনুধাবন করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আলী, ইসলামিক চিন্তা দর্শনের যে প্রভাব এবং নিষেধাজ্ঞা, তা অনেকটাই অবমুক্ত করেছেন। তিনি পবিত্র ইসলামের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন আশীর্বাদস্বরূপ। তিনি যে দর্শন প্রচার করতেন তা সর্বত্র প্রচারিত হতো এবং 'অখ্যাত ইমাম', যিনি আলীর দ্বাদশ উত্তরসূরি হিসেবে খ্যাত, তিনিও ৮৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও যেন বীররূপে আবির্ভূত হলেন। তারা সারা পৃথিবীর মানুষকে দর্শন দিয়েছেন—এমন এক দিন আসবে, জরাথুস্ট্রীয় বার্তাবাহক, মুসলিম সত্তেশিয়ান্ত মানুষকে এই দর্শনের কথা জানাবে।

ইরানের শিয়া সম্প্রদায় নিজেদেরকে আদর্শ মুসলমান হিসেবে মনে করে এবং তারা ভয়ে থাকে, কখন সুন্নি সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে এবং তাদের ধ্বংসের চেষ্টা করে। এটা যেন এমনই ব্যাপার, জরাথুস্ট্রীয় দর্শনের গোপন কথা বা মৌলিকত্ববাদ তারা অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে কিন্তু এটাও সত্য জরাথুস্ট্রীয় মৌলিকত্ব তারা যেন বিস্মৃত হয়ে গেছে, তাদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা জরাথুস্ট্রীয় মোবেদ-ই মোবেদান, ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সেরাদের সেরা, তিনি আদর্শ ধরে রেখেছেন, তা প্রচারে এবং প্রসারে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, শিয়াদের দর্শন এবং নিজস্ব ধ্যান-ধারণা যেমন দিনকে দিন দিন ধূসর হয়ে উঠছে এবং এ ধরনের নাটক যেন শেষ হয়ে আসছে ঠিক তেমনি জরাথুস্ট দর্শনও ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এটাই ছিল জরাথুস্ট্রীয়বাদের চূড়ান্ত অবস্থা।

দশম শতাব্দীতে বাহারাইনের শিয়া গোষ্ঠী জরাথ্রুস্টের ১৫০০ বছরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে। তারা শুধু মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করে থেমে থাকেনি, সেইসঙ্গে মক্কায় হজযাত্রীদের পথ আটকে দিয়েছিল এবং কাবা শরিফের পবিত্র কালো পাথর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর অবরুদ্ধ হজযাত্রীদের পথ মুক্ত করে দেয়। এ ঘটনা ইসলামিক বিশ্বে দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে এক তরুণ, যে কিনা পার্সীয় সাসনীয় রাজার উত্তরসূরি, নিজেকে মুসলিম সমাজের বার্তাবাহক অথবা মাহদি, পার্সীয় ইসলামিক যুগের সর্বশেষ প্রচারক হিসেবে ঘোষণা দেয়। সে ইসলামিক আইন-কানুন সব কিছু ধ্বংস করে দেয় এবং নির্দেশ দেয় জরাথ্রুস্টের দর্শন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যেন পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয়।

অটোম্যান সম্প্রাজ্যের ইতিহাসবিদ কুতুব-উদ-দীনের মতে, সেই পার্সীয় তরুণ ঈশ্বরের নির্দেশেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তার করুণ মৃত্যু হয়েছে। এমনকি তার লাশ শিয়াল-কুকুরে ভক্ষণ করেছে। তাকে খুন করার ৮০ দিন আগে সে এ ঘটনা ঘটায়। ২০ বছর পর পবিত্র কালো পাথর আবার পূর্বের স্থানে ফিরে আসে–ভাঙ্গা অবস্থায় মক্কায়। সেই তখন থেকে জরাথ্রুস্টীয় অনুসারীরা মুসলিমদের দর্শনে বিশ্বাসীদের সঙ্গে কাজ করে। কোনো শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব নেই কারো মধ্যে।

ভালো কথা, ভালো চিন্তা, ভালো চুক্তি

ইয়াজদের সন্নিকটে, যা শহর থেকে বেশি দূরে নয়, যেখানে পুরো গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সড়ক থেকে বেশ উঁচুতে, হাজার ফুট উঁচু হবে, যেখানে হেঁটেই উঠতে হয়, সেখানেই জরাথ্রুস্টের সমাধিস্থল। আজও দর্শনার্থীরা তার কবর দেখার জন্য ভিড় করে।

পাহাড়ের ওপর মনোরম সুন্দর স্থানে পারস্যের এবং মধ্য এশিয়ার প্রথম নবীর কবর। তার কবরের পাশে দুটি গাছ লাগানো আছে–একটি হচ্ছে সত্যের জন্য, সাফল্যের জন্য এবং অন্যটি দুঃখের জন্য–প্রচণ্ড ধূসর বালির মধ্যে গাছ দুটি দাঁড়িয়ে আছে, যা মানুষকে বিস্মিত করে তোলে। জরাথ্রুস্টের সমাধিস্থলের চারপাশে এত দালানকোঠা উঠছে যে, এক সময় এই কবর খুঁজে পেতেই কষ্ট হবে। শাহের বোন রাজকন্যা আশরাফ নির্দেশ দিয়েছিলেন সমাধিস্থল পুনর্নির্মাণের। সেই সমাধিস্থল সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে।

আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্ছে, ২০ শতকে পাহলেভি সাম্রাজ্যের বহু ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন হারিয়ে গেছে এবং নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধর্মীয় আদর্শবাদীরা স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, সেই অবস্থার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্যই অনুরোধ করা।

আমার এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন শাহের বোন। তারই নির্দেশে জরাথ্রুস্টের মন্দির এবং প্রজ্বালিত অগ্নিশিখা পুনর্নির্মাণের কাজ অনেকটা অগ্রসর হলো। তাৎক্ষণিকভাবে সবার দৃষ্টি বিশেষ, করে জরাথ্রুস্টীয়বাদীদের আকর্ষণ করত এই মন্দির। তরুণ-তরুণী, বয়স্ক মহিলারা দূর থেকে এ মন্দিরের দিকে তাকাত। মন্দিরের চারপাশে বাগান তৈরি করা হয়েছিল এবং পাখ-পাখালির সমারোহ ছিল। শান্তিময় পরিবেশ বজায় থাকত। আর এই মন্দিরের দর্শনার্থী হিসেবে সব ধর্মের মানুষের আনাগোনা ছিল। তারা আসত উৎসব পালন করতে। তবে মহিলারা কালো চাদর পরে আসার যে রীতি ছিল এবং নিজেকে পরিশীলিতরূপে আসত, সেই আইন বাদ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ এলে তারা মন্দির থেকে সরে যেত বা গাছের পাশে লুকিয়ে থাকত। নতুন নিয়ম করা হলো, মহিলারা তাদের পছন্দসই পোশাক পরিধান করে আসতে পারবে। সেটা অবশ্যই রুচিশীল হতে হবে।

এসব জানতে আমি পারলাম আমার ইরান ভ্রমণের বন্ধুর কাছ থেকে। যখন আমরা পুনরায় জরথ্রুস্ট মন্দিরে ভ্রমণে গিয়েছি তখনই আমার বন্ধু পরামর্শ দিল যে, আমাদের কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে–কারণ আগে জানতে হবে মন্দিরের অভ্যন্তরে কোনো মহিলা আছে কি না। তাদের প্রার্থনা বা ভ্রমণের পরই আমরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারব। এ কথাটা বলতে আমার ইরানি বন্ধু লজ্জা পাচ্ছিল, সেইসঙ্গে বিদেশি মহিলাদের উপস্থিতি নিয়ে চিন্তায় ছিল। আমার নিজের কাছেও মনে হলো মন্দিরের প্রবেশের আগে গাছতলায় অপেক্ষা করাই ভালো। ভেতরে যারা প্রার্থনারত অবস্থায় রয়েছে, তাদের বিরক্ত না করাই সঠিক মনে হলো।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা অপেক্ষা করছিলাম মন্দিরের পাশের বাগানে। এ সময় বিশাল এলাকাজুড়ে হকার, খুচরা বিক্রেতা তাদের পণ্য সাজিয়ে বসে ছিল। তাদের কাছে থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য রুটি, শীর, ইরানীয় পনির, পানীয় কোক কোলা। তারা এই পানীয়ের নিজস্ব নাম দিয়েছে–'জরাথ্রুস্টীয় কোলা'। এই পানীয় কিনলাম। মন্দিরের ভেতর ছন্দময়ী সুর ও গান বাজছিল। প্রচলিত গানের সুর ও ছন্দ থেকে এই গান এবং ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি

মসজিদ থেকে যে সুর ভেসে আসে তার থেকেও একটা ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের কাছে অত্যন্ত পরম মর্যাদার এবং উষ্ণভাবে যেন হৃদয়ে ঠাঁই করে নিল। এরই মাঝে মন্দিরের ধর্মপ্রচারকের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, আবার প্রার্থনাকারীদের জোরালো কণ্ঠে প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছিলাম।

মন্দিরে প্রবেশপথে এবং বাগানের পরিসর, যৌক্তিক কারণেই বজায় রাখা হয়েছে তা। জরাথুস্ট দর্শনে বিশ্বাসী গাথাসা নিজেই সৃষ্ট, সুন্দরভাবে এই পরিকল্পনা তৈরি করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছেন। যাই হোক, দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর মন্দিরের প্রবেশের অনুমতি পেলাম। এবার আমি জানতে পারলাম জরাথুস্ট দর্শনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা, যা তিন হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষকে জানিয়েছিলেন পারস্যের এই প্রথম নবী, যা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় বিপ্লব বলা চলে।

তার কথা এমনভাবে সত্য, যা মানুষের জন্য অবশ্যই অপরিহার্য। যাকে প্রকৃত অর্থেই বলা যায় প্রথম নবী। জরাথুস্ট যে বাণী প্রচার করে গেছেন, তিন হাজার বছর পর আজও তা সত্য। তাই তাকে বিশ্বের প্রথম নবীও বলা যায়।

প্রাচীন মিসরীয়রা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল এবং তার প্রশংসা করত। তাদের মতে জরথুস্টের ধর্মগ্রন্থ থেকেও তাদের বিশ্বাস প্রাচীন। তারা ফারাওকে ঈশ্বর ভাবত। কিন্তু ফারাওদের ধর্মীয় দর্শন আধুনিক বিশ্বে অচল হয়ে পড়ে, বাতিল হয়ে যায় এ দর্শন। মুসা-ইহুদিদের নবী এবং তাদের দ্বারাই নিগৃহীত-তিনিও পারস্যবাসীর কাছে তুলনামূলকভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন। তার নাম, দর্শন প্রত্যন্ত অঞ্চলে-তার আদর্শের অনুসারী, ইহুদিরা এবং একইভাবে খ্রিষ্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায় তাকে স্মরণ করে। মুসার ধর্মগ্রন্থের প্রথম পাঁচ খণ্ডে প্রাচীন ইতিহাস, আইন-কানুন এবং স্বর্গের পথের কথা বলা হয়েছে-প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসীরা বলে তার কথা, বাণী, ঈশ্বর থেকেই এসেছে। মুসার কথা এবং বাণী তার অনুসারীরা সংগ্রহ করেছে এবং লিখে রাখত মতে (কারো কারো) এগুলো নতুনভাবে লিখিত হয়েছে এবং আবিকৃত হয়েছে। মুসার পরলোক গমনের কয়েক হাজার বছর পর তার ধর্মীয় দর্শন, চিন্তা-চেতনা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

যেভাবেই হোক, হিব্রু ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের নির্দেশেই এসেছে এবং তার আইন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অন্যদিকে প্রথমদিকে বাইবেল গ্রন্থ ইহুদিদের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, যেমনভাবে জরাথুস্টের শিক্ষা,

দর্শন, যেখানে নৈতিকতাবোধ এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার কোনোটিই মানুষ সহজে মেনে নেয়নি।

জরাথ্রুস্টীয় ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, দর্শন এবং তার ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা, যা পরবর্তীতে হিন্দুদের গ্রন্থ 'বেদে' উল্লেখ করা হয়েছে, একই সঙ্গে জরাথ্রুস্টীয়বাদীরা প্রাচীন গাথাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছে। বেদ ধর্মগ্রন্থে জরাথ্রুস্ট মতবাদে এ সময় পৃথিবীতে যে নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন হয়েছে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বহু ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। তাদের তুলনা করা হয়েছে সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের সঙ্গে। এ কথা বলা যায় যে, তাদের সব ব্যর্থতা স্বল্প পরিসরের কারণেই এটা হয়েছে। জরাথ্রুস্টের ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক তত্ত্বীয় দর্শন অধিকাংশ ভারতীয় আর্যের বিশ্বাস, তাদের ধর্মের সঙ্গে মিল রয়েছে, যদি না তাদের আত্মপরিচয় ঠিকমতো প্রচারিত হতো তাহলে জরাথ্রুস্ট দর্শনেই তাদের চলতে হতো। যদিও উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো দায়বদ্ধতা, প্রতিশ্রুতি ছিল না। দুই ধর্ম ও সম্প্রদায় তাদের মতো করে নিজেদের ধর্মকে প্রসারিত করতে, মহান করে তুলতে অক্লান্ত শ্রম দিয়েছে তাদের ধর্মীয় গুরুরা। দুই ধর্ম-গোষ্ঠী পূর্ণাঙ্গরূপে সমঝোতায় উপনীত হলো, তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন মনোনিবেশ করল। তারা প্রচার করল, পৃথিবী এবং ঈশ্বর আমাদের পাশে।

পেছনের সারিতে বসে ধর্মপ্রচারকের কথা শুনছিলাম। আমার এসব বিষয় তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না যে, কে গ্রামাঞ্চলে বাস করে চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, কার দর্শন অন্যদের থেকে পার্থক্য, কোন ধর্মপ্রচারক চিন্তা করেছে পৃথিবীর দর্শনতত্ত্বের পরিবর্তন ঘটবে, যারা কখনোই বুঝতে চায়নি মানুষের মানবিক দর্শনের কথা তাদের নিয়ে ভাবতে আসিনি। বরং জরাথ্রুস্টের দর্শন সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। মানুষের নৈতিকতাবোধই জাগ্রত করেছে।

জরাথ্রুস্টের বক্তব্য, 'ভালো কথা, ভালো চিন্তা এবং ভালো চুক্তি'—এই দর্শন ও ধারণা তার সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ হয়েছে।

বর্তমান সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হয়। কিন্তু জরাথ্রুস্টের ধর্ম, দর্শন নিজস্ব গতিতে চলছে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, জরাথ্রুস্টের বার্তা প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। আমার ইরান-ভ্রমণের বিভিন্ন সময়ের কাহিনী যদি পুনরায় আলোচনা করি তাহলে একের পর এক যে বিষয় চলে আসবে তা হচ্ছে, প্রাপ্ত বয়সে প্রথম নবী তার নিজ মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হলেন এবং আবার এই দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছে

ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিম একই সঙ্গে অন্য ধর্মের বিশ্বাসীগণ, যেমন বৌদ্ধবাদীরা তার দর্শন বিশ্বাস করেছে। এটা ঠিক, পরোক্ষভাবে তার ধর্মীয় দর্শন সবাই মেনে নিয়েছে, পৃথিবীতে জরাথ্রুস্টের আগমন, বার্তা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন সবই সফল হয়েছে, পরিষ্কারভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে সব 'কেন' এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন-'কেন ঈশ্বরের ভালো কাজে শয়তান বাধার সৃষ্টি করে? এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে, সে শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে। ঈশ্বর যদি সর্বোত্তম না হতেন তাহলে তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতেন না।' আমুরের গ্রন্থ থেকে জানা যায় : 'যেই নগরীতে শয়তান থাকবে, তার অপকর্ম চলবে, সেখানে সর্বশক্তিমান প্রভুর কৃপা পাওয়া যাবে কি?' প্রতিটি বিশ্বাস এবং আদর্শের সমাধান হয়েছে নিজস্ব গতিতে। ইহুদিরা নিজেদের সম্পর্কে বলত, মুসাকে না মানা এবং তার নির্দেশ মতো না চলা এটা শুধু তাদের নিজের ব্যর্থতা এবং সব পাপ তাদের। খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নীতিগতভাবে বিশ্বাস করে, সব আদম সন্তান পাপী। মুসলমানরা পাপ থেকে মুক্তির জন্য নতুন জ্ঞানের প্রত্যাশা করে। কিন্তু এসব পথের কোনোটাই জরাথ্রুস্ট দর্শনের বিকল্প হতে পারে না।

জরাথ্রুস্ট গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন, শয়তান স্বাধীনভাবে মানুষকে প্ররোচিত করতে পারছে। এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে, তার শক্তির শেষ নেই যেন। এ বক্তব্য আজও সত্য, তিন হাজার বছর পর বর্তমান সময়ে আমরা যদি সকলে দৈনিক পত্রিকা খুলে দেখি তাহলে দেখতে পাব, আজও জরাথ্রুস্টের দর্শন ও চিন্তার সঙ্গে অপূর্ব মিলে যায়। শয়তানের যে বিশাল ক্ষমতা, তার দ্বারাই মানুষ প্ররোচিত হচ্ছে-রাজনীতিবিদ, লেখক, চিন্তাবিদ সবাই এটা উপলব্ধি করে অপরাধ জগতের ক্ষমতা কতটা প্রবল এবং এসব শয়তানের দ্বারাই প্ররোচিত। তাহলে বিশ শতকে পৃথিবীতে যে সংঘাত, হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় হানাহানি তাতে কি এটাই প্রমাণ করে না যে, জরাথ্রুস্ট দর্শন ও ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি? আমি আবারও দার্শনিক নেশজের চিন্তা-চেতনার কথাই স্মরণ করলাম। তিনি বলেছিলেন, জরাথ্রুস্টের দর্শন হচ্ছে, নৈতিকতার স্রষ্টা' এবং তিনি হচ্ছেন মানব ইতিহাসে সেরা দার্শনিক, তিনিই পেরেছেন মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে। এ কাজটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন দার্শনিক নেশজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমর-নায়ক জার্মানির এডলফ হিটলার এবং রুশ নেতা স্ট্যালিন সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ

হত্যা করেছেন, হয়েছেন নন্দিত এবং নিন্দিত। তাদের সম্পর্কে শুধু এ কথাই বলা যায়, লোভ-লালসা, ক্ষমতার আধিপত্য এবং খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী সাতটি মহাপাপ এ সব কিছুই শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত বিষয়। যদি নেশজে জানতেন পৃথিবীতে মানুষ কী ভাবছে এবং কখনো জরাথ্রুস্টের দর্শন 'আবিষ্কার' করতে পারতেন, আমার সন্দেহ তিনি নতুন করে দর্শন নিয়ে ভাবতেন।

সারা বিশ্বে যে পরিমাণ হত্যা, খুন এবং অপরাধ কর্ম হচ্ছে তা তুলে ধরা নিশ্চয়ই প্রচারমাধ্যমের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা পারস্যের নবীর পক্ষেও তার সময়ে তা রোধ করা সম্ভব ছিল না। তবে তিনি বলতেন যে, এই পৃথিবী সময়মতোই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা বিষয় আমার খুবই অবাক লাগত, যখন জরাথ্রুস্টের হাসির ছবিটি চোখে ভেসে উঠত, তিনি ছিলেন সকল সত্য ও ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক। তার মতবাদের ভিত্তিতে সময় শেষ হয়ে যাবে, এটা উপলব্ধি করতে পারি, সত্যি একদিন সময় শেষ হবে। আমরা কঠিন একটি সময় পার করছি। আমাদের কাছে আর কোনো বার্তাবাহক আসবে না। এ কথা সত্য, অধিকাংশ মানুষ পারস্যের নবীর বাণী গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি, এমনকি প্ল্যাকার্ডে মাঝেমধ্যে লেখা থাকে 'পৃথিবী ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছেছে'। এ কথা কতটা বিশ্বাস করে মানুষ, নতুন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ধর্মীয় গুরু, পরিবেশবাদী, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ তা ভাবার বিষয়। কিন্তু জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজ নিয়মিত ডকুমেন্টারি প্রচার করে, তারা নিয়মিত আলোচনায় অংশ নেয় বিশ্ব ধ্বংস হবে–যেমন আমরা জানি এটা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এ রকম ছিল, যখন বার্তাবাহক প্রত্যাশিত সময় আসবে।

এ কথা সত্য, পৃথিবীতে আর কোনো বার্তাবাহক বা স্বর্গীয় দেবদূত আসবেন না। জরাথ্রুস্টবাদ দর্শন আমাদের কাছে 'ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয়' তুলে ধরেছে, এমনকি তালমাদ এক মত পোষণ করে জানিয়েছে, 'দেবতাদের নাম' ব্যাবিলন থেকেই এসেছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দেবতাদের সম্পর্কে ধারণা এসেছে পারস্যের উত্তরসূরি ইহুদিদের কাছ থেকে। ইহুদিরা অত্যন্ত সফলভাবে তাদের চিন্তা-চেতনা সন্নিবেশিত করেছে। তারপর তাদের বিশ্বাস, নীতি ও আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আর কোনো নবী, রাসুল, বার্তাবাহককে আমরা দেখতে পাই না, তারা আর আসবেন না। শত সহস্রের মধ্যেও কোনো পারলৌকিক বার্তাবাহকের সন্ধান মেলে না। হাজার কবির মধ্যেও, যেমন কবি উইলিয়াম ব্লেক একক সত্তায় বিশ্বাসী। যিনি

প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের সন্ধান করেন। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেন না কখন কোনভাবে, কোন সময় ঈশ্বরের সন্ধান পাবেন। উদ্যমতা, উৎস, শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করেছে UFO কর্তৃপক্ষ–কোথাও কোনো পারলৌকিক দর্শনের সন্ধান মেলে কি না। অবস্থাটা এমন যে, শব্দগুলো রোমান এবং আকামেনীয় সাম্রাজ্যের সময় পারলৌকিক দর্শন ও মতবাদে প্রচারক এবং বার্তাবাহকদের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। একই রকম প্রচার হয়েছে এই বিশ শতকে। সব প্রচেষ্টা বন্ধ হয়েছে। ধর্মের বাণী অনেক নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে প্রচারিত হচ্ছে। অবস্থাটা এমন যে, যারা ধর্মের মূল বাণী পরিত্যাক্ত করে দিয়েছিল তারাই পুনরায় সেই ধর্মের বাণী সংশোধিত আকারে মানুষের কাছে প্রচার করছে এবং তাদের ধ্যান-ধারণা সুষ্ঠু বিচারের আবেদন রাখে।

সাধারণ মানুষ, যারা প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতি বিশ্বাস করে ও মানে, তারা ধর্মের অনেক কিছু পরিশীলিত ও উন্নতরূপ দিয়েছে।

আমাদের পাশ্চাত্যবাদীরা অন্য ধর্মের আদর্শ, মতবাদ এবং দর্শন এসব ব্যাপারে খুবই সহনশীল। বহু মত ও পথে বিশ্বাসীরা একসঙ্গে বাস করতে পারে। কারো মধ্যে কোনো বিরোধ হয় না। আমাদের মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সবার দর্শন পাশ্চাত্যবাদীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে মতবাদ ও দর্শন নিয়ে মত বিনিময় করে। ইহুদিবাদ নিয়ে যখন সারা পৃথিবীতে বিতর্ক করেছে, বিশেষ করে এর আইন-কানুন নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখনই মতবিরোধ হয়েছে। খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসীগণ তাদের দর্শন নিয়েও বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে এবং সর্বশেষে ইসলাম ধর্মের নবী মোহাম্মাদ (স.)-এর মত ও পথ নিয়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক হয়েছে। অবশ্য এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং বিতর্ক নেই, তাকেই সেরা ধর্ম বলা যায়। আলোচক দার্শনিক হ্যারল্ড ব্লুম এ বিষয়ে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, 'আমেরিকান ধর্ম' কিন্তু এটা বলা শ্রেয় আমেরিকান নয়, বিশ্ব ধর্ম। বিশ্ববাসী ধর্মের যে তুলনামূলক পর্যালোচনা তাতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, তা হচ্ছে, প্রতিটি ধর্মের মূল কথা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ঈশ্বর-শয়তানের মৌলিক দ্বন্দ্ব, দেব-দেবী, শয়তান, স্বর্গ এবং নরক প্রত্যেকে বিশ্বাস করে আবার বার্তাবাহক আসবে। খ্রিষ্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায় এ কথা বিশ্বাস করে। তারা নীতিগতভাবে একমত। অন্যান্য ধর্মের মানুষও বিশ্বাস করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা হবেই। প্রত্যেকেই এ ধারণা পেয়েছে জরথ্রুস্টের শিক্ষা থেকে, যে দর্শন এসেছে পৃথিবীতে বহু বছর পূর্বে, এটা মানুষের জন্য বার্তা, প্রথম ধ্যান-

ধারণা এবং এমনকি মানুষ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বজায় রেখেছে। অধ্যাপক মেরি বয়েস বলেন, ছায়ার মতো হলেও জরাথ্রুস্ট দর্শন খ্রিষ্টান বিশ্বে অত্যন্ত ক্ষমতাশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জরাথ্রুস্টীয় দর্শন, তার অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা, সেবা–সবই যেন আজ মিলিয়ে যাচ্ছে। পর্বতে পর্বতে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন পাহাড়ে বা মন্দিরে এলাম, সব কিছু দেখলাম। মন্দিরের শীর্ষ পরিচালক, আমি ঠিক জানি না তিনি ধর্মপ্রচারক কি না অথবা সম্প্রদায়ের নেতা কি না, তবে তিনি অত্যন্ত পারিপাটি, সুশৃঙ্খল, শশ্রুমণ্ডিত এবং সব সময় পাশ্চাত্যের পোশাক-পরিচ্ছদ স্যুট এবং কালো জুতা পরিধান করেন। অত্যন্ত বন্ধুসুলভ এবং হৃদয়গ্রাহী মানুষ। তিনি আমাদের দেখামাত্র আর ওপরে উঠলেন না। যেখানে প্রার্থনারত অবস্থায় রয়েছে জরাথ্রুস্ট দর্শনে বিশ্বাসীরা, তিনি আমাদের বললেন, আমরা একে অপরের অত্যন্ত কাছে আসতে পেরেছি। তিনি আমাদের সামনে পৃথিবীর মানচিত্র তুলে ধরলেন। এরপর সেখান থেকে গাছপালা, বনজঙ্গলের বর্ণনা দিলেন। তিনি বর্ণনা করলেন, এসব মানুষ সৃষ্টির আগে এসেছে। প্রয়োজনেই ঈশ্বর এসব সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু মনুষ্য প্রজাতি, যারা পাঁচ হাজার বছর ধরে সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাদের উপাখ্যান হাজার হাজার বছরের পুরনো। তারা টিকে থাকবে। জরাথ্রুস্ট মন্দিরের মূল ফটক, দালান প্রাচীন ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পবিত্র স্থান সম্ভবত জরাথ্রুস্ট দর্শনে বিশ্বাসীদের তীর্থভূমি। এই মন্দির প্রাক সাসনীর যুগে জরাথ্রুস্ট আদর্শবাদীদের জন্য উৎসর্গিত হয়েছে। সম্ভবত তৃতীয় শতাব্দীতে। আমাদের জানানো হয়েছে, একটি জটিল এবং অবিশ্বাস্য কাহিনী ঘটেছে। তা হয়েছে যখন সাসনীয় তিন বোন মৃত্যুবরণ করে। পবিত্র অগ্নিশিখা হঠাৎ করেই ভস্মীভূত হলো, যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। পাথর নির্মিত সেই মন্দির এবং এর চারপাশে দালানকোঠা, সেখানে সমাহিত রয়েছেন জরাথ্রুস্ট। সেখানে তীর্থযাত্রী, ধর্মসেবক, প্রচারকরা আশ্রয় নেয়, গ্রীষ্ম থেকে শীত, সব সময় তারা আসে এবং যায়। মন্দিরটি প্রকৃত অর্থেই ছোট। কিন্তু সমাহিত কবর মানুষের বিশ্বাস হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে। এর প্রসার ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়া পড়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ের উওপর থেকে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে গাছগাছালির সমারোহ। চির সবুজের যেন মিলনমেলা। বৃক্ষের পাশেই তাঁবু রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং প্রচারমাধ্যমের

সংবাদকর্মীরা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেন। ধূসর রঙের এই দেয়াল যে কখন ভেঙে পড়ে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই দেয়াল হুমকিস্বরূপ।

যাই হোক, মন্দিরের পাশে আরো আধুনিক দালানকোঠা গড়ে উঠছে। একটির থেকে আরেকটি সুউচ্চভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অবস্থা এমন যে, কোনো একদিন এটা বস্তির নগরীতে পরিণত হবে। যাই হোক, ছোট্ট মন্দিরের ডান পাশে জানালার দিকে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করেই এ কথা মনে হলো আর ভাবছিলাম, জরাথ্রুস্টের ভাগ্য ভবিষ্যতে কী হতে পারে?

মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্যালোক প্রবেশ করছে। ডান দিক অতিক্রম করে ঠিক বরাবর সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। এ সময় লোকে সমহিত কবরের পাশে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সে গন্ধ অনুভব করলাম। ছোট্ট এই কক্ষের মূল কেন্দ্রের সামনে মন্দিরের সেবক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার পাশেই মন্দিরের লোহার একটি বাক্স। সেই বাক্সের ভেতরে রয়েছে পবিত্র অগ্নিশিখা। একটা বিষয় উপলব্ধি করলাম, যে বিষয় এবং ধর্ম দর্শন নিয়ে আমি এত ঘোরাঘুরি করছি, তার খুব কাছে পৌঁছে গেছি, জরাথ্রুস্টের কাছে পৌঁছে গেছি। মন্দিরের সেবা পরিচালনাকারীকে প্রশ্ন করলাম, জরাথ্রুস্টের দর্শন কি সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে? কয়েকটি বাক্যে কি বলতে পারবেন? কথাটি বলেই ইতস্তত বোধ করলাম। নিজেই বুঝতে পারলাম, আমি কথাটি ঠিক বলিনি। প্রাচীন এই ধর্ম ও দর্শন আজ কোথায়, ব্যাখ্যা করার দাবি আমি করি কীভাবে? মানুষের যে বিশ্বাস, তা এত সহজে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর জন্য অবশ্য সেবা পরিচালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তা সত্ত্বেও সেই সেবা পরিচালক বৃদ্ধ মানুষটি কিছুটা বিরক্তভাবেই তার ভাব প্রকাশ করেন।

তিনি বললেন, 'সহজে প্রকাশ করতে হবে'—আমাদের ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস খুব সহজ-সরল। সত্যকে বেছে নাও এবং মিথ্যা বর্জন করো। প্রতিটি সময় ভালো কথা, ভালো চিন্তা এবং ভালো চুক্তি আমাদের মৌলিক আদর্শ।

খুবই সহজ-সরল বিশ্বাস জরাথ্রুস্ট দর্শনের কথা। আবার একই সঙ্গে বাস্তববাদী শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ প্রতিটি মুহূর্তেই তার কথা স্মরণ হবে। প্রতিটি লেখক, সাংবাদিক, ছবির পরিচালক, সৃষ্টিশীল চিত্রশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পেশাদার ব্যক্তিত্ব, এমনকি যে যেখানে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে তারা অনুভব করে জরাথ্রুস্টের দর্শনের কথা। প্রতিটি মানুষ সত্যকে সমর্থন করে। তারা এটা বোঝে, কোনটা ভালো। সেটাই করতে হবে। ইতিবাচক এবং সৃষ্টিশীল কাজ করতে হবে। অন্যদিকে মিথ্যার

আবরণে থাকে বাজে চিন্তা। নৈতিবাচক মনোভাব এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। ছোট্ট মন্দিরের জরাথ্রুস্টের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, যে বার্তা আমি পেয়েছি তা চূড়ান্ত এবং আমার জরাথ্রুস্টের সন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

গভীর দৃষ্টি নিয়ে হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা উজার করে দিয়ে জরাথ্রুস্টের মন্দিরে এবং তার সমাহিত কবরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আড়াই হাজার বছর আগে যে মহামানব ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তিনি এসেছিলেন এই পৃথিবীকে একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে। আমার পূর্বসারিরা যারা সাইরাস সাম্রাজ্যের ইহুদিদের দ্বারা নির্বাসিত হয়েছেন, জরাথ্রুস্টের শিক্ষা এবং ইহুদিদের ধর্ম দর্শন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে পেরেছে এবং এই সূত্র ধরেই খ্রিষ্টান এবং মুসলিম সম্প্রদায় যা তাদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য এবং সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্রায়ই বলা হয়, তারা হেলেনীয়বাদ এবং ইহুদিবাদের মৌলিক কথা ভুলে যেতে চায়। এখন থেকে আমি শুধু বলতে চাই, জরাথ্রুস্টবাদ আমার হৃদয়ের কথা।

যদিও আমি চিন্তা করেছি, জরাথ্রুস্টের প্রাচীন যে চিন্তা-চেতনা তা নিজের মনে আনতে চেষ্টা করেছি এবং তা যথাসম্ভব করতে পেরেছি। তার আধুনিক অনুসারীগণ এখনই বিশ্বাস করে, কোনো এক বসন্তে জরাথ্রুস্টের আগমন ঘটবে। আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। নিজের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমার গাড়ির চালক, আমার ইরানি বন্ধু সেই সময় আমাকে একটা সিগারেট ধরাতে বলল। এ সময় তারা বলে, আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি থামিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল তারা। কিন্তু আমার গাড়ির চালক দ্রুত ফিরে এলো। সে মন্দিরের প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করল। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, লাইটার আছে কি না। আমার ইরানি বন্ধু কখনোই ধূমপান করে না আর আমারও ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি মাথা নাড়ালাম, বলতে চাইলাম ম্যাচ নেই। তারপর পকেটে হাত দিলাম। আমি সিগারেট হাতে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম, একে অপরের দিকে দৃষ্টি দিলাম, এ সময় বয়স্ক ব্যক্তি, জরাথ্রুস্ট অগ্নিশিখা থেকে একটি লাঠি নিয়ে আগুন ধরিয়ে আনেন। পকেট থেকে দুটি সিগারেট বের করল, তা ধরাল। সিগারেট হাতে নিয়ে লক্ষ্য করলাম, এই সিগারেটের নাম মোহাম্মাদ সিগারেট।

জরাথ্রুস্টের উক্তি

এখানে তোমার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, তুমি কান পেতে শোনো

হে মানুষ, তোমাকে ভাবতে হবে নিজের মতো করে। নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং দর্শন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যখন তুমি সিদ্ধান্ত নেবে এবং চিন্তা করবে দুটি মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে তখন তোমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুটি বিশ্বাসই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। তারপর মুক্তির জন্য তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মের দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য এবং শক্তি বিরাজমান। যারা ধর্মের মৌলিকত্ব নিয়ে চিন্তা করে এবং এগিয়ে যায় তাদের মধ্যে একটা বিষয় কাজ করে আর তা হচ্ছে ভালো এবং মন্দের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করা। তারা চিন্তা-চেতনা এবং কর্মপরিধি সুষ্ঠুভাবে বেছে নেয়। তারা ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে। জরাথ্রুস্ট নিজেই বলেছেন, 'যারা ধর্মের সঠিক পথ বেছে নেয় তারাই ঈশ্বরের সন্ধান পায়। নির্বোধেরা অন্ধকারেই থাকে অনন্তকাল। তারা ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ভালো-মন্দ দুটি শক্তি যখন একসঙ্গে অগ্রবর্তী হয়েছে তখন থেকে জীবন ও মৃত্যুর সূচনা হয়েছে। সৃষ্টির শেষ প্রান্তে মিথ্যার অনুসারীরা বিনাশ হয়ে যায়। ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তারা। কিন্তু যারা সত্যের পথে এবং এক ঈশ্বরের পথে থাকে তারাই আলোকিত হয়।

ধর্মের দুটি মৌলিক শক্তির ফলে জরাথ্রুস্ট বুঝতে পেরেছিলেন মিথ্যা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মিথ্যার অস্তিত্ব টিকতে পারে না। পবিত্র ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায়। দর্শন হচ্ছে সত্য এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। সত্যের আবর্তে, চাদরে ঢেকে থাকতে চান জরাথ্রুস্ট। স্বর্গের পথে ছুটে যেতে চান তিনি। তার বিশ্বাস স্বর্গ হচ্ছে আলো। এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। জরাথ্রুস্টের নিজের কথা হচ্ছে—'আলো এবং সত্যের পথে এসো। ঈশ্বরের সন্ধান করো। ঈশ্বরকে ভালোমতো খোঁজ করো। বহু মত ও পথ ভুলে যাও। এক দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী হও। মিথ্যাকে বর্জন করো। সত্যকে বেছে নিতে জ্ঞানের পথে এসো।'

দেভাস তার পথে আসেনি। বরং মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছিল। মিথ্যাই তার ধ্বংসের একমাত্র কারণ। দেভাস সাম্রাজ্যে মিথ্যা এবং ভুলের পরিণতি

সবাইকে বহন করতে হয়েছিল। এক পর্যায়ে ওই সাম্রাজ্যে ব্যাপক হত্যা, খুন, লুটপাট, নোংরামি এবং নারীর প্রতি অবিচার হয়েছিল। জরাথ্রুস্ট নিজেই প্রচার করেছেন, সত্যকে বেছে নাও। মুক্তির পথে এসো। মিথ্যাকে বর্জন করো, ঈশ্বরের অনুসারী হও। তাহলেই মুক্তি পাবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

কৃতজ্ঞতা

আমার ইরান ভ্রমণের পুরো কাহিনী। এই ভ্রমণের যে শিরোনাম দিতে চাই তা হচ্ছে 'জরাথ্রুস্টের দর্শন'। আমার ইরান ভ্রমণের সঙ্গে ছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক। ২০০০ সালের অক্টোবরে আমরা ইরান ভ্রমণ করি। ইরানের বিভিন্ন স্থানের নাম আমরা এই ভ্রমণের আগে ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি।

১. নবদর্শন

'সমরকন্দের স্বর্ণালী ভ্রমণ' এই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জেমস ইলোরি ফ্লেকারস। তিনি ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পার্সি ভাষায় লিখেছেন কবি হাসান।

১৯৯৩ সালে বিবিসি–২ লিভিং ইসলামবিষয়ক ম্যাগাজিন ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হন।

মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামা থেকে উদ্ধৃত প্রবাদ, এই ভ্রমণকাহিনী ইসফায়েন্দার রচনা করেছেন, ইন্টারনেট থেকে হেলেন জেমারেন আমাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন।

দার্শনিক ও চিন্তাবিদ দিলিপ হিরো ইরান এবং আফগানিস্তানের বিপ্লব নিয়ে দর্শন ও তত্ত্বের বই লিখেছেন। এই দুটি দেশ ইসলাম ও মৌলবাদে আকৃষ্ট হয়েছে, সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে। তার লিখিত বই 'ইসলাম ও মৌলবাদ' ১৯৮৮ সালে পালদিন প্রকাশ করে। সেখান থেকে আমি কিছু তথ্য নিয়েছি। 'পবিত্র যুদ্ধ : ইসলামিক মৌলবাদের উত্থান' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। লেখক রটলেগে।

এ বইয়ের প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে ১৯৮৪ সালে বিবিসি-২ ধারাবাহিকভাবে ড. জেন গ্লোভার ইসলামি বিপ্লব নামে সিরিজ প্রচার করেন।

২. সত্য দার্শনিক

লিটল ম্যানের পাণ্ডুলিপি নেয়া হয়েছে 'ছোট মানুষ এবং অন্য শয়তান' উপন্যাস থেকে। লেখক জন গলসওয়ার্দি, ১৯১৫ সালে প্রকাশক চার্লস স্ক্রাইবার এ বই প্রকাশ করেছেন।

নেশজের পূর্ণাঙ্গ জীবন, কর্মকাণ্ড যা আমি কোনো বই থেকে পাইনি, সংগ্রহ করেছি ছবির কাহিনী থেকে। ছবিটি ছিল মানব : 'এসব মানব নয়'। বিবিসির আর্ট প্রোডাকশন থেকে ছবিটি পেয়েছি ১৯৯৯ সালে। ছবির পরিচালক ছিলেন সিমন সু। বিবিসি ১৯৯৯ সাল থেকে এই শর্ট ফিল্ম প্রচার করে।

জার্মানিরা জরাথ্রুস্টের দর্শন নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে দর্শন তত্ত্ব প্রচার করেছেন অধ্যাপক মাইকেল স্টসবার্গ। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৮ সালে বইটি দুই খণ্ডে শেষ করেন ডি গ্রেটো।

১৭৯১ সালে ভল্টেয়ারের কবিতা 'লা ইয়া নেচার' থেকে এই উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে। ফরাসি ভাষায় তা লেখা ছিল :

'সত্য এবং সঠিক পথের খোঁজে পৃথিবীতে এসেছেন জরাথ্রুস্ট
তোমাকেও আহ্বান করেছে সেই পথ।
হে মানুষ এসো সত্যের পথে।
মুক্ত করোপাপাচার ও পঙ্কিলতা থেকে
অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক রেমন্ড স্কোয়াবের কাছ থেকে ইরানের অনেক কাহিনী জেনেছি। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৪ সালে। ইরানের কাহিনী নিয়ে এখানে বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। আমার কাছে অবাক লেগেছে ইরানের শিল্পকাহিনী নিয়ে কেন ছবি তৈরি হয়নি তা ভাবাই যায় না। হয়তো হয়েছে আমার দেখার সুযোগ হয়নি।

বিশ্বখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকবিদ জ্যারেটকে নিয়ে রাসমুস রাস্ক পরবর্তী সময়ে বহু গবেষণা করেছেন। তাকে নিয়েই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রিমস ল। তিনি ধর্ম নিয়েও ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

নেশজের সেমিনার বা সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে। এই সম্মেলনে যে দর্শনের কথা বলা হয়েছে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন দার্শনিক এল,

জেমস। ১৯৯৮ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সম্মেলনের জার্নাল প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে বই আকারে প্রকাশ হয়।

৩. মহান দর্শনতত্ত্ব

এই তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে।

মন্টেসেগারে গণহত্যা : অ্যানবি জেনিয়াসিয়ান ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস। লেখক জো ওলডেনবার্গ। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ সালে। ওয়েডেন ফিল্ড এবং নিকলসন প্রকাশনা সংস্থা এ বইটি প্রকাশ করে।

মন্টানিও : ১২৯৪-১৩২৪ এই ত্রিশ বছর ফ্রান্সে ক্যাথরাস এবং ক্যাথলিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তা তুলে ধরেছেন ইমানুয়েল লে রয়। তার বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ সালে।

১২০৭ সালে দার্শনিক রেমকন্ট ডি ড্যাকুইরাস মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কালেন্দা মায়া পর্বতে ধর্মের অনুসন্ধান করেন। সেখানে তিনি অনেক অবিচার দেখতে পান। তিনি কিছু রোমান্টিক কবিতা লেখেন।

ক্রাউন এবং মালভোলির মধ্যে পিথাগোরাস দর্শন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তা টুয়েলফথ নাইট গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ইউরোপের লুকায়িত ঐতিহ্য প্রকাশিত হলো। মধ্যযুগে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ধর্ম, দর্শন সব কিছুই তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে বই লিখেছেন ইউরি স্ট্যানভ। ১৯৯৪ সালে পেঙ্গুইন প্রকাশ করে তার বই।

ইউরি স্ট্যানভের মতে, বোজোমিলবাদ টিকে ছিল উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ভ্রমণ এবং মানুষের জীবন প্রণালী, আচরণ বোঝার জন্য আমি টরভোন দার্জির সাহায্য নিয়েছি।

'কৃষ্ণসাগর' বইটির রচয়িতা নেন আসকারমন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৪. ধর্মের আলো

মোহাম্মাদ শামস উদ্দীন হাফিজ, জন্ম ১৩২৫ মৃত্যু ১৩৮৯।

আবু আব্দ আল্লাহ মোশাররফ ইবনে মুসান উদ্দীন। যিনি সাদি নামে পরিচিত। জন্ম ১২০৮, মৃত্যু ১২৯৩।

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান রচিত এ পঙ্ক্তি :
পৃথিবীর 'আদম শিশুরা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে,
এইসব সৃষ্টি হয়েছে একটি স্থান থেকে
যখন পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কেউ কষ্ট পায়
অন্যরাও সেই কষ্ট অনুভব করে
যার মধ্যে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই
সে মানুষ নয়, পশু।

মধ্যযুগের মনীবাদতত্ত্ব : খ্রিষ্টীয় দ্বৈতসত্তার পর্যালোচনা। এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক মূলগ্রন্থ। স্যার স্টিফেন রুনিক্যামন তার এ বইয়ে মধ্যযুগের কাহিনী তুলে ধরেছেন। ১৯৪৬ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করে।

'গার্ডেন অব লাইট' বইটি লিখেছেন আমিন মালউফ। অসাধারণ এ উপন্যাসে মণির জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে। কোয়ার্ক প্রকাশনা বইটি প্রকাশ করে।

আনুষঙ্গিক বিষয়-সংক্রান্ত রেফারেন্স পেয়েছি হার্ভার্সের একটি প্রতিবেদন থেকে। সেই প্রতিবেদনটি ছিল সাম্রাজ্যে এবং ঐশ্বরিক বাণীবাহক বইয়ে। বইটির রচয়িতা অধ্যাপক এলিজার সেগাল। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর ক্যালিফোর্নিয়া জিউস প্রেসে।

কী কী বিষয় অনুসরণ করতে হবে, কোন পথে এগোতে হবে-দার্শনিক অধ্যাপক এল. জে. আর অর্টের মণিবাদ তত্ত্ব আমাকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে ১৯০৭ সালে তার এই দর্শন তত্ত্ব প্রকাশ করেছে ই. জে. ব্রিন লেডন।

রোমান সাম্রাজ্যে মণিবাদ এবং মধ্যযুগে চায়নার দর্শন বইয়ের লেখক স্যামুয়েল এল. সি. লিও। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে।

৫. মিথরাস রহস্য

'মিথরাস মন্দির লন্ডন' বইয়ের রচয়িতা জন শেফার্ড। ১৯৯৮ সালে ইংরেজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগোষ্ঠী বইটি প্রকাশ করে।

'তুমি যদি দেখতে চাও কোনো দালাল ঠিকাদারকে যেকোনো মন্দির উদ্যান নির্মাণ করে বিষণ্ণ হয়ে গেছে তাহলে মিথরাস মন্দির দেখলেই চলবে।' এ উক্তি করেছেন র‍্যালফ মেরিফিল্ড। তিনি ১৯৬৫ সালে লন্ডন জাদুঘরের পরিচালক ছিলেন।

ভোরের আলো এবং জরাথ্রুস্টবাদ বইটি লিখেছেন আর সি জেহনার। বইটি ১৯৬১ সালে ওয়েডেন ফিল্ড এবং নিকলসন প্রকাশ করে।

মিথরাসবাদ দর্শন নিয়ে ইরানের তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কারণ ইরান সে সময় জ্যোতিষশাস্ত্রের নব দর্শন এবং ধর্ম নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করছিল।

'রোমান লন্ডন' বইয়ের রচয়িতা জেনি হল এবং র‍্যালফ মেরিফিল্ড। ১৯৮৬ সালে এইচ এম এসও প্রকাশ করে বইটি।

হাদ্রিয়ান দেয়াল নিয়ে বহু অজানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৬. সময়ের শেষ

এই অধ্যায়ের অধিকাংশ তথ্য পেয়েছি 'দি জিউস ইন দ্য গ্রিক এজ' বই থেকে। বইটি রচনা করেছেন ইলিয়াস জে বেকারম্যান। ১৯৮৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস বইটি প্রকাশ করে।

তানুদার বেঞ্জামিন বইটির অনুবাদ করেছেন মার্কাস র‍্যানাফ প্রন্ডনার। বইটি ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করে।

'মৃত সাগরের রহস্য এবং অর্থ' উপাখ্যান বইটি রচনা করেন হার্সেল শাঙ্ক। ১৯৯৮ সালে র‍্যান্ডম হাউস প্রকাশ করে।

৭. আশুরা মাজদার দয়া

'সাইরাস টম্ব' বইটি মাইকেল উড আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পদচিহ্ন এঁকেছেন। তার বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে।

ব্যাবিলনের উদ্যান কাহিনী ব্যাবিলন জাদুঘরে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ইশতার গেট রয়েছে।

কোরআন থেকে সুরা বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এন. জে. দেইউ।

৮. প্রথম নবী

হেইস স্লোভেচিক তার ইহুদিবাদ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন। প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। সংস্কৃত থেকে অনেক তথ্য নিয়েছি।

বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অনুবাদ করা হয়েছে, যা ছিল নবম শতাব্দীর লিখিত তথ্য।

......

১৯৩৭ সালে ভিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন পল ক্রিসবাসজেক। জীবনের শুরুতেই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখে হতে হয় তাকে। দুই বছর বয়সে নাজি বাহিনীর হুমকির কারণে বাবা মায়ের সাথে ভিয়েনা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে। পুরো পরিবার ইংল্যান্ডে চলে যায়।
ছোটবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছিলেন। ১৯৬২ সালে দন্ত চিকিৎসক হন। কৃতিত্বের সাথে ডেন্টাল সার্জারী পাস করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভ্রমণে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে ভ্রমণ করে অনেক জ্ঞানার্জন করেন। অন্ধকার মহাদেশখ্যাত আফ্রিকাতে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন পল ক্রিসবাসজেক। তিনি একমাত্র ইউরোপীয় দন্ত চিকিৎসক যিনি দুই বছর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ছিলেন। সে সময় যে চিকিৎসা সেবা করেছেন তা নয়। কাবুলের রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছেন। বিবিসিতে মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯০ সাল থেকে পূর্ণোদমে লেখার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে লন্ডনে বাস করছেন।

অনুবাদক –

মোস্তফা আরিফ মাগুরার শ্রীপুর থানার সাচিলাপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। দৈনিক অর্থনীতি, নিউজ টুডে পত্রিকায় কাজ করেন। তার উল্লেখযোগ্য অনুদিত গ্রন্থ- দি হানড্রেড- মাইকেল এইচ হার্ট, লাভ মেশিন- জ্যাকুলিন সুসান, এশিয়াকে গড়লো যারা- দি টাইমস উল্লেখযোগ্য।

ধর্মের মৌলিক বিষয়ের অবতারণা। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর মানুষ ধর্ম নিয়ে লড়াই করেছে, পৌত্তলিকতাবাদ আকড়ে ধরে ছিল তা থেকে উদ্ধারের জন্য যারাই চেষ্টা করেছে তাঁদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অন্ধকার যুগে ধর্মের সত্যতা এবং নৈতিকতা প্রচার করতে গিয়ে বহু সাধক জীবন দিয়েছেন। এর মাঝেও শৈল্পিক ও নান্দনিক পথে অসত্য এবং ন্যায়ের পথে যুদ্ধ ও লড়াই করেছেন জরাথ্রুস্ট। ইরানী সমাজ, সংস্কৃতি তাঁর প্রচারিত ধর্মের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জরাথ্রুস্ট পারস্যবাসীকেই শুধু নয় বিশ্ববাসীকে জানান দিলেন একেশ্বরবাদের কথা। শত বছর ধরে পৌত্তলিকতাবাদী বিশ্বাসীদের জন্য এ এক কুঠারাঘাত।

– বোষ্টন রিভিউ

বহু বছর আগের কথা। এমনকি ইহুদি উপসনালয় তৈরি, যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ইসলাম প্রচার শুরুর আগেও পারস্যতে এক ঐশী বার্তাবাহক নবী বাস করতেন। তাঁর মাধ্যমেই এই পৃথিবীর মানুষ এক ঈশ্বর ধারণা সম্পর্কে অবহিত হয়। তিনি বিশ্ববাসীকে জানান, ভালো এবং মন্দ দিকের কথা। একটি পূন্যের পথ অপরটি পাপাচারের আবর্তিত। যিনি সৃষ্টিকর্তার কথা জানালেন, ভালো মন্দ এবং ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে পার্থক্য জানালেন তিনি হচ্ছেন জরাথ্রুষ্ট। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও প্রচার ছড়িয়ে পড়ে ভারত মহাসাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত। এমনকি ব্রিটেনেও প্রসারিত হতে থাকে তাঁর ধর্মের বাণী। তাঁর আদর্শের কথা যুগ যুগ ধরে ইসলাম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদী ধর্মে প্রচার হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আঙ্গিকগত কিছুটা পার্থক্য ছিল। কিন্তু মূল বাণী শ্বাশত সত্য। পল ক্রিসবাসজেক সেই কথাটিই মধ্য এশিয়ায় নতুন করে আবার জানালেন। মধ্যযুগে ফ্রান্সে এবং রহস্যময় রোম সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব, এসব কিছুই যেন জরাথ্রুস্ট দর্শনের প্রতিচ্ছবি। পল ক্রিসবাসজেক ইরান এবং মধ্য এশিয়ায় ইসলাম পূর্ব যুগে কেমন অবস্থা ছিল, তাঁদের ধর্ম চিন্তা কিভাবে প্রচারিত হতো তাই তুলে ধরেছেন। কিভাবে মানুষ সত্যের পথে এলো তা জরাথ্রুস্টের সন্ধানে বইয়ের মাধ্যমে জানা গেল।

– দি মেমফিস কমার্শিয়াল

অতীত সমাজব্যবস্থা, ধর্ম কিভাবে প্রচারিত হতো তাই এ বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

–দি ইনডিপেনডেন্ট

ISBN 978 984 8975 60 2
9 789848 975602